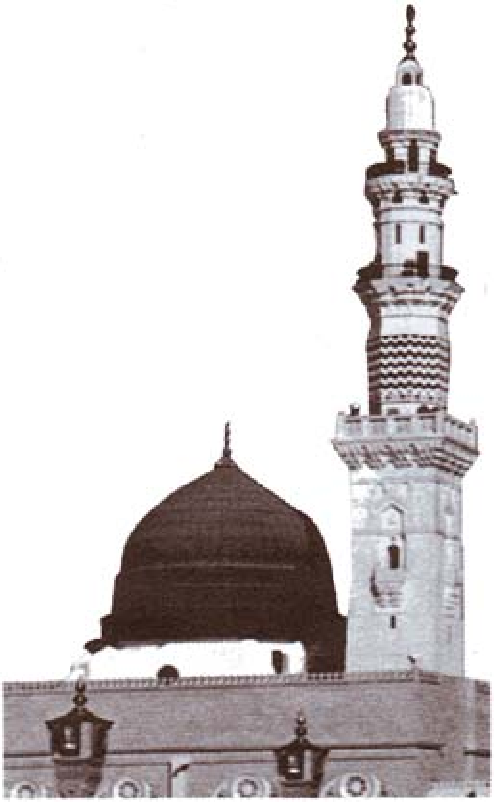
মাদারেজুন্ নবুওয়াত

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে
দেহলভী (রহঃ)



মাদারেজুন্ নবুওয়াত

দ্বিতীয় খণ্ড

শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

মাদারেজুন্ নবুওয়াত
শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)
অনুবাদঃ মাওলানা মুমিনুল হক
সম্পাদনাঃ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক ঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই ১৯৯৬ ইং
রবিউল আউয়াল-১৪১৭ হিঃ
তৃতীয় প্রকাশঃ মার্চ ২০০৯ ইং
রবিউল আউয়াল-১৪৩০ হিঃ

প্রচ্ছদঃ আব্দুর রোউফ সরকার

মুদ্রকঃ শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময় ঃ
২৩০.০০ (দুইশত তিরিশ টাকা মাত্র)

MADAREZUN NABUWAT: The Sacred life Sketch of the greatest prophet Hazrat Mohammad Mustafa (sm.) by Shaekh Abdul Haque Muhaddese Dehlabhi (Rh.) translated into Bengali by Maolana Mominul Haque/Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia. Exchange Tk. 230/- U.S.$ 10

ISBN 984-70240-0014-9

نَحمَد ه ونَصَلّى علٰى رَسُولِهِ الكريمٌ

মানুষের বিস্ময়াবিষ্টতাকে ছুঁয়ে যাওয়া হে প্রবহমান সময়! দেখে যাও এবার আর এক নক্ষত্রিত আকাশ রূপ খুলেছে বিরহী বাংলাদেশের প্রেমপিপাসিত দৃষ্টিসীমানায়। সরে যাচ্ছে চারশ' বছরের পিপাসিত প্রতীক্ষা। নবীবিরহে কাতর বাংলা আনন্দিত হও–প্রিয়তমজনের জীবনকথা মাদারেজুন্ নবুওয়াত দ্বিতীয় খণ্ড এখন তোমার মুখের ভাষায় কথা বলছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। উচ্চারণ করো আনুরূপ্যবিহীন প্রেমময় প্রভুপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা। আর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো সেই স্বপ্নের শহরে–নবীপ্রেম যেখানে মহাজীবনের মহিমায় পরিত্রাণের প্রদীপ হয়ে জ্বলছে। সকল মানবের জন্য। সকল মানবীর জন্য।

পৃথিবী! সাড়া দাও। শুনতে পাওনা, নিসর্গ-মহানিসর্গ যাঁর জিকিরে পলকপাতহীন, নিরবচ্ছিন্ন, উত্তাল–তাঁরই প্রিয়তম, প্রেমাস্পদের আশ্রয়োজ্জ্বল শব্দতরঙ্গটি–আল্লাহ্ ছাড়া প্রভু নেই– মোহাম্মদ তাঁরই বান্দা এবং রসুল।

পালাবার পথ নেই। বৃথা প্রয়াস। অনর্থক দ্বিধান্বিতি। সন্দেহের সাম্পান থেকে নামতেই হবে বিশ্বাসের মৃত্তিকায়, যাতে এখানেই নিরাপদ আড়াল নেমে আসে শেষ সন্ধ্যায়। সেই সাঁঝে শ্রুতিতে জ্বলে ওঠে যেনো বিদায় ব্যথিত সাথীদের উচ্চারণগুলো– আল্লাহর নামের উপর, রসুলের দ্বীনের উপর–

সন্দেহের সাম্পান! সরে যাও। বিশ্বাসীরা এখন তোমার প্ররোচনার প্রতিপক্ষ। বাণীবহনের কাজ নিয়ে নতুন সফর সমুপস্থিত।

দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।

তবু জাগলেনা? তবু তুমি জাগলেনা?

সামনে আর কোনো মনজিল নেই– বিজয়বৈভবের স্বর্ণশিখরটি ছাড়া। হে আমাদের আল্লাহ! আমাদেরকে বিজয়ী করো– সর্বোত্তম বিজয়দাতা তো তুমিই।

নবীপ্রেমের নামই ইমান। নবী আনুগত্যের নামই ইবাদত। অতএব, ইমানের দাবিদারগণ, আপন বুকের দিকে তাকাও। কোথায় সেই প্রেমানল যার উত্তাপে তুমি আত্মরক্ষা করবে শীতার্ত অবিশ্বাস থেকে। প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে। পানিবিহীন পুষ্করিণী, পুষ্পশস্যহীন বৃক্ষমালা–এইতো তোমার জীবন। অপূর্ণ। অসফল। অসুন্দর।

অপূর্ণতাকে অতিক্রম করে পূর্ণতাকে আশ্রয় করতে হলে প্রেমপথে সমর্পিত হতেই হবে। সমর্পণের অঙ্গীকার করতে হবে শ্রেষ্ঠতম ও শেষতম নবীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী তরিকার কোনো পীর মোর্শেদের হাতে। তাঁর বুক থেকেই জ্বালিয়ে নিতে হবে প্রেমশিখা আপন পিপাসায়। একথাটা আমাদেরকে বলতেই হচ্ছে বার বার। প্রতিটি প্রকাশনার প্রাক্কালে। প্রতিটি সমাবেশে। প্রতি আলোচনায়। 'সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও'– আল্লাহ্তায়ালার এই অমোঘ আদেশই ধ্বনিত হচ্ছে বার বার আমাদের আহবানে। ফিরে এসো মানুষ। এসো। অন্বেষণ হও, অক্ষয়তার।

আমাদের আচরণমস্তক তোমারই অনুগ্রহ হয়ে জেগে আছে। হে আমাদের প্রেমময় পরম প্রভু! আদিঅন্তের প্রশংসা ও পবিত্রতা সম্পূর্ণতই তোমার। তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশনাই হোক আমাদের আশ্রয়। পরিপ্রার্থনা। আলহামদুলিল্লাহি আলা জালিক।

সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ, মানুষের মূল সেনাপতি, রসুলে আকবর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবার প্রতি বর্ষিত হোক সকল উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম। নিরন্তর। প্রতিনিয়ত। আর এই অনন্ত দরূদসালামের ব্যতিব্যস্ত বর্ষণের বৃন্দবন্দনায় শামিল হোন যেনো সকল নবী ও রসুল, নবীবংশের এবং নবীপরিজনের সকল সদস্য, সাহাবীসমাজ এবং আউলিয়া সম্প্রদায়। আল্লাহুম্মা আমিন।

আল্লাহ্তায়ালা উত্তম পারিতোষিক অদৃষ্ট করুন মাদারেজুন নবুওয়াত গ্রন্থের মূল রচয়িতাকে, অনুবাদককে, প্রকাশককে এবং পাঠকবৃন্দকে। আমিন।

প্রারম্ভে ও পরিশেষে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

ওপারে কেমন আছো বিরহীর দীল
দীপ জ্বেলে নিবু নিবু ক'রেছে সওয়াল
এপারে নেমেছে রাত কলুষ নিখিল
বিষের আছরে নীল মানবের হাল।
দরূদ সালাম লও জখ্মি দীলের
তোমারই কদম পাকে কাওসার পানি
তোমারই কদমে প্রাণ সারা নিখিলের
ছাতি ফাটে দাও পানি, যাক পেরেশানি।
দরূদ সালাম বলে দুঃখী দীওয়ানা
দ্বাদশ তিথির ওগো হেজাজী হেলাল
কবে হবো মদীনার পথে রওয়ানা
বলো প্রিয় কবে পাবো মিলনের কাল?
সোনার শিকলে বাঁধো উম্মত তামাম
যে শিকলে বাঁধা আছে তোমার গোলাম।

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী প্রথম খণ্ড

মুকাশিফাতে আয়নিয়া
মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ
মালাবুদ্দা মিনহু
নকশায়ে নকশ্বন্দ
চেরাগে চিশ্তী
বায়ানুল বাকী

প্রথম পরিবার
জীলান সূর্যের হাতছানি
নূরে সেরহিন্দ
কালিয়ারের কুতুব
মহাপ্রেমিক মুসা
তুমিতো মোর্শেদ মহান
নবীনন্দিনী

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত
ফোরাতের তীর
মহাপ্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন
কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি
নামাজের নিয়ম
রমজান মাস
ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM

সোনার শিকল
সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা
নীড়ে তার নীল ঢেউ
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
তৃষিত তিথির অতিথি

সূচীপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

আম্বিয়া কেরামের তুলানামূলক মর্যাদার আলোচনা/১১
হজরত আদম আ. এবং নবী করীম স./১২
হজরত ইদ্রিস আ. ও নবী পাক স./১৩
হজরত নূহ আ. ও রসুলে পাক স./১৩
হজরত ইব্রাহীম খলীল ও রসুলে আকরম স./১৪
খলীল ও মাহবুব এর মাকাম/১৪
মূর্তি ভেঙে ফেলা/১৫
কাবাগৃহ নির্মাণ/১৫
হজরত মুসা আ. ও নবী করীম স./১৫
দোয়া কবুল প্রসঙ্গ/১৭
পানি প্রবাহিত করা/১৭
আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে বাক্যালাপ/১৮
ভাষার প্রাঞ্জলতা ও অলংকারগুণ/১৮
হজরত ইউসুফ আ. ও নবী পাক স./১৮
স্বপ্নের ব্যাখ্যা/১৯
হজরত দাউদ আ. ও রসুলেপাক স./১৯
হজরত সুলায়মান আ. ও রসুলে আকরম স./১৯
হজরত ঈসা আ. ও রসুলেপাক স./২১
বিশেষ ফযীলত ও মোজেজা/২২
বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও অবস্থা/২৬
নবী করীম স. এর নামে নাম রাখা/৫৬
মহানবী স. এর দরবারে উচ্চ আওয়াজের নিষিদ্ধতা/৫৮
উম্মতে মোহাম্মদী স. এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য/৮১
হজরত মুসা বললেন, আহমদ কে?/৮৩
ইবাদতের ক্ষেত্রে উম্মতে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য/৮৫
আমলের দিক দিয়ে উম্মতে মোহাম্মদীর বিশেষত্ব/৮৯
আউলিয়া কেরাম/৯৭
কবর ও হাশরের ময়দানে উম্মতে মোহাম্মদীর বিশেষত্ব/৯৯
ইসালে সওয়াবের প্রমাণ/১০১
মেরাজ শরীফের আলোচনা/১০৬
মেরাজ শরীফের প্রমাণ/১১২
বোরাকের আলোচনা/১১৪
সিদরাতুল মুনতাহা/১২২
দীদারে এলাহী/১২৯
মেরাজ থেকে প্রত্যাবর্তন/১৩৫
আল্লাহ্তায়ালার দীদার সম্পর্কে সলফে সালেহীনের মতানৈক্য/১৩৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবুওয়াতের এবং রেসালতের বিশুদ্ধতা ও সত্যতার প্রমাণ সংক্রান্ত মোজেজা/১৪১
উম্মী হওয়া/১৪৩
শ্রেষ্ঠ মোজেজা কোরআন মজীদ/১৪৪
কোরআন মজীদ মোজেজা হওয়ার দিকসমূহ/১৪৪
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ/১৫৫
সূর্যকে ফিরিয়ে আনা/১৫৮
পবিত্র আঙুল থেকে পানির ঝর্ণা/১৫৮
পানি বৃদ্ধি করে দেয়া/১৬১
আহারের মোজেজা/১৬৪
হজরত আনাস রা. এর হাদীছ/১৬৫
হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদীছ/১৬৬
হজরত আনাস রা. এর হাদীছ/১৬৭
হজরত আবু আইয়্যুব আনসারী রা. এর হাদীছ/১৬৮
হজরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. এর হাদীছ/১৬৮
হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর রা. এর হাদীছ/১৬৮
হজরত আবু হুরায়রা রা. এর কয়েকখানা হাদীছ/১৬৯
হজরত আলী রা. এর হাদীছ/১৬৯
হজরত জাবের রা. এর হাদীছ/১৬৯
হজরত জাবের রা. এর আয়েকখানা হাদীছ/১৭০

হজরত আবু হুরায়রা রা. এর আরেকখানা হাদীছ/১৭১
প্রাণীর মুখে কথা বলানো এবং আনুগত্য করানো/১৭২
নেকড়ে বাঘের কথা বল/১৭৪
হরিণের কথা বলা/১৭৭
গাধার কথা বলা/১৭৮
বাঘের আনুগত্য/১৭৮
গাছপালার আনুগত্য/১৭৯
জড় পদার্থের আনুগত্য/১৮২
হুনাইনে জিয্অ বা
উস্তুনে হান্নানার রোদন/১৮৩
উস্তুনে হান্নানার ঘটনা/১৮৪
পাহাড়ের কথা বলা/১৮৫
পাথর দানার তসবীহ পাঠ/১৮৭
খাদ্য দ্রব্যের তসবীহ পাঠ/১৮৮
দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা বলা এবং সাক্ষ্য প্রদান/১৮৯
রোগীদেরকে সুস্থ করা/১৮৯
মৃতকে জীবিত করা/১৯১
দোয়া কবুল হওয়া/১৯৪
সম্মান ও বরকত প্রদান/১৯৮
এলমে গায়েব/২০২
নবী করীম স.কে আল্লাহ্তায়ালার হেফাজত প্রদান/২১৬
রসুলেপাক স. এর এলেম ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য/২২১
মোজেজা সম্পর্কে আরও কিছু কথা/২২৩
রোগীর সেবা/২২৬
বিচ্ছুর বিষ নিবারণের দোয়া/২৩৩
হাদীছ শরীফে প্রাপ্ত শেফার আমল/২৩৮
বদনযর/২৩৮
একটি ঘটনা/২৪২
যাদু বিষয়ক আলোচনা/২৪৪
শেফার আমল/২৫০
বদনযর ও অন্যান্য রোগব্যাধি/২৫০
ভয় ও অনিদ্রার দোয়া/২৫২
বিপদ ও দুশ্চিন্তার দোয়া/২৫২
লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্/২৫৩
আয়াতুলকুরসী ও সুরা বাক্বারার শেষ তিন আয়াত/২৫৩
জামে দোয়া/২৫৩
দারিদ্র বিমোচনের দোয়া/২৫৪
কিমিয়ায়ে মাশায়েখ/২৫৪
আগুন নিভানোর দোয়া/২৫৫
মহামারীর দোয়া/২৫৫
মাথা ব্যথার দোয়া/২৫৬
দাঁত ব্যথার দোয়া/২৫৬
মুত্রপাথরী ও পেশাব বন্ধের আমল/২৫৭
জ্বরের আমল/২৫৭
খুঁজলি পাঁচাড়ার আমল/২৫৯
প্রসব কষ্ট/২৫৯
নাক দিয়ে রক্ত পড়া/২৬০
সর্বপ্রকার ব্যথা ও বিপদের দোয়া/২৬০
লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্র জিকির/২৬১
খাওয়ার সময়ের দোয়া/২৬২
উমউস্সিরইয়ান এর আমল/২৬২
হাফীযে রমজানের দোয়া/২৬২
ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে নবী করীম স. এর চিকিৎসা/২৬৩
স্বপ্ন ও তার তাবীর সংক্রান্ত আলোচনা/২৬৫
সত্য স্বপ্নের মুহূর্ত/২৬৮
তাবীরকারীদের জন্য রসুলেপাক স. এর নসীহত/২৭০
তাবীরকারীগণের জন্য কতিপয় আদব/২৭১
স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য কতিপয় আদব/]২৭২
স্বপ্নের প্রকার/২৭৩
নবী করীম স. যে সকল স্বপ্ন দেখেছেন/২৭৪
সাহাবায়ে কেরামের স্বপ্নঃ রসুলেপাক স. যার তাবীর করেছেন/২৮২
যে কারণে স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা বর্জন করেন/২৮৫

পঞ্চম অধ্যায়

আম্বিয়ায়ে কেরামের তুলনামূলক মর্যাদার আলোচনা

কিছু কিছু ফযীলত বা মর্যাদা নবী করীম স. এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে সাধারণভাবে বিদ্যমান ছিলো। আবার কিছু কিছু মর্যাদা ও কামালাত আল্লাহ্তায়ালা কেবল নবী করীম স. এর জন্যই নির্ধারণ করেছেন। এসমস্ত ফযীলত ও কামালাতের ক্ষেত্রে কোনো নবীই দুনিয়া ও আখেরাতে নবী করীম স. এর সমকক্ষ হতে পারবেন না। হকতায়ালা মানুষের অস্তিত্বের মৌলিকতায় বিভিন্নতা দিয়েছেন। তন্মধ্যে কোনো কোনো নফসকে আল্লাহ্তায়ালা চূড়ান্ত পর্যায়ের পবিত্রতা দান করেছেন। কোনো কোনো নফস মধ্যম স্তরের মর্যাদা লাভ করেছে। কোনো কোনো নফস আবার পংকিলতা ও আবিলতার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।

কাজেই এদের সকলের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা সাব্যস্ত হয়েছে। তবে আম্বিয়ায়ে কেরামের সকলের নফসই অন্যান্যদের তুলনায় সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন ও অতুলনীয়। তাঁদের দেহ মোবারকও অন্যান্য মানবদেহের তুলনায় অধিকতর পাক এবং সর্বপ্রকারের ত্রুটি ও ক্ষতি থেকে পূর্ণ সুরক্ষিত, পবিত্র। আম্বিয়ায়ে কেরাম অন্যান্যদের তুলনায় পূর্ণ ও উত্তম এবং কামালিয়াতের বৃত্তের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য অবশ্যই ছিলো। সাইয়্যেদে আলম মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. অন্যান্য নবীগণের তুলনায় স্বভাবের দিক দিয়ে অধিকতর বিশুদ্ধ, বিবেচক ও সমর্পিত ছিলেন। দৈহিক দিক দিয়ে অধিকতর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন তো ছিলেনই। রূহানিয়াতের দিক দিয়েও ছিলেন অন্যের তুলনায় অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। চারিত্রিক দিক দিয়েও ছিলেন অধিকতর পবিত্র ও সম্মানিত। মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম। তিনিই মানব জাতির নেতা, এ ব্যাপারে মতপার্থক্য নেই।

আম্বিয়া কেরামকে যে বিভিন্ন প্রকারের কামালত ও কারামত প্রদান করা হয়েছে, তার সবগুলোই অথবা তার অনুরূপ বিশেষ ফযীলত ও কামালত রসুলেপাক স.কে বিশেষভাবে দেয়া হয়েছে। এগুলোতে অন্য নবীগণ অংশীদার নন।

হজরত আদম আ. এবং নবী করীম স.

হজরত আদম আ.কে হকতায়ালা তাঁর কুদরতী পবিত্র হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেয়া হয়েছিলো। আর আমাদের নবী হাবীবেপাক স.কে এই মহিমা প্রদান করা হয়েছে যে, হকতায়ালা স্বয়ং তাঁর বক্ষ সম্প্রসারণ করেছিলেন। তাতে ইমান ও হেকমত স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদম আ. এর অবয়ব জাগতিক উপাদান দ্বারা গঠন করেছিলেন। আর আমাদের নবী হাবীবুল্লাহ্ স. এর সৃষ্টি নবুওয়াতী সৃষ্টি। ফেরেশতাবৃন্দ হজরত আদম আ.কে সেজদা করেছিলো নবী করীম স. এর জন্যেই। আল্লাহ্পাক হজরত আদম আ. এর রূহে নূরে মোহাম্মদী আমানত রেখেছিলেন। আর সেই পবিত্র নূরের ঝলক আদম আ. এর ললাটদেশে জ্বলজ্বল করতো। সেজদা করার নির্দেশ ছিলো সে কারণেই। তাই প্রকৃত আভিজাত্য ও শরাফত রসুলেপাক স. এর জন্যই নির্ধারিত।

আল্লাহ্পাক পবিত্র কালামে এরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবী করীম স. এর উপর দরূদ পাঠান।' সেজদা করার কাজে হকতায়ালা ফেরেশতাগণের সঙ্গে শামিল ছিলেন না। আর এটা বৈধও নয়। কিন্তু দরূদ পাঠানোর ব্যাপারে দেখা যায়, আল্লাহ্পাক ফেরেশতাকুলের সঙ্গে নিজেও শামিল রয়েছেন। নবী করীম স. এর এই ফযীলত সর্বাধিক সম্মানের। সর্বাধিক পরিপূর্ণতার। আবার দেখা যায়, ফেরেশতাকুলের সেজদার মধ্যে তেমন কোনো মাহাত্ম্য ও আভিজাত্য নেই, কেননা এটা সংঘটিত হয়েছে কেবল একবার। কিন্তু নবী করীম স. এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার রহমতের নূর প্রতিটি মুহূর্তে বর্ষিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এ কাজে ইমানদারগণকেও অংশগ্রহণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

একটি ব্যাপারে দেখা যায়, আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদম আ.কে বেশী মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে দায়লামী 'মসনদুল ফেরদাউস' কিতাবে হজরত আবু রাফে রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ উপস্থাপন করেছেন। রসুলেপাক স. বলেন, আদম আ.কে যখন বস্তুসমূহের নাম শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো, ওই সময় আমার উম্মতকে আমার সামনে মিছালস্বরূপ পেশ করা হয়েছিলো। তখন তারা সকলেই মাটি ও পানির মধ্যে ছিলো। তখন আমাকেও সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। কাজেই দেখা যায়, হজরত আদম আ.কে যেমন বস্তুসমূহের নাম শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো, তেমনি আমাদের পয়গম্বর স.কেও দেয়া হয়েছিলো। তাঁকে শুধু বস্তুর নামই শিক্ষা দেয়া হয়নি, বরং বস্তুর হাকীকতের এলেম প্রদান করা হয়েছিলো। এটা নিঃসন্দেহ যে, নামের চেয়ে বস্তুর তত্ত্ব অনেক গুণ ঊর্ধ্বে। কেননা নামটা হচ্ছে বস্তুর তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত

হওয়ার মাধ্যম। বস্তুই মুখ্য। নাম নয়। এটা সুস্পষ্ট যে, জ্ঞানের মর্যাদা নিরূপিত হয় তার জানিতবস্তু (মালুম) এর মর্যাদা অনুসারে।

হজরত ইদ্রিস আ. ও নবী পাক স.

হজরত ইদ্রিস আ. এর মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা কোরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন 'আমি তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছি।' এদিক দিয়ে আমাদের পয়গম্বর সাইয়্যেদে আলম মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. এর ব্যাপারে দেখা যায়, আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে মেরাজের মাধ্যমে ঊর্ধ্ব জগত ভ্রমণ করিয়েছেন। এই সুমহান মর্যাদা তিনি ব্যতীত অন্য পয়গম্বরের নেই।

হজরত নূহ্ আ. ও রসুলপাক স.

আল্লাহ্তায়ালা হজরত নূহ আ.কে এই মর্যাদা দান করেছিলেন যে, তাঁর মাধ্যমে ইমানদারেরা পানিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। আর আমাদের নবী সাইয়্যেদে আলম স.কে এই মর্যাদা দান করা হয়েছে যে, তাঁর উম্মতকে আসমানী আযাবের মাধ্যমে সাধারণভাবে ধ্বংস করা হবে না। হকতায়ালা এইমর্মে এরশাদ করেন 'আল্লাহ্তায়ালার শান এরূপ নয় যে, আপনি উম্মতের মধ্যে উপস্থিত, অথচ আল্লাহ্ আপনার উম্মতকে আযাব দিবেন।'

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত নূহ্ আ.কে মর্যাদামণ্ডিত করেছেন তাঁর কিশতীকে পানির উপর নিরাপদে রাখার মাধ্যমে। আর আমাদের পয়গম্বর সাইয়্যেদে আলম স.কে সম্মান প্রদান করেছেন এভাবে– একদিন রসুলে আকরম স. দেখলেন, ইকরামা ইবনে আবু জাহেল নদীর কিনারে বসে আছেন। ইকরামা রসুলেপাক স.কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তাহলে নদীর অপর কিনারে যে পাথরটি দেখা যাচ্ছে তাকে হুকুম করুন, সে যেনো সাঁতার কেটে এপারে চলে আসে এবং যেনো ডুবে না যায়। রসুলেপাক স. পাথরকে ইশারা করলেন, আর অমনি পাথরটি পানির উপর ভাসতে ভাসতে রসুলেপাক স. এর সামনে এলো এবং তাঁর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দিলো। রসুলেপাক স. তখন ইকরামাকে বললেন, ইকরামা, খুশী হয়েছো? এটুকুইতো যথেষ্ট। ইকরামা বললেন, এখন আপনি আবার তাকে হুকুম করুন, সে যেনো তার আপন জায়গায় ফিরে যায়। রসুলেপাক স. পাথরকে আবার ইশারা করলে, সে পানিতে ভেসে সাঁতার কাটতে কাটতে অপর পারে চলে গেলো এবং আগের স্থানে স্থির হলো। কাষ্ঠনির্মিত নৌকা পানিতে ভাসার চেয়ে প্রস্তরখণ্ডের পানিতে ভাসা ও আপনাআপনি সাঁতরিয়ে নদী পার হওয়া অধিকতর বিস্ময়কর। এর দ্বারা অলৌকিকত্বের অধিকারী এই পয়গম্বরের প্রাধান্য সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে।

হজরত ইব্রাহীম খলীল আ. ও রসুলে আকরম স.

আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহীম আ. কে এই মহিমা দান করেছিলেন যে, নমরুদের অগ্নিকুণ্ড তাঁর জন্য শান্তিময় শীতল হয়েছিলো। আমাদের পয়গম্বর সাইয়্যেদে আলম স. এর মর্যাদা ছিলো, কাফেরদের যুদ্ধের অগ্নি তাঁর জন্য শীতল করে দেয়া হয়েছিলো। যুদ্ধের অগ্নিতে তরবারী সমূহ কাষ্ঠখণ্ড, ইন্ধন এবং অগ্নিশিখা– সবই কাফেরদের জন্য মৃত্যুর কারণ হয়েছিলো। যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলনকারী হচ্ছে হিংসা আর তাতে জ্বলে যায় আত্মা ও শরীর। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, কাফেরেরা যখনই যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছে, আল্লাহ্পাক তা নিভিয়ে দিয়েছেন। তারা চেয়েছিলো, কুফুরীর আগুন দিয়ে দ্বীনের নূরকে নিভিয়ে দিতে। কিন্তু জাব্বার কাহ্হার আল্লাহ্তায়ালা সবসময়ই তা রুখে দিয়েছেন এবং দ্বীনের নূরকে পরিপূর্ণ করেছেন। এই মর্মে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা তাদের মনস্কামনাকে অসফল করে দিয়েছেন এবং চেয়েছেন তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করে দিতে, যদিও কাফেরেরা অপছন্দ করেছে।' এখানে আরেকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ্তায়ালা মেরাজ রজনীতে তাঁর হাবীব স. কে অগ্নিসাগর নির্বিঘ্নে পার করে দিয়েছিলেন।

ইমাম নাসায়ী র. মোহাম্মদ ইবনে হাতিব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন– তিনি বলেছেন, আমি তখন শিশু। একদিন অগ্নিদগ্ধ পাতিল উল্টে গিয়ে আমার উপর পড়ে গিয়েছিলো। তাতে আমার শরীরের সমস্ত চামড়া জ্বলে যায়। আমার পিতা রসুল করীম স. এর কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর পবিত্র মুখ থেকে লালা নিয়ে আমার শরীরের চামড়ার উপর প্রলেপ দিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন, 'হে মানুষের প্রভুপালক! এর কষ্ট দূর করে দাও।' তৎক্ষণাৎ আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। মনে হলো, কিছুই হয়নি।

খলীল ও মাহবুব এর মাকাম

আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহীম আ. কে খলীল এর মাকাম দান করেছিলেন আর আমাদের নবী সাইয়্যেদে আলম স. কে দান করেছিলেন মহব্বতের মাকাম। মহব্বতের মাকাম খলীলের মাকামের ঊর্ধ্বে। হাবীব ওই প্রেমাস্পদকে বলা হয় যিনি মাহবুবিয়াতের মাকাম পর্যন্ত পৌঁছেছেন। রসুলে আকরম স. কে সাধারণভাবে সকলের শাফায়াতের ক্ষমতা দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তিনি মাহবুবিয়াতের মাকামের অধিকারী। কেউ কেউ বলে থাকেন, তিনি মহব্বত ও খিল্লাত উভয় মাকামের অধিকারী। আর তাঁর খিল্লাতের (খলীল হওয়ার) মাকাম হজরত ইব্রাহীম আ. এর খিল্লাতের মাকামের চেয়ে অধিকতর পূর্ণ ও উত্তম। 'আখেরাতের মর্যাদায় রসুলেপাক স. এর বিশেষত্ব' নামক শিরোনামে এ সম্পর্কে আরও অধিক আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মূর্তি ভেঙে ফেলা

আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহীম আ. কে কুঠারের সাহায্যে মূর্তি ভেঙে ফেলার সম্মান দান করেছিলেন। আর আমাদের নবী সাইয়্যেদে আলম স. কে অত্যন্ত কঠিন ও মযবুত মূর্তি, যা কাবা ঘরের দেয়ালে সংস্থাপিত ছিলো, তা সামান্য একখণ্ড কাঠের ইশারায় ভেঙে ফেলার গৌরব দান করেছিলেন। ওই সময় তাঁর পবিত্র রসনা থেকে উচ্চারিত হচ্ছিলো 'হক এসে গেছে এবং বাতেল ধ্বংস হয়েছে।'

কাবাগৃহ নির্মাণ

আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহীম খলীল আ. কে কাবাগৃহ নির্মাণের সম্মান দিয়েছেন, আর আমাদের নবী সাইয়্যেদে আলম স. কে সে গৃহে হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপন করার মর্যাদা প্রদান করেছেন। হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে হাদীছ শরীফে উক্ত হয়েছে, হাজরে আসওয়াদ আল্লাহ্তায়ালার দক্ষিণ হস্ত। কারও সাথে কোনো বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে তাঁর ডান হাত যেমন চুম্বন করা হয়ে থাকে, উক্ত পবিত্র পাথরকে তেমনি চুম্বন করা হয়। কিয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদের চক্ষু এবং জিহ্বা হবে। তাকে যে জিয়ারত করেছে সে লোকটিকে দেখে চিনবে এবং তার জিহ্বা দ্বারা তার জন্য শাফাআত করবে। সুতরাং বায়তুল্লাহ শরীফের নির্মাণের পূর্ণতায় হজরত ইব্রাহীম আ. এর চেয়ে রসুলেপাক স. এর অবদান অধিকতর শক্তিশালী ও পূর্ণ।

হজরত মুসা আ. ও নবী স.

আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসা আ. কে এই মোজেজা দান করেছিলেন যে, তাঁর হাতের লাঠি অজগর সাপ হয়ে যেতো। আমাদের পয়গম্বর স. কেও আল্লাহ্তায়ালা এরকম মোজেজা দান করেছিলেন। তা হচ্ছে উস্তুনে হান্নানা অর্থাৎ খেজুর গাছের ওই খণ্ড যাতে হেলান দিয়ে রসুলেপাক স. মসজিদে খোতবা দিতেন। খোত্বার জায়গায় যখন মিম্বর প্রস্তুত করা হলো, তখন তা সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো। তখন সেই উস্তুনে হান্নানা রসুলেপাক স. এর বিচ্ছেদের কারণে আল্লাহতায়ালার কাছে ফরিয়াদ করেছিলো এবং স্পষ্ট ভাষায় কান্নাকাটি করেছিলো। এ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে মোজেজা অধ্যায়ে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, একদিন আবু জাহেল ইচ্ছা করলো, রসুলেপাক স. কে বড় একটি পাথর মেরে পিষ্ট করে দিবে (নাউযুবিল্লাহ্)। একথা মনে করতেই সে দেখতে পেলো রসুলেপাক স. এর দুই কাঁধের উপর দু'টি অজগর সাপ বসে আছে। সে ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেলো।

হজরত মুসা স. এর মোজেজা ছিল ইয়াদে বায়দা (শুভ্র হস্ত)। তা থেকে বিকশিত ঔজ্জ্বল্যে মানুষের চোখ ঝলসে যেতো। আমাদের নবী সাইয়্যেদে আলম স. তো আপাদমস্তক নূর ছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা পরিপূর্ণতার সাথে তাঁকে যে সৌন্দর্য দান করেছিলেন, তার কারণে মানুষেরা নূরের তাজাল্লীতে দৃষ্টি হারানোর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকতো। তিনি যদি মানবতার পোশাক না পরতেন, তবে কারও পক্ষেই তাঁর দিকে দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হতো না। কেউই তাঁর সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারতো না। তাঁর সেই নূরের বিকাশ হজরত আদম আ. থেকে নিয়ে হজরত আব্দুল্লাহ্ পর্যন্ত পবিত্র পৃষ্ঠ ও পবিত্র গর্ভের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়ে আসছিলো।

হজরত কাতাদা ইবনে নোমান রা. একজন সাহাবী ছিলেন। ঝড় বৃষ্টির এক অন্ধকার রাত্রিতে তিনি রসুলেপাক স. এর সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করেছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁর হাতে একটি খেজুরের ডাল দিয়ে বললেন, যাও। এটা রাস্তার আশেপাশে দশহাত দশহাত পর্যন্ত আলো প্রদান করবে। বাড়ীতে পৌঁছে একটি কালো সাপ দেখতে পাবে তুমি। ওটাকে মেরে দূরে ফেলে দিও। আবু নাঈম এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

সহীহ্ বোখারী ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ আছে, হজরত উব্বাদ ইবনে বিশর এবং উসায়েদ ইবনে হুযায়র রা. একদা এক অন্ধকার রজনীতে রসুলেপাক স. এর খেদমত থেকে বের হলেন। তাঁদের উভয়ের হাতে লাঠি ছিলো। রাস্তায় বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের একজনের লাঠি আলোকিত হয়ে গেলো, আর তাঁরা সে আলোতে রাস্তা চলতে লাগলেন। কিছু দূর আসার পর তাঁরা যখন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, তখন উভয়ের লাঠিই আলোকিত হয়ে গেলো। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, রসুলেপাক স. তো নিজেই নূর ছিলেন। সেখান থেকেই সঞ্চারিত হয়েছে এই নূর। রসুলেপাক স. এর নাম সমূহের মধ্যে নূরও একটি নাম।

ইমাম বোখারী র. তারিখ কিতাবে, ইমাম বায়হাকী ও আবু নাঈম হামযা আসলামী রা. এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন– হামযা আসলামী বলেছেন, আমরা একবার রসুলেপাক স. এর সঙ্গে কোনো এক সফরে ছিলাম। অন্ধকার রাতে আমরা যখন রসুলেপাক স. থেকে আলাদা হলাম, তখন অকস্মাৎ আমার আঙ্গুলসমূহ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগলো এবং আলোগুলো পরস্পর মিলে যেতে লাগলো। স্পষ্ট অনুভব করলাম যে, কোনো আঙ্গুলের আলোই নিভছে না।

হাদীছ শরীফে এসেছে, রসুলে আকরম স. তাঁর জনৈক সাহাবীকে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তারা তাঁর কাছে অলৌকিকতার নিদর্শন দেখতে চাইলো, যা মুসলমানগণের সত্যতার

দলীল হতে পারে। রসুলেপাক স. তাঁর দু'খানা বৃদ্ধাঙ্গুলী উক্ত সাহাবীর দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করলেন। তাতে তাঁর দেহের উক্তস্থান শুভ্র ও নূরানী হয়ে গেলো। সাহাবী আরয করলেন, আমার ভয় হচ্ছে লোকেরা একে কুষ্ঠরোগ মনে করে কিনা। হজরত মুসা আ. এর ঘটনা সম্পর্কে কোরআন মজীদে উক্ত হয়েছে, 'এমন শুভ্রতা যার মধ্যে কোনো দোষ নেই।' এরপর রসুলেপাক স. শুভ্রতাকে ওই সাহাবীর লাঠির মধ্যে স্থানান্তরিত করে দিলেন।

প্রশ্ন জাগে, হজরত মুসা আ. সমুদ্রকে লাঠির আঘাতে বিভক্ত করেছিলেন। আমাদের নবী স. কি এমন করেছেন?

হাঁ, আমাদের নবী সাইয়্যেদে আলম স. হাতের আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। এতো আরও বিস্ময়কর ও মহান ঘটনা। কেননা হজরত মুসা আ. এর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিলো এই মাটি পানির পৃথিবীতে। আর আমাদের নবী স. এর ক্ষমতা বিস্তৃত ছিলো নভোজগতে। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, আসমান ও যমীনের মধ্যে 'মাকুকুফ' নামক একটি মহাসমুদ্র রয়েছে। পৃথিবীর সাগর উক্ত মহাসাগরের তুলনায় একটি বিন্দু। ওই মহাসাগর রসুলেপাক স. এর জন্য দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিলো। মেরাজ রজনীতে তিনি উক্ত সাগর পাড়ি দিয়ে দীদারে এলাহীতে গিয়েছিলেন। নিশ্চয় হজরত মুসা আ. কর্তৃক নীল দরিয়া দ্বিখণ্ডিত করার চেয়ে এই ঘটনা অধিকতর মর্যাদাশালী।

দোয়া কবুল প্রসঙ্গ

ফেরাউনকে নীল দরিয়ায় নিমজ্জিত করার জন্য হজরত মুসা আ. আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা তা কবুলও করেছিলেন। এটি ছিলো সীমিত পরিসরের দোয়া, আর রসুলেপাক স. যে আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়াসমূহ করেছিলেন এবং তা কবুল হয়েছিলো, তার কিন্তু কোনো সীমা নেই, হিসাব নেই।

পানি প্রবাহিত করা

হজরত মুসা আ. এর মোজেজা ছিলো, তিনি পাথর থেকে ঝর্ণা জারী করে দিয়েছিলেন। আর আমাদের পয়গম্বর স. এর মোজেজা এই, তিনি আপন আঙ্গুল থেকে ঝর্ণা জারী করে দিতেন। পাথর তো মাটি জাতীয় পদার্থ, আর মাটি থেকে পানি প্রবাহিত হওয়ার তুলনায় রক্তমাংশের দেহ থেকে পানি জারী হওয়া অধিকতর অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর।

আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে বাক্যালাপ

হজরত মুসা আ. এর ফযীলত বর্ণনায় হকতায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসা আ. এর সঙ্গে কথা বলেছেন।' আমাদের নবী সাইয়্যেদে আলম স. এর সঙ্গেও আল্লাহ্তায়ালা কথা বলেছেন শবে মেরাজে। দু'জন নবীর কালামের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল্লাহ্তায়ালা রসুলে আকরম স. এর সাথে একান্তে কথা বলেছেন, যা সংঘটিত হয়েছিলো সমগ্র নভোমণ্ডলের উপরে সিদ্রাতুল মুন্তাহার কাছে। আর তা হচ্ছে সৃষ্টিকুলের যাবতীয় এলেমের শেষ সীমা। আর হজরত মুসা আ. এর সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার একান্ত কথা হয়েছিলো সীনাই পর্বতে। রসুলে আকরম স. এর সঙ্গে আল্লাহ্পাকের আলাপনের স্থান পাহাড় নয়, জগত নয়, আকাশ নয়। বরং আকশসমূহেরও ঊর্ধ্বে।

ভাষার প্রাঞ্জলতা ও অলংকার গুণ

হজরত হারুন আ. কে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও অলংকরণের বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছিলো। যেমন হাদীছ শরীফে উক্ত হয়েছে হারুন আ. সম্পর্কে হজরত মুসা আ. এর ভাষ্য, আমার ভাই হারুনের ভাষা আমার চেয়ে প্রাঞ্জল। আমাদের পয়গম্বর সাইয়্যেদে আলম স. এর ভাষার প্রাঞ্জল্য ও অলংকার গুণ এতো অধিক ছিলো যে, তার গভীরতা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। হজরত হারুন আ. এর ফাসাহাত বা প্রাঞ্জলতা কেবল ইবরানী ভাষাতে ছিলো। কিন্তু আরবী ভাষা তার চেয়ে অধিকতর ফাসাহাতপূর্ণ। তদুপরি হজরত মুসা আ. বলেছেন, আফসাহুমিন্নী অর্থাৎ 'আমার চেয়ে অধিক প্রাঞ্জল।' এখানে তিনি মুতলাক বা সাধারণভাবে বলেননি। অর্থাৎ সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ছিলো– একথা বলেননি। কেননা হজরত মুসা আ. এর বাচনে জড়তা ছিলো।

হজরত ইউসুফ আ. ও নবী পাক স.

হজরত ইউসুফ আ. কে সৌন্দর্যের অর্ধাংশ আর আমাদের নবী সাইয়্যেদে আলম স. কে সৌন্দর্যের পুরো অংশ প্রদান করা হয়েছে। নবী করীম স. এর হুলিয়া মোবারক সম্পর্কিত বর্ণনাদৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয়। তাঁর মতো পরিপুর্ণ রূপ ও সৌন্দর্যের অধিকারী কেউই নন। হবেনও না। তবে হজরত ইউসুফ আ. এর সৌন্দর্য সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে, সৌন্দর্যের চোখ ধাঁধানো চাকচিক্য তাঁর চেহারায় ছিলো। কিন্তু রসুলেপাক স. এর সর্বাঙ্গে এমন এক মনোহর বিভা বিস্তৃত ছিলো, যা আর কারও মধ্যে ছিলো না।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

হজরত ইউসুফ আ. স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তবে তাঁর ব্যাখ্যা মাত্র তিনটি স্বপ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। ১. চন্দ্র সূর্য ও তারকারাজি ইউসুফ আ. কে সেজদা করেছিলো বলে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন ২. কয়েদখানায় তাঁর দুজন কয়েদী সঙ্গী যে স্বপ্ন দেখেছিলো। আর ৩. ওই সময়ের বাদশাহ্ যে স্বপ্ন দেখেছিলো, তার ব্যাখ্যা। কিন্তু আমাদের পয়গম্বর এর ব্যাখ্যা ও ভাবার্থের সংখ্যা ছিলো গণনার পরিসীমা বহির্ভূত।

হজরত দাউদ আ. ও রসুল পাক স.

হজরত দাউদ আ. লোহার উপর হাত রাখলে লোহা নরম হয়ে যেতো। তাঁর আরেকটি মোজেজা ছিলো, তিনি শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের উপর হাত রাখলে কাষ্ঠখণ্ডটি সজীব হয়ে যেতো এবং তা থেকে সবুজপাতা গজিয়ে উঠতো। আর উম্মে মা'বাদ রা. এর কৃষকায়, দুর্বল ও হাড্ডিসার বকরিটির স্তন রসুলেপাক স. এর পবিত্র হাতের সংস্পর্শে তরতাজা হয়ে গিয়েছিলো এবং সাথে সাথে তা থেকে দুধ নির্গত হয়েছিলো। বকরিটি এতো বেশী দুধ দিতো, যা অন্যান্য বকরী দিতে পারতো না। দাউদ আ. এর হাতের স্পর্শে যদি লোহা নরম হয়ে থাকে, তবে আমাদের পয়গম্বর সাইয়েদে আলম স. এর খাতিরেও তো কঠিন প্রস্তরখণ্ড কোমল হয়ে গিয়েছিলো।

হাফেজ আবু নাঈম বর্ণনা করেন, রসুলেপাক স. যখন হেরা গুহায় আশ্রয়স্থান নির্বাচন করে প্রথমে পবিত্র মস্তক প্রবেশ করালেন, তখন কঠিন প্রস্তরগুলো প্রশস্ত হয়ে যেতে লাগলো। এতে বুঝা যায়, পাথর তাঁর জন্যই নরম হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর বাহুর প্রভাবে পাথরগুলো আটার ন্যায় নরম হয়ে গিয়েছিলো। এরপর সে পাথরে তিনি বাহনের জানোয়ার বেঁধেছিলেন। হজরত দাউদ আ. এর সঙ্গে পাহাড়ও তসবীহ পড়েছিলো। আর রসুলেপাক স. এর পবিত্র হাতের ভিতর থেকে পাথর তসবীহ পড়েছিলো।

হজরত সুলায়মান আ. ও রসুলে আকরম স.

হজরত সুলায়মান আ. পাখির ভাষা জানতেন। জ্বীন ও বাতাস তাঁর বাধ্য ছিলো। আরেকটি মোজেজা ছিলো তার বাদশাহী। ওরকম বাদশাহী অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। এখন দেখা যাক, আমাদের নবী স.কে এরূপ কোনো মোজেজা দেয়া হয়েছিলো কিনা। হাঁ, তাঁকেও এরকম, বরং এর চেয়েও বেশী বিস্ময়কর মোজেজা দেয়া হয়েছিলো। হজরত সুলায়মান আ. কে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া সম্পর্কে কোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে, 'সুলায়মান বলেন, আমাকে পাখির ভাষা শিক্ষা

দেয়া হয়েছে।' পাখিরা যা বলতো তিনি তা বুঝতেন। আর আমাদের পয়গম্বর আ. এর পবিত্র হাতের ভিতরে জড়পদার্থ পাথর বাকশীল হতো এবং তসবীহ পাঠ করতো। অথচ পাথর জড় পদার্থ। পাখির মতো প্রাণী নয়। পাখির কথা বলা বা তা বুঝার চেয়ে জড় পদার্থের কথা বলা এবং বুঝা অধিকতর বিস্ময়কর। আবার দেখা যায়, বিষমিশ্রিত জবেহকৃত বকরী তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে। হরিণী কথা বলেছে। বর্ণিত আছে, একদা একটি পাখি রসুলেপাক স. এর পবিত্র মস্তকের উপরে এসে চক্কর দিতে লাগলো এবং কথা বলতে লাগলো। রসুলেপাক স. তখন উপস্থিত লোকজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কে এই পাখিটির বাচ্চা ধরে এনেছো! যেই এনে থাকো, বাচ্চাটি তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। এভাবে তিনি দুম্বার সাথেও কথা বলেছেন।

এখন আসা যাক বাতাসের উপর সুলায়মান আ. এর অধিকার প্রসঙ্গে। এমর্মে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন 'হাওয়া সুলায়মান আ. এর সিংহাসনকে তার ইচ্ছা মোতাবেক বয়ে নিয়ে যেতো।' রসুলেপাক স. কে এমন কিছু কি দেয়া হয়েছিলো? হাঁ, তাঁকে বুরাক প্রদান করা হয়েছিলো, যা বাতাসের চেয়েও দ্রুততর। এমনকি বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুতগামী। আর সে বুরাক তাঁকে এক মুহূর্তে ফরশ থেকে আরশ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলো। হজরত সুলায়মান আ. এর জন্য বাতাসকে অনুগত করে দেয়া হয়েছিলো। যাতে সে তাঁকে যমীনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। আর আমাদের নবী করীম স. এর জন্য যমীনকে সামনে এনে দেয়া হয়েছিলো যাতে রসুলেপাক স. স্বস্থানে থেকেই তা অবলোকন করতে পারেন। এ দু'জনের ব্যবধান এরকম— যেমন দুজন মানুষ, একজন দৌড়ে যমীনের এদিক সেদিক যাতায়াত করে। আর একজনের দিকে যমীন নিজেই এগিয়ে আসে।

শয়তান সুলায়মান আ. এর অনুগত ছিলো। হাদীছ শরীফে এসেছে, একবার শয়তান রসুলেপাক স. এর নামাজের সামনে এসে গেলে তিনি শয়তানটিকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলতে চাইলেন, যাতে মহল্লার ছেলেপেলেরা তাকে নিয়ে খেলা করতে পারে। জ্বীনেরা হজরত সুলায়মান আ. এর অনুগত ছিলো। আর আমাদের নবী স. এর উপর তো জ্বীনেরা ইমানই এনেছিলো। হজরত সুলায়মান আ. জ্বীনদের নিকট থেকে খেদমত নিয়েছেন। আর আমাদের নবী স. জ্বীনদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। হজরত সুলায়মান আ. এর বাহিনীতে মানুষ, জ্বীন ও পাখি ছিলো। আর রসুলে আকরম স. এর বাহিনীতে ছিলো ফেরেশতাবৃন্দ। এমনকি হজরত জিব্রাইল ও মিকাইল। হজরত সুলায়মান আ. এর বাহিনীতে পাখিদের অংশগ্রহণের চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার ছিলো নবী করীম স. এর ছুর পর্বতের সেই কবুতরের ঘটনা। রসুলে আকরম স. যখন হিজরতের সময় ছুর পর্বতের গুহায় অবস্থান নিয়েছিলেন, তখন কবুতর এসে গুহামুখে বাসা বানিয়ে

ডিম পেড়েছিলো। এভাবে সে রসুলেপাক স. কে শত্রু থেকে রক্ষা করেছিলো। সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যতো হয়ে থাকে রক্ষা করা। আর একাজটি পাখিই করেছে। হজরত সুলায়মান আ. কে এমন বাদশাহী দেয়া হয়েছিলো, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। আমাদের নবী স. কে দেয়া হয়েছিলো আরও বেশী, তিনি বাদশাহ্ অথবা বান্দা— এ দুটোর যে কোনোটি হতে পারেন। রসুলে আকরম স. বন্দেগীকেই গ্রহণ করেছিলেন। আর বন্দেগী এমন এক বিশাল রাজত্ব, যা কখনও লুপ্ত হয় না। আর রসুলে আকরম স. ছিলেন এই সাম্রাজ্যের অতুলনীয় এবং অক্ষয় সম্রাট।

হজরত ঈসা আ. ও রসুলেপাক স.

হজরত ঈসা আ. অন্ধকে চক্ষুদান, কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করে দেয়া এবং মৃতকে জীবিত করে দেয়া ইত্যাদি করতে পারতেন। আমাদের নবী স. কেও এরকম মোজেজা দেয়া হয়েছিলো। দেখা যায়, তিনি হজরত আবু কাতাদা রা. এর চোখ, যা কোটর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো, তা যথাস্থানে সংস্থাপন করে দিয়েছিলেন এবং তা পূর্বের চেয়ে আরও ভালো হয়েছিলো। বর্ণিত আছে, হজরত মুআয ইবনে আকরা রা. এর স্ত্রী কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি রসুলে আকরম স. এর দরবারে এসে এ ব্যাপারে আর্জি পেশ করলে রসুলে আকরম স. আপন হাতের লাঠি দ্বারা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্থানটি ঘষে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর কুষ্ঠরোগ ভালো হয়ে গেলো।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়াতে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. এবং দালায়েলুন্নবুওয়াতে ইমাম বায়হাকী র. একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে— এক ব্যক্তি রসুলে আকরম স. এর কাছে এসে বললো, আমি ইমান আনবো যদি আপনি আমার মৃত কন্যা সন্তানটিকে জীবিত করে দিতে পারেন। রসুলেপাক স. তখন তার কন্যার কবরের কাছে গিয়ে ডাক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কন্যাটি কবর থেকে বের হয়ে বললো, আমি আপনার খেদমতে হাজির হে আল্লাহ্র রসুল। এরকম মৃতকে জীবিত করা রসুলেপাক স. কর্তৃক কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিলো। অধিকন্তু তাঁর পবিত্র হতের মধ্যে পাথরের তসবীহ পাঠ, হাজরে আসওয়াদের সালাম প্রদান এবং তাঁর বিচ্ছেদে উস্তুনে হান্নানার বিলাপ ইত্যাদি ব্যাপার তো মৃতকে জীবিত করার চেয়েও অধিকতর বিস্ময়কর। হজরত ঈসা আ.কে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর আমাদের নবী স.কে মেরাজের রাত্রিতে আকাশের চেয়েও ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই মাকামে কারও পক্ষেই যাওয়া সম্ভব হয়নি। শুধু তাই নয়, সেখানে নেওয়ার পর তাঁকে অধিকতর মর্যাদায় বিভূষিত করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ সুবহানাহু কুদ্দুস এর সাথে একান্ত আলাপন এবং বিভিন্ন প্রকারের কুদরত

অবলোকন ইত্যাদি। মোটকথা সমস্ত আম্বিয়া কেরামকে যতো প্রকারের মোজেজা প্রদান করা হয়েছিলো তা সবই রসুলে আকরম স. কে অধিকতর পূর্ণতার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ ফযীলত ও মোজেজা

উপরে যে সমস্ত ফযীলত ও মোজেজার কথা আলোচনা করা হলো, তা ছিলো এমন ফযীলত ও মোজেজা যা রসুলেপাক স. ও অন্যান্য আম্বিয়া কেরামকে সাধারণভাবে প্রদান করা হয়েছিলো। এছাড়া এমন অনেক মোজেজা ও ফযীলত রয়েছে, যা কেবল রসুলেপাক স. কেই দেয়া হয়েছে। এগুলোও সংখ্যা ও গণনার বহির্ভূত। এর মধ্যে যে পরিমাণ প্রকাশিত হয়েছে এবং উলামায়ে কেরামের এলেমের আয়ত্তে আছে, তা দু' প্রকার। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এজাতীয় যা শরীয়তের আহকামের পর্যায়ভুক্ত। আর অপরটি হচ্ছে সিফাত আহওয়াল ও মোজেজার পর্যায়ভুক্ত। কোনো কোনো আহলে এলেম এরকম বলে থাকেন যে, প্রথমোক্তটি সম্পর্কে আলোচনা করা ফায়দাহীন। এগুলো হচ্ছে এমন আহকাম, যা সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে এসম্পর্কে বিশুদ্ধ মত এই যে, ওই বিষয়গুলো থেকেও দৃষ্টি সরানো সম্ভব নয়। এর আলোচনার মধ্যে তো প্রথম ফায়দা হচ্ছে, এদ্বারা রসুলেপাক স. এর পবিত্র হাল সম্পর্কে জানা যায়। নিঃসন্দেহে এবিষয়ে পর্যালোচনা করা এমন এক সৌভাগ্যশীলতা যা সর্বপ্রকারের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও মহান। তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্যের জন্য তো তাঁকে জানা এক অপরিহার্য কাজ। উপরোক্ত প্রথম প্রকারটিকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম প্রকার ওই সমস্ত বৈশিষ্ট্য, যা ছিলো ওয়াজিবের ভিত্তিতে । এর হেকমত হচ্ছে, নৈকট্য ও মর্যাদার মধ্যে যেনো প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। ফরজের মাধ্যমে যে নৈকট্য লাভ হয়, তা নফলের নৈকট্যের চেয়ে অধিকতর পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। হাদীছ শরীফে তার প্রমাণ রয়েছে। যেহেতু আরোপিত কাজের ভার বহন করা শক্ত কাজ। তাই তার পুরস্কারও বড়। এ প্রসেঙ্গ প্রত্যেক প্রকারের সাথে সাথে কিছু কিছু উদাহরণ পেশ করেছি। এ প্রকারটির উদাহরণ ভালোভাবে বোধগম্য হওয়ার জন্য উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতির অবতারণা করেছি।

এমর্মে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে। যেমন ধরা যাক, দোহার নামাজের প্রসঙ্গ। এটি রসুলে আকরম স. এর উপর ওয়াজিব ছিলো। কিন্তু সঠিক মাসআলা এর বিপরীত। যদিও এক হাদীছে এসেছে, রসুলেপাক স. বলেন, আমাকে দোহার দু' রাকাত নামাজ পড়ার আদেশ করা

হয়েছে। এক্ষেত্রে আসল ব্যাপার হচ্ছে, দোহার নামাজ সুন্নতে মুআক্কাদা। এখানে আদেশটি ওয়াজিবের জন্য নয়। আর দোহার নামাজ বলতে এখানে ওই নামাজকে বুঝানো হয়েছে, যা সূর্য উদয় হওয়ার কিছুক্ষণ পর পড়া হয়ে থাকে। লোকেরা যাকে এশরাকের নামাজ বলে। আবার সালাতুদ্দোহা বলতে চাশতের নামাজকেও বুঝায়। উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর দ্বারা চাশতের নামাজকেই বুঝিয়েছেন। যেমন বেতেরের নামাজ ও ফজরের দু'রাকাত সুন্নত নামাজের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে। ইমাম হাকেম স্বীয় গ্রন্থ মুস্তাদরেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরবানীর হাদীছে এসেছে, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, তিনটি জিনিস আমার উপর ফরজ, আর সে তিনটি তোমাদের জন্য নফল। এগুলো হচ্ছে বেতের, ফজরের দু'রাকাত এবং দোহার দু'রাকাত। বেতেরকে নির্ধারণ করার কথাটি ইমাম শাফেয়ী র. এর মত। ইমাম আযম আবু হানিফা র. এর মতে বেতের সকলের উপরই ওয়াজিব। যেমন তাহাজ্জুদের নামাজ রসুলে আকরম স. এর উপর ফরজ ছিলো। কেউ কেউ বলেন, তাহাজ্জুদের নামাজ উম্মতের উপরও ফরজ ছিলো। পরে তার ফরজিয়াতের বিধান উম্মতের উপর থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কোনো কোনো শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেম বলে থাকেন, রসুলে আকরম র. এর উপর থেকেও ফরজিয়াতের বিধান উঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

মেসওয়াকের বিধানও এরকমই। হাদীছ শরীফে এসেছে, রসুলে আকরম স. প্রত্যেক নামাজের সময় মেসওয়াকের সাথে অজু করার ব্যাপারে আদিষ্ট ছিলেন। কিন্তু পরে যখন এ আমল কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হলো, তখন নামাজের পূর্বে শুধু মেসওয়াক করার আদেশ করা হলো। অর্থাৎ অজু অবস্থায় পুনরায় অজু করতে হতো না। কিন্তু মেসওয়াক অবশ্যই করতে হতো। এছাড়া অন্য হাদীছেও মেসওয়াক সম্পর্কে হুকুম করা হয়েছে। এসকল হাদীছ অকাট্য ওয়াজিবকে প্রমাণ করে না।

দ্বিতীয় প্রকার বৈশিষ্ট্য ছিলো হারাম সম্পর্কিত। অর্থাৎ ওই সকল আহকাম যা রসুলে আকরম স. এর উপর হারাম– তবে অন্য কারও উপর হারাম নয়। যেমন যাকাতের মাল গ্রহণ করা, রসুলেপাক স. এর উপর হারাম। সদকা হারাম। এটা বিশুদ্ধ ও বিখ্যাত উক্তি। যেমন রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, আমরা সদকার মাল খাই না। হাদীছখানা ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এখানে প্রকাশ্য কথা এই যে, এগুলো খাওয়ার নিষিদ্ধতা শরীয়ত কর্তৃক হারাম হওয়ার ভিত্তিতেই হয়েছে। অবশ্য এ সম্পর্কে কেউ কেউ আবার এরকমও বলেন, এগুলো রসুলেপাক স. এর জন্য খাওয়া নিষেধ হলেও হারামকে অপরিহার্য করে না। সম্ভবতঃ এসব ক্ষেত্রে মাকরুহে তানযিহী হিসাবে নিষেধ করা হয়েছে, হারাম হিসাবে নয়। যাই

হোক সদকার মাল বর্জন করা রসুলেপাক স. এর বিশেষত্বের পর্যায়ভুক্ত, চাই তা তাহরিমী হিসাবে হোক, বা তানযিহী হিসাবে। শুধু তাই নয়, রসুলেপাক স. এর বংশধর এবং গোলামগণের জন্য তদ্রূপ যাকাত গ্রহণ করা হারাম। ফেকাহ্‌র কিতাবে এরকমই নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ইমাম আবু হানিফা র. এর জামানায় এর বৈধতা সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। এভাবে ওই সকল জিনিস খাওয়াও হারাম, যা থেকে দুর্গন্ধ আসে, যেমন রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি। এ সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বর্ণনা এসেছে। লেখা ও কবিতা রচনা করা— এসবও তাঁর জন্য হারাম। এই হারামের ব্যাপারটি এ পরিপ্রেক্ষিতে যে, কবিতা জানা বা রচনা করাটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিলো। সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, দু'টি জিনিস রসুলেপাক স. এর স্বভাববিরুদ্ধ ছিলো। তার বিস্তারিত উল্লেখ হোদাইবিয়ার সন্ধির বর্ণনায় আসবে ইনশাআল্লাহ্। আরেকটি জিনিস তাঁর জন্য হারাম ছিলো। তা হচ্ছে, যুদ্ধের সময় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার পর যুদ্ধ সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত অস্ত্র পরিহার করা। এটাও ছিলো তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আরেকটি বস্তু ছিলো তাঁর জন্য হারাম। তা হচ্ছে অমুসলিম কিতাবিয়া কোনো রমণীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা। কারণ, রসুলেপাক স. এর স্ত্রীগণ সকলেই মুসলমানদের মা। আর তাঁরা জান্নাতেও তাঁর স্ত্রী হিসেবেই বসবাস করবেন। কাজেই তাঁর পবিত্র লুৎফা কোনো কাফের রমণীর রেহেমে রাখা যেতে পারে না। তদ্রূপ মুসলমান বাঁদীকে বিবাহ করাও তাঁর জন্য হারাম ছিলো। তবে হাঁ বাঁদীকে নিয়ে নিশিযাপন বৈধ ছিলো।

তৃতীয় প্রকারের বৈশিষ্ট্য ওই সকল মোবাহ যা রসুলে আকরম স. এর জন্যই নির্ধারিত ছিলো। যেমন নিদ্রায় অজুভঙ্গ না হওয়া। কেউ কেউ অবশ্য বলে থাকেন, নিদ্রাতে অজু ভঙ্গ না হওয়া সকল নবীর বেলায়ই প্রযোজ্য। এরকম আরও আছে। যেমন আসরের নামাজের পর নফল নামাজের বৈধতা। বেতের নামাজ ওয়াজেব সত্ত্বেও সওয়ারীর উপর বসে আদায় করার বৈধতা। গায়েব ব্যক্তির উপর জানাযার নামাজ পড়া। সওমে বেসাল (বিরতিহীন রোজা রাখা)। এর বিস্তারিত উল্লেখ রোজার বর্ণনায় আসবে ইনশাআল্লাহ্! রমণীদের প্রতি দৃষ্টিপাত দেয়া এবং তাদের সাথে নির্জনাবস্থায় অবস্থান করা। চারজনের অধিক বিবাহ করার বৈধতা অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমাদের নবী স. এর জন্য নয়জনের অধিক বিবাহ করার বৈধতা ছিলো। তাঁর স. জন্য আরেকটি জিনিস বৈধ ছিলো। তা হচ্ছে, কোনো নারী তার অভিভাবক বা সাক্ষী ছাড়াই নিজেকে নবী করীম স. এর নিকট সম্প্রদান করলে বিবাহ বৈধ হয়ে যেতো এবং মহরবিহীন অবস্থাতেই বৈধ হতো। আরেকটি ব্যাপারও বৈধ ছিলো। তিনি কোনো রমণীকে কোনো পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিতে পারতেন তার মতামত বা তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই।

তিনি কোনো স্বামীবিহীন নারীকে বিবাহ করার আগ্রহ প্রকাশ করলে সে নারীর জন্য জরুরী হয়ে যেতো তাঁকে কবুল করা। এধরনের নারী অন্যের জন্য হারাম। আর সেই নারী সধবা হলে স্বামীর উপর অবশ্য ফরজ হবে না তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়া। অবশ্য এস্থলে তার ইমানের পরীক্ষা রয়েছে। যেমন রসুল করীম স. এরশাদ করেছেন, ওই পর্যন্ত তোমরা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কাছে তোমাদের জীবন, পরিবার, সন্তান ও অন্য মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হবো। কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি এমন হয় যে, তার খাদ্যপানীয়য়ের ব্যবস্থা আছে, অথচ এগুলো তার নিজেরই প্রয়োজন, এমতাবস্থায় যদি রসুলেপাক স. এর প্রয়োজন পড়ে তবে ওগুলো তাঁকেই দিয়ে দিতে হবে এবং নিজেকেও তাঁর জন্য কোরবান করতে হবে।

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'নবী মুসলমানদের নিকট তাদের জানের চেয়েও অধিকতর হকদার।' হজরত যায়েদ রা. ও হজরত যয়নব রা. এর ঘটনার তাৎপর্য এটাই। উক্ত ঘটনার সার কথা এই যে, আল্লাহ্তায়ালা হজরত যয়নব রা. এর বিয়ের আকদ নবী করীম স. এর সাথে করিয়ে দিলেন এবং হজরত যয়নব রা. এর প্রতি হজরত যায়েদ রা. এর মনে অনীহা সৃষ্টি করে দিলেন। এই ঘটনায় দুর্বল বিশ্বাসীরা গোমরাহীতে পতিত হবে বলে রসুলেপাক স. আশংকা করেছিলেন। তখন আল্লাহ্তায়ালা ওহী নাযিল করলেন, হে আমার বন্ধু! আপনি আমাকেই ভয় করুন। আল্লাহ্র বিধানের খেলাফ করবেন না। মানুষকে ভয় করার প্রয়োজন কী? তখন রসুলেপাক স. নির্দ্বিধায় হজরত যয়নবের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

কোনো কোনো মুফাস্সির এবং ইতিহাসবিদ এ প্রসঙ্গে অবশ্য বলেছেন, একাজ নবুওয়াতের শানের উপযোগী নয়। মুহাককেকগণ এ ধরনের তাফসীরকারদেরকে ভ্রান্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। এরকম ঘটনা ঘটেছে হজরত ইউসুফ আ. এবং জুলায়খার বেলায়।

হজরত দাউদ আ. ও আদরিয়ার বেলায়ও এরকম ঘটেছে। আম্বিয়া আ. গণের মাকাম সাধারণের মাকামের ঊর্ধ্বে। এতক বা গোলাম মুক্ত করাকে মহরের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। যেমন হজরত সুফিয়া রা. এর বেলায় হয়েছে। সহধর্মিণীগণের জন্য খোরপোষ প্রদান করা রসুলেপাক স. এর উপর ওয়াজিব কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা নববী র. বলেন, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, খোরপোষ প্রদান করা ওয়াজিব। এর সাথে তিনি একথাটিও বলেছেন, বিবিগণের মধ্যে পালা রক্ষা করা রসুলেপাক স. এর উপর ওয়াজিব নয়। অধিকাংশ হানাফী মতাবলম্বী আলেম এই মতের পক্ষে। পালা রক্ষা করার ব্যাপারে রসুলেপাক স. স্ত্রীগণের প্রতি যা করেছেন, তা ছিলো তাঁর অনুগ্রহ। এটা তাঁর উপর ওয়াজিব ছিলো না।

উলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, এ সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে সন্নিবেশিত করার কারণ এই যে, রসুলে আকরম স. এর ক্ষেত্রে বিবাহ নেহায়েত নিশিযাপনের বিধান রাখে। সকল নারী ও পুরুষ তাঁর জন্য গোলাম ও বাঁদী তুল্য। গনিমতের মাল থেকে বাঁদী, তলোয়ার ইত্যাদি যথেচ্ছ গ্রহণ করা রসুলে আকরম স. এর জন্য মোবাহ ছিলো। মক্কায় যুদ্ধ করা, এহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা তাঁর জন্য মোবাহ ছিলো। এর বিস্তারিত আলোচনা ফতহে মক্কা অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই ছিলো যে, তিনি তাঁর এলেম সম্পর্কে নিজের জন্য এবং নিজের বংশধরদের জন্য হুকুম করতেন। তাছাড়া তাঁর সাক্ষ্য তাঁর নিজের জন্য এবং নিজের বংশধরদের জন্য প্রয়োগ করতেন। তিনি কাউকে মন্দ বললে অথবা লানত করলে তা তার জন্য কুরবত ও রহমত হয়ে যেতো এবং এটা ছিলো তাঁর জন্য মোবাহ। আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিলো, তিনি কোনো ভূখণ্ড বিজিত হওয়ার পূর্বেই বণ্টন করতেন। কেননা মালিকুল মুলক আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সমস্ত ভূখণ্ড ও রাজত্বের মালিক বানিয়েছিলেন। ইমাম গাযযালী র. বলেছেন, রসুলেপাক স. যখন জান্নাতের যমীনকে বণ্টন করবেন, তখন দুনিয়ার যমীন বণ্টন করাতে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়।

বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও অবস্থা

বিধানগত হিশেবে নয়, বরং গুণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, রসুলে আকরম স. এর ওই বৈশিষ্ট্যনিচয় সংখ্যা ও হিসাবের আওতায় পড়ে না। বিশেষ করে ওই গুণাবলী ও অবস্থা যা বাতেনের সাথে সম্পৃক্ত। সেই রহস্যে পৌঁছতে কেউই সক্ষম নয়। তবে যাহেরী কিছু গুণা আলোচনার অন্তর্ভূত হয়েছে। কেননা এগুলোকে উলামায়ে কেরাম সংখ্যায় নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এগুলো সবই মোজেজার পর্যায়ভুক্ত। মোজেজাগুলো আবার এমন যে, এরকম মোজেজা অন্য কোনো নবী কর্তৃক প্রকাশিত হয়নি। তাই সেগুলোকে মহত্বের ও আধিক্যের কারণে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

রসুলে আকরম স. এর সব চেয়ে উন্নত ও পরিপূর্ণ মর্যাদা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর পবিত্র রূহকে সকল মাখলুকের রূহ সৃষ্টি করার পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সকল সৃষ্টির রূহ তাঁর রূহ থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ওই সময়ও নবী ছিলেন, যখন আদম আ. ছিলেন রূহ ও দেহের মাঝামাঝি। ইমাম তিরমিযী হজরত আবু হুরায়রা রা. এর মাধ্যমে এই বিবরণ দিয়েছেন। রূহের জগতে আম্বিয়া কেরামের পবিত্র রূহসমূহকে তাঁর রূহ থেকে ফয়েজ প্রদান করেছেন।

রসুলেপাক স. এর সূর্যতুল্য রূহ যতদিন অন্তরালে ছিলো ততদিন অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের তারকাতুল্য রূহসমূহ উক্ত সূর্য থেকে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে জাহেরী জগতে চমকিত ছিলো। তাঁর নবুওয়াতের সূর্য যখন উদিত হলো, প্রকাশ্যজগতে

আত্মপ্রকাশ করলো, তখন উক্ত তারকাসমূহ হয়ে গেলো দ্যুতিহীন। যখন তারকারাজি উদিত হয়, তখন নভোমণ্ডল তাদের রঙ রূপে চকমক করতে থাকে। কিন্তু প্রত্যুষে সূর্য যখন তার উজ্জ্বল কিরণ ছড়িয়ে আসে, তখন নক্ষত্রমণ্ডলী হয়ে পড়ে আলোহীন। হজরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, সৃষ্টি হিসেবে আমি নবীগণের পূর্বে আর জাহেরী জগতের আবির্ভাবে সকলের পরে। তাঁর এটিও একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তিনি রোজে আযলে 'আলাসতু বিরব্বিকুম' প্রশ্নের জবাবে সর্বপ্রথম 'বালা' (হাঁ) বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন। হাদীছ শরীফে এসেছে– আদম, আলম, আলমের সৃষ্টি, সবকিছুর মূল কারণ হচ্ছে রসুলেপাক স. এর সৃষ্টি। এটাও তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর পবিত্র নাম আরশের উপর, জান্নাতের দরওয়াজাসমূহে, সবস্থানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নবীগণের নিকট থেকে তাঁর ব্যাপারে এই মর্মে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে যে, তাঁরা যখনই আবির্ভূত হবেন, তখন আখেরী পয়গম্বর মোহাম্মদ স. এর উপর ইমান আনবেন। এই অঙ্গীকার সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ হচ্ছে, 'ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন আল্লাহ্তায়ালা সকল নবীর নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন।' তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে তাঁর মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের বিবরণ এবং সুসংবাদ রয়েছে। তাঁর বংশধারায় উপরের দিকে আদম আ. পর্যন্ত তাঁর কারণেই কোনো ব্যভিচার সংঘটিত হয়নি। এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তাঁর বেলাদত শরীফের অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক যুগের শ্রেষ্ঠ সময়ে, শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়ে এবং শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে তাঁর বংশক্রম জারী রেখেছেন। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আদম সন্তানদের ভিতর বনী কেনানাকে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। বনী কেনানা থেকে কুরায়েশকে। কুরায়েশ থেকে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশেম থেকে আমাকে বেশী মর্যাদা দিয়েছেন। সুতরাং রসুলেপাক স. ধন্যদের ধন্য, উত্তমদের উত্তম এবং মনোনীতদের মনোনীত। তাঁর জন্মের সময় সকল মূর্তি মস্তকাবনত হয়ে পড়ে গিয়েছিলো। মাতৃগর্ভ থেকে খতনাকৃত, নাভী কাটা এবং পাক সাফ অবস্থায় তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেজদা করেছিলেন এবং সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো আকাশের দিকে। ভূমিষ্ঠকালে শাহাদাত আঙ্গুল ঊর্ধ্বমুখি ছিলো। ভূমিষ্ঠকালে মা জননী সাইয়্যেদা আমেনা রা. দেখতে পেয়েছিলেন, একটি নূর উদ্ভাসিত হয়ে শামদেশের বালাখানা ও মহলসমূহকে আলোকিত করে দিচ্ছে। তাঁর দোলনা মোবারককে ফেরেশতারা দোলা দিয়েছিলেন। দোলনায় থেকে তিনি কথা বলেছেন। ইতিহাসবিদগণ বলেন, তখন চন্দ্র তাঁর সাথে কথোপকথন করতো। তিনি চাঁদকে যেদিকে ইশারা করতেন

সেদিকেই সে হেলে যেতো। তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, তিনি যখন রোদে চলাফেরা করতেন, তখন মেঘখণ্ড তাঁকে ছায়া দিতো। এরকম ঘটনা সর্বদাই ঘটতো এমন নয়। কয়েকবার এরকম হয়েছিলো। বাল্যকালে যখন তিনি চাচা আবু তালেবের সঙ্গে সফরে গিয়েছিলেন, তখন বুহায়রা নামক পাদ্রী তাঁকে দেখামাত্র চিনে নিয়েছিলো।

বক্ষ সম্প্রসারণ তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। বক্ষ সম্প্রসারণ চার বার সংঘটিত হয়েছিলো। প্রথমবার– বাল্যবেলায়, যখন তিনি বনীসাআদ গোত্রে ছিলেন। দ্বিতীয়বার হয়েছিলো দশবৎসর বয়সে। তৃতীয়বার হয়েছিলো নবুওয়াতপ্রাপ্তির সময়। আর চতুর্থবার হয়েছিলো শবে মেরাজে।

তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি– ওহীর প্রথম ঘটনায় হজরত জিব্‌রাইল আ. তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং তাঁর পবিত্র সত্তার অভ্যন্তরে রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। উলামায়ে কেরাম এটাকেও তাঁর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভূত বলেন। তাঁরা বলেন, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো নবীর বেলায় এধরনের ঘটনা ঘটেনি। তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর আর একটি– আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর পবিত্র দেহের অঙ্গসমূহের উল্লেখ করেছেন কোরআন মজীদে। তাঁর কলবে আতহারের উল্লেখ রয়েছে এই আয়াতে, 'জিব্‌রাইল আমীন কোরআন নিয়ে আপনার কলবে অবতীর্ণ হয়।' তাঁর যবান মোবারকের কথা রয়েছে এভাবে— 'নিশ্চয়ই আমি কোরআনকে আপনার রসনায় সহজ করে দিয়েছি'।

আল্লাহ্‌পাক আরও বলেন, 'তাঁর যবান স্বীয় প্রবৃত্তি অনুসারে বলেনি'– চক্ষু সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তাঁর দৃষ্টি বক্র হয়নি, দৃষ্টিবিচ্যুত হয়নি।' চেহারা মোবারকের কথা বলা হয়েছে 'আপনার আকাশের দিকে মুখ তুলে বারবার তাকানোকে আমি দেখেছি।' হাত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'আপনার হাতকে কাঁধের দিকে আবদ্ধ করে রাখবেন না।' বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'আমি কি আপনার বক্ষকে সম্প্রসারিত করিনি? আর যে গুরুভার আপনার পৃষ্ঠদেশকে ভেঙে ফেলার উপক্রম করেছিলো, তা কি আমি সরিয়ে দেইনি?'

এ সকল আয়াতে রসুলেপাক স. এর দেহের বিভিন্ন অঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। এগুলো তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার কামালে মহব্বতের এবং অধিক এনায়েতের প্রমাণ। তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় নাম মাহমুদ থেকে তাঁর হাবীব স. এর নাম আহমদ ও মোহাম্মদ নির্গত করেছেন। তাঁর পূর্বে অন্য কারও এরকম নাম রাখা হয়নি।

কবি হাস্‌সান ইবনে ছাবেত রা. বলেন 'আল্লাহ্‌তায়ালা মোহাম্মদ এর নামকে নিজের নাম থেকে বের করেছেন। আরশের মালিক যিনি তাঁর নাম মাহমুদ আর ইনি হচ্ছেন মোহাম্মদ স.। কেউ কেউ বলেন, এই কবিতা হজরত আবু তালিবের।

যেমন ইমাম বোখারী স্বীয় গ্রন্থ তারিখে সগীরে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে বেহেশতী আহার্য প্রদান করেছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে সওমে বেসালের অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ্ ।

রসুলেপাক স. সামনের দিকে যেমন দেখতে পেতেন, ঠিক তেমনি পিছনের দিকেও দেখতেন। দিনের আলোতে যেরকম দেখতেন রাতের অন্ধকারেও দেখতেন তেমনি। তিনি পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে পাথরে কদম মোবারকের ছাপ অঙ্কিত হতো। মাকামে ইব্রাহীমেও এরকম পরিলক্ষিত হয়। এই আলোচনা কোরআন মজীদেও রয়েছে। তাঁর দুই কনুই মোবারকের চিহ্ন মক্কার পাথরে আছে। তাঁর ঘোড়ার সমুনের চিহ্ন মদীনা মুনাওয়ারায় বনী মুআবিয়ার মসজিদে বিদ্যমান। তাঁর মুখের লালা লোনা পানিকে মিঠা পানিতে পরিণত করে দিতো এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুর বেলায় দুধের প্রয়োজন মিটাতো। তাঁর বগল মোবারকের বর্ণ ছিলো শাদা ও লাল মিশ্রিত। সেখানে পশম গজাতো না। আবার সেস্থানের রঙ শরীরের রঙ থেকে আলাদা ছিলো না। বগল মোবারকে দুর্গন্ধও ছিলো না।

এস্তেস্কার হাদীছে বর্ণিত আছে, তিনি দোয়ার সময় হাত এতটুকু ওঠাতেন যাতে বগল মোবারকের শুভ্রতা পরিলক্ষিত হতো। কেউ কেউ অবশ্য বলে থাকেন, বগলের শুভ্রতা বুঝানোর জন্য এটা জরুরী নয় যে, সেখানে পশম থাকবে না। কেননা যে স্থান থেকে পশম উঠিয়ে ফেলা হয়, সে স্থান দেখতে শাদাই হয়ে থাকে। একথাও প্রমাণিত যে, রসুলেপাক স. বগল মোবারকের পশম উঠিয়ে ফেলতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আকরম খাযাঈ রা. বর্ণনা করেন, আমি একবার রসুলেপাক স. এর সঙ্গে নামাজ পড়েছি। সেজদার প্রাক্কালে তাঁর বগল মোবারকের দিকে আমার দৃষ্টি পড়েছিলো। হাদীছ শরীফে এসেছে ‘গুফরাতুন’। বাদামী রঙকে গুফরাহ বলা হয়। এ কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সেখানে পশমের চিহ্ন ছিলো। এরকম স্থানকেই ‘আগফার’ বলা হয়। পশমবিহীন স্থানকে আগফার বলা হয় না। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায় এরকম বর্ণনা রয়েছে।

যাই হোক, এক্ষেত্রে এরকম ধারণা রাখতে হবে যে, রসুলেপাক স. এর বগল মোবারক থেকে কোনোরূপ দুর্গন্ধ নির্গত হতো না। বরং খুশবু বের হতো। বোখারী শরীফে একথাই আছে। তাঁর কণ্ঠস্বর এতো দূর দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছতো, যেখানে অন্য কারও আওয়াজ পৌঁছতো না। তাঁর চোখ নিদ্রিত হতো। কিন্তু অন্তর জেগে থাকতো। বোখারী।

নিদ্রাবস্থায় কেহ কথা বললে তিনি শুনতে পেতেন। হাদীছ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, নিদ্রার কারণে রসুলেপাক স. এর অজুভঙ্গ হতো না। কেউ কেউ অবশ্য বলে থাকেন, নিদ্রায় অজু ভঙ্গ না হওয়ার বিশেষত্ব সকল নবীর বেলায় প্রযোজ্য।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, লাইলাতুত্তারিছে সূর্য উদিত হওয়া সম্পর্কে তিনি কেনো জানতে পারলেন না– যার কারণে ফজরের নামাজ কাযা হয়ে গিয়েছিলো। উত্তরে এই বলা হয় যে, সূর্য উদিত হওয়া বা অস্ত যাওয়াকে অবলোকন করা চোখের কাজ। চোখ যেহেতু নিদ্রিত ছিলো, তাই তা জানতে না পারাটাই স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন– হৃদয় জাগ্রত থাকলেও জানতে পারেননি কেনো? এর কারণ হচ্ছে, অন্তরে ওহী হয়নি। আবার নামাজ ফওত হলে তা কাযা করার বিধান উম্মতের মধ্যে প্রচলিত করার উদ্দেশ্যও এতে ছিলো। এক্ষেত্রে অন্য কোনোও রহস্যও থাকতে পারে। আল্লাহ্‌তায়ালাই সর্বজ্ঞ।

রসুলেপাক স. কখনও শরীরে আড়মোড়া দিতেন না। এটি ইবনে আবী শায়বা ও ইমাম বোখারী তাঁর তারিখ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাই না তোলার ব্যাপারেও বর্ণনা আছে। অন্য কোনো নবীও শরীরে আড়মোড়া দিতেন না। হাইতোলা শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে। কাজেই সাব্যস্ত হলো— এমন কাজ রসুলেপাক স. দ্বারা সংঘটিত হতেই পারে না।

রসুলেপাক স. এর শরীর মোবারকে কখনও মাছি বসতো না এবং তাঁর পোশাক পরিচ্ছদে কখনও উকুন হতো না। কখনও তাঁর স্বপ্নদোষ হয়নি। অন্য কোনো নবীর বেলায়ও হয়নি। তিবরানী একথা বলেছেন।

বর্ণিত আছে, স্বপ্নদোষ শয়তানের প্রভাবদুষ্ট কাজ। অবশ্য কোনো কোনো আলেম রসুলেপাক স. থেকে এহতেলাম হওয়া জায়েয মনে করেন। কখনও কখনও মানসিক চাপেও এরকম হয়ে থাকে। শয়তানী স্বপ্ন থেকে নয়। তাঁর সীনা মোবারকের খুশবু মেশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত ছিলো।

যমীনের উপর রসুলেপাক স. এর কোনো ছায়া পড়তো না। কেননা যমীন নাজাছাত (নাপাকি) ও কাছাফাত্ব (ঘনত্ব) এর স্থান। সূর্যের আলোতেও তাঁর ছায়া দেখা যেতো না। চেরাগের আলোতে তাঁর ছায়া হতো না, একথা বলা হয়নি। কাজেই বিষয়টি বড়ই বিস্ময়কর, সূক্ষ্ম ও দুর্লভ।

রসুলেপাক স. রাতের নামাজান্তে যে দোয়া পাঠ করতেন, কোনো কোনো মাশায়েখ তা ফজরের সুন্নত ও ফরজের মধ্যবর্তী সময়ে পাঠ করে থাকেন। তিনি স. বলতেন, হে আল্লাহ্। আমার সমস্ত অঙ্গ ও সকল দিকে তুমি নূর প্রদান করো। উক্ত দোয়ার শেষাংশে রয়েছে ' ওয়াজআলনী নূরান'– হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে নূর বানিয়ে দাও। রসুলেপাক স. নূর ছিলেন। নূরের ছায়া হয় না।

তিনি যখন লম্বা লোকদের সঙ্গে হাঁটতেন, তখন সকলের চেয়ে তাঁকেই বেশী লম্বা দেখা যেতো। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদে মাছি বসতো না। আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী এরকম বর্ণনা করেছেন। পোশাক পরিচ্ছদে যখন বসতো না, তখন দেহ মোবারকে মাছি বসারতো প্রশ্নই আসে না। মশা বা কীট-পতঙ্গ তাঁকে কখনও দংশন করেনি বা শরীরের রক্ত শোষণ করেনি। ছারপোকাও তাঁকে কোনোদিন কামড় দেয়নি। এসব উলামায়ে কেরামের বর্ণনা। তাঁর পবিত্র শরীরে কোনোদিন উকুন হয়নি— এটা বুঝানোই এ সকল বর্ণনার উদ্দেশ্য।

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, 'কানা ইউফলী ছাউবাহু'– তিনি কাপড়ে উকুন তালাশ করতেন। এই বর্ণনা দ্বারা দেহে উকুন হওয়া বা উকুন তালাশ করা বুঝানো হয়নি। বরং এরদ্বারা পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দেওয়াই উদ্দেশ্য। তাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তির সময় দুষ্ট জ্বীন ও শয়তানদের আকাশ থেকে চুরি করে কিছু শ্রবণ করার প্রবণতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এরকম কুকর্ম থেকে আকাশকে হেফাজত করা হয়েছিলো।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, শয়তান আকাশসমূহে লুকিয়ে থাকতো না, বরং ওরা আকাশে ঢুকে পড়তো এবং চুরি করে ফেরেশতাদের কথাবার্তা ও সংবাদাদি শুনে আসতো। তারপর সেগুলো ওই যাদুকরদের কানে কানে বলতো, যাদের রূহ্ শয়তানের রূহের ন্যায় অপবিত্র। শয়তানের সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক ছিলো। যাদুকরেরা শয়তানের কাছ থেকে কিছু শুনে তার সঙ্গে নিজেদের কিছু মিথ্যা মিশ্রিত করে মানুষকে শোনাতো। বিপরীত দিকে চিন্তা করলে দেখা যায়, আম্বিয়া কেরামের পবিত্র রূহ ফেরেশতাদের রূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলো। সে কারণে তাঁদের রূহ ছিলো সত্য সংবাদ অবতরণের মাধ্যম। রসুলেপাক স. এর জন্মের পর শয়তানদের আকাশে আরোহণ করা থেকে রুখে দেয়া হয়।

আহলে এলেমগণ বর্ণনা করেন, হজরত ঈসা আ. এর আবির্ভাবের সময় শয়তানকে শুধু তিন আকাশ থেকে রোখা হয়েছিলো। আর রসুলে আকরম স. এর বেলাদতের বরকতে সকল আকাশ থেকেই শয়তানকে বিতাড়িত করা হয়েছিলো। শয়তান আকাশে আরোহণ করার চেষ্টা করলে আগুনের উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এ উল্কাপিণ্ড কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়ে কোনো শয়তানকে জ্বালিয়ে দেয়, কারও চেহারা ঝলসে দেয়, কারও অঙ্গ নষ্ট করে দেয়, আবার কখনও আকল বিলুপ্ত করে দেয়।

শয়তান সম্প্রদায়ের ভূত প্রেতেরা বন জঙ্গলে বা কোনো প্রান্তরে মানুষকে রাস্তা ভুলিয়ে দেয়। রসুলে আকরম স. নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে এরকম ঘটতো না। তাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তির প্রারম্ভ থেকে এ ধরনের ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়। (এ থেকে মনে হয় তারা আকাশের দিকে আরোহণ করতে পারে না বলে বিক্ষুব্ধ হয়ে এধরনের অনিষ্টকর কার্যে লিপ্ত হয় –অনুবাদক)।

হজরত মুআম্মার র. বর্ণনা করেন, আমি ইমাম যুহরী র. কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জাহেল যুগেও কি আকাশ থেকে উলকা পতিত হতো! তিনি উত্তরে বলেছিলেন, হাঁ, তবে উল্কাপতনের তীব্রতা ও কঠোরতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো রসুলে আকরম স. এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির সময় থেকে।

ইবনে কুতাইবা রা. বর্ণনা করেন, রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বেও উল্কাপিণ্ড দ্বারা শয়তানদেরকে বিতাড়িত করা হতো বটে, তবে তাঁর আবির্ভাবের পর এব্যাপারে অধিক কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছিলো এবং আকাশের হেফাজত নিশ্চিত করা হয়েছিলো। কেউ কেউ বর্ণনা করেন, তারকা নিক্ষেপ করলে শয়তান সরে যেতো এবং পুনরায় যথাস্থানে ফিরে আসতো।

ইমাম বগবী র. বর্ণনা করেন, রসুলে আকরম স. এর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এটিও একটি বৈশিষ্ট্য– শবে মেরাজে তাঁকে নেয়ার জন্য বোরাক পাঠানো হয় তখন জীন ছাড়া। এতে করে বুঝা যায়, অন্য নবীদের জন্যও বোরাক ছিলো। বিভিন্ন বর্ণনার দ্বারা এরকমই প্রতীয়মান হয়। প্রশ্ন জাগে, রসুলেপাক স. এর জন্য পাঠানো বোরাকই কি অন্য নবীদের নিকট আসতো? নাকি তাঁদের জন্য আপনাপন মর্যাদা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বোরাক নির্ধারিত ছিলো। মেরাজের হাদীছে এসেছে 'বোরাকটি যখন অবাধ্য আচরণ করছিলো, তখন জিব্রাইল আ. বলেছিলেন, স্থির হও, রসুলেপাক স. এর মতো কেউই তোমার পিঠে আরোহণ করেননি।' এই হাদীছ দ্বারা প্রথম মতটিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. কে রাতারাতি মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসাতে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর সেখান থেকে মাকামে আ'লাতে পৌঁছানো হলো এবং আয়াতে কুবরা অর্থাৎ বড় বড় নিদর্শনাদি দেখানো হলো। তাঁর দৃষ্টিপাতকে বিভ্রম থেকে হেফাজত করা হলো। যেমন কোরআন মজীদে বলা হয়েছে 'তাঁর দৃষ্টিপাতকে বিভ্রম থেকে হেফাজত করা হলো। আরো বলা হয়েছে 'তাঁর দৃষ্টি বক্র হয়নি, ভ্রষ্ট হয়নি।' তাঁর নিকট সকল নবীকে উপস্থিত করা হলো। তিনি তাঁদের এবং ফেরেশতাবৃন্দের সকলের ইমামতী করলেন। বেহেশতে তাঁকে ভ্রমণ করানো হলো এবং দোযখ দেখানো হলো। তাঁকে ওই মাকাম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে কারও জ্ঞান পৌঁছতে সক্ষম হয় না। তিনি স্বচক্ষে পরওয়ারদিগারে আলমের দীদার লাভ করলেন। হকতায়ালা তাঁর জন্যই আলাপন ও দর্শন নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, যা কোনো ফেরেশতা, নবী বা ওলীর ভাগ্যে জোটেনি।

তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলোর এটিও একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তিনি যখন কোনো স্থানে যেতেন বা চল্লিশ কদম হাঁটতেন, তখন ফেরেশতাগণ তাঁর পিছে পিছে চলতো। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমরা আমার সামনে চলো। পিছনের দিক ফেরেশতাদের জন্য ছেড়ে দাও। ফেরেশতাগণ রসুলেপাক

স. এর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করতো। যেমন বদর ও হুনায়নের যুদ্ধে হয়েছিলো। কোরআনে করীমে তার বর্ণনা রয়েছে। তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো, তাঁকে কিতাবে আযীম প্রদান করা হয়েছিলো। অথচ তিনি ছিলেন উম্মী নবী। তিনি কারও কাছ থেকে লেখা পড়া শিখেননি, কোনো বিদ্যালয়েও যাননি। এমনকি কোনো আলেমের সংস্পর্শেও আসেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মিয়াত তাঁর পবিত্র সত্তাগত বৈশিষ্ট্য ছিলো। তিনি তো উলুহিয়াতের বিশেষ প্রকাশস্থল ছিলেন। তাই তিনি কারণ ও মাধ্যমের মুখাপেক্ষী হতে পারেন না। তাঁর এটিও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবকে বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে হেফাযত করা হয়েছে। এই কিতাবে পরিবর্তন আনয়ন ও একে রূপান্তরিত করার জন্য অনেক মুলহেদ ও যিন্দীক চেষ্টা করেছে, কিন্তু কেউ সফলকাম হতে পারেনি। কোনো একটি শব্দ বা বর্ণের রূপান্তর করতেও তারা সক্ষম হয়নি।

যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'এই কোরআনে কোনো মিথ্যা আসতে পারে না। না সম্মুখ দিয়ে। না পশ্চাৎ দিয়ে। এটা প্রশংসিত মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে অবতারিত।' পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতে যা ছিলো, এই কিতাবে আযীমে তা একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কিতাবে পূর্ববর্তী জামানার খবরাদি, অতীতের উম্মতগণের অবস্থা এবং তাদের শরীয়ত ও বিধানের সমন্বয় ঘটেছে। আসমানী কিতাবের জ্ঞানধারী লোকদের মধ্যে দু একজন লোকের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় সমস্ত জিন্দেগী অতিবাহিত করবার পর তাদের অবস্থা সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত জ্ঞান পেয়েছেন। কোরআনে করীমের সংক্ষেপণ, এর পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি ও গুণাবলী সম্পর্কে মোজেজা অধ্যায়ে সমধিক আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ্তায়ালা।

উম্মতের কোনো ব্যক্তি কোরআনে করীম স্মৃতিবদ্ধ করার ইচ্ছা করলে আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে তা তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য উম্মতের ক্ষেত্রে দেখা যায়, গোটা উম্মত থেকে একজন লোকও তাদের কিতাব স্মৃতিস্থ করতে পারেনি। অনেক লোক তো দূরের কথা। অথচ কোরআন নাযিলের পর শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে, এখনও শিশু, কিশোর ও নওজওয়ানেরা অতি সহজে কোরআন মজীদ হেফজ করে যাচ্ছে। সহজসাধ্য ও সহজবোধ্য করার জন্য, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বান্দার উপর দয়াপরবশতার কারণে আল্লাহ্পাক কোরআন মজীদ সাত লোগাতে নাযিল করেছেন। উক্ত সাত লোগাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে মেশকাত শরীফে।

কোরআন মজীদ এক চিরস্থায়ী ও চিরন্তন মোজেজা। আল্লাহ্র কুদরতের এই নিদর্শন চিরকাল থাকবে। বেহেশতী বান্দাগণ বেহেশতে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করবেন এবং ওই তেলাওয়াতের মাধ্যমে বেহেশতের মধ্যে তাদের

মর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নত হতে থাকবে। হাদীছ শরীফে এসেছে, 'আল্লাহ্‌তায়ালা বেহেশতীদেরকে বলবেন, কোরআন পাঠ করো এবং উন্নত মাকামে আরোহণ করো।' আখেরাতের খবর ব্যতীত নবীগণের যাবতীয় মোজেজা শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোরআন এমন এক বিস্ময়কর মোজেজা, যার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ্‌তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ ফরমান 'আমি কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাজত করবো।' তওরাত ও ইঞ্জীলের হেফাজতের ভার ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো নবী ও আহবারগণের উপর। তাই বিকৃতি ও রূপান্তরের পথ প্রশস্ত হয়েছিলো। কোরআন মজীদ সংরক্ষিত থাকুক তা যখন আল্লাহ্‌পাক কামনা করলেন, তখন সাহাবা কেরামকে এই কাজে নিয়োজিত করলেন, যাতে এ প্রশ্নের অবকাশ না থাকে যে, আল্লাহ্‌তায়ালাই যদি কোরআন সংরক্ষণ করবেন, তাহলে আবার তার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করার যৌক্তিকতা কী? কোনো কোনো শাফেয়ী মতাবলম্বী বলে থাকেন, উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কোরআনের প্রত্যেক সুরার প্রথমে যুক্ত করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য এই যে, বিসমিল্লাহ্ শরীফ কোরআনের প্রত্যেক সুরার প্রারম্ভে সংযুক্ত করাটা সাহাবীগণের ঐকমত্য দ্বারা নির্ধারিত। এক সুরা থেকে অপর সুরা পৃথক করার জন্য বিসমিল্লাহ্ শরীফ নাযিল হয়েছে। কতিপয় মুতাআখখেরীন কোরআন মজীদের সুরার নামসমূহ ও আয়াতের সংখ্যা গণনাকে জায়েয মনে করে থাকেন। বিসমিল্লাহ্ সংযোজন দ্বারা কোরআন মজীদে অতিরিক্ততা আরোপিত হয় না। এব্যাপারে সন্দেহের কিছুই নেই।

কোরআন মজীদকে হেফাজত রাখার জন্য মানুষের কালাম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক কালাম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটিও কোরআনের অন্যতম অলৌকিকতা। সামান্যতম অতিরিক্ততা অথবা ন্যূনতা আনয়ন করা হলে অক্ষর ও প্রকাশভঙ্গিতে বাহ্যিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতো। তখন সুস্পষ্ট হয়ে যেতো যে, এটা কোরআনের বাক্য নয়। মানুষ যে কোরআন মজীদ সহজেই হেফজ করে নিতে পারে, এটাও তার হেফাজতের অন্যতম কারণ। শান শওকতওয়ালা বুজুর্গ ব্যক্তিও কোরআনে পাকের হরফ বা নূকতাকে কমবেশী করলে ছোট বড় সবাই নির্দ্বিধায় তাঁর ভুল ধরে ফেলে।

হকতায়ালা সুরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী, আমানার রসুলু অর্থাৎ সুরা বাকারার সর্বশেষ আয়াতগুলোকে রসুলে আকরম স. এর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ করেছেন। বলা হয়েছে, এগুলো আরশের নীচে রক্ষিত ধনভাণ্ডার স্বরূপ। অন্য কোনো নবীকে এজাতীয় আয়াত প্রদান করা হয়নি। এক্ষেত্রে রসুলে আকরম স. এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই ভাণ্ডারসমূহের কুঞ্জি কেবল রসুলে আকরম স. কেই প্রদান করা হয়েছে।

আরশের কুঞ্জি দান করা হয়েছে কথাটির বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌তায়ালা পরবর্তীকালে সাহাবা কেরামের মাধ্যমে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য মুসলমানগণের অধিকারে এনে দিয়েছিলেন। আর তার বাতেনী তাৎপর্য হচ্ছে– খাযায়েন বা কুঞ্জির অর্থ জগতের জিনিস বা জাতসমূহ। আল্লাহ্‌তায়ালা সমস্ত রিযিক রসুলে আকরম স. এর সম্মানিত হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন এবং জাহের বাতেনের যাবতীয় তরবিয়ত ও শক্তি তাঁকে দান করেছেন। যেমন গায়েবের কুঞ্জি রয়েছে এলমে এলাহীর পবিত্র কুদরতী হাতে। জাতী এলমে গায়েব তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না। ঠিক তেমনি রিযিক ও কিসমতের ভাণ্ডার রসুলে আকরম স. এর হস্ত মোবারকে দান করেছেন। যেমন তিনি স. এরশাদ করেছেন 'আমি বণ্টনকারী আর দাতা হচ্ছেন আল্লাহআতায়ালা।'

রসুলেপাক স. এর বিশেষত্বের মধ্যে আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি সমগ্র মানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি রসুলূছ ছাক্বালাইন অর্থাৎ জ্বীন ও ইনসান সকলের রসুল। কোনো কোনো ফেরেশতারও তিনি রসুল। জগতের সকল অংশের ও অঙ্গের তিনি রসুল। তাই সকলে তাঁর রেসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করেছে। গাছ ও পাথর তাঁকে সালাম করেছে।

এখানে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয়, হজরত নূহ আ. এর সময়ে সংঘটিত মহাপ্লাবনের সময় যে ক'জন ইমানদার তাঁর কিশতীতে আরোহণ করে বেঁচে গিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁদের দ্বারাইতো পৃথিবী আবাদ করা হয়েছিলো। তাঁরা ব্যতীত অন্য মানুষতো পৃথিবীতে ছিলো না। পরবর্তী সমস্ত মানুষের নবী হলে হজরত নূহ আ. হতে পারেন, রসুলেপাক স. সমস্ত মানুষের জন্য কেমন করে নবী হলেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে শায়েখ ইবনে হাজার মক্কী র. বলেন, হজরত নূহ আ. এর সাধারণ রেসালত রসুলেপাক স. এর আবির্ভাবের মধ্যে জড়িত ছিলো না। বরং প্লাবনের ঘটনা আপেক্ষিক হিসেবে ঘটে গিয়েছিলো। যার ফলে মানুষ ইমানদার পরিচয়ে সীমিত হয়ে বেঁচে গিয়েছিলো। আমাদের নবী স. এর রেসালতের ব্যাপকতা মৌলিক আবির্ভাব হিসেবে ছিলো। বান্দা মিসকীন (শায়েখ মুহাককেক আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, রসুলে আকরম স. সমগ্র মাখলুকাতের জন্য ব্যাপকতার ভিত্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন– একথার অর্থ, সমস্ত আলম– পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত; আরব ও আজম সকলেই তাঁর রেসালতের অধীন।

যেমন হজরত জাবের রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ– রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, সকল নবীই বিশেষ বিশেষ কাওম বা সম্প্রদায়ের প্রতি আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার আবির্ভাব আরব আজম সকলের জন্য। কোরআনে করীমে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে 'নিশ্চয়ই আমি নূহকে তার কাওমের কাছে প্রেরণ

করেছি।' এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, নূহ আ. কেবল তাঁর কাওমের নবী ছিলেন। কালীলা নামক একটি কাওম (নূহ আ. এর কাওম) তো আর 'কাফ্ফাতুন্নাস' (মানবমণ্ডলী) হতে পারে না, যদিও প্লাবনের পর কেবল তাঁরাই বেঁচেছিলেন।

শায়েখ ইবনে হাজার মক্কী র. এর উত্তরের তাৎপর্য এটাই। এক্ষেত্রে অপর একটি প্রশ্নও উত্থাপন করা হয়ে থাকে, হজরত নূহ আ. তৎকালীন ইমানদার ছাড়া অন্যদেরকে ধ্বংস করার জন্য বদদোয়া করেছিলেন। ইমানদারদেরকে রক্ষা করার জন্য কিশতীতে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর বদ্দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। নবী করীম স. যদি সমগ্র মানবজাতির জন্য নবী হয়ে এসে থাকেন, তাহলে অপর একজন নবী অর্থাৎ নূহ আ. এর বদদোয়া এক্ষেত্রে কেমন করে কার্যকর হলো?

উত্তর এই, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আমি কোনো কাওমের নিকট রসুল প্রেরণ না করা পর্যন্ত উক্ত কাওমকে শাস্তি প্রদান করি না।' শাফাআত বিষয়ক হাদীছে এসেছে, তিনিই প্রথম নবী (প্লাবনের পর)। এর জবাবে বলা হয়েছে, সম্ভবতঃ হজরত নূহ আ. এর দাওয়াতে তাওহীদ তাঁর উম্মতের কাছে আগেই পৌঁছে গিয়েছিলো। কেননা তাঁর আয়ু ছিলো দীর্ঘ। প্লাবনের পূর্বেই তাঁর বয়স হয়েছিলো সাড়ে নয়শত বৎসর। এ দীর্ঘ সময়ে তাঁর উম্মত তাওহীদের দাওয়াত পেয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা শিরিক ছাড়েনি। তাই আযাবের উপযোগী হয়েছিলো। শায়েখ ইবনে ওয়াকীফ বলেন, কোনো কোনো নবীর উপর তাওহীদ আম ছিলো। আর শরীয়তের হুকুম আহকাম ছিলো আনুষংগিক। তাই দেখা যায় যে, অপর কাওমের সঙ্গে তাঁরা যুদ্ধ করেছেন কেবল শিরিক করার কারণে, যেমন হজরত সুলায়মান আ.।

কেউ কেউ বলে থাকেন, সম্ভবত হজরত নূহ আ. এর সময় অন্য নবীও পৃথিবীতে ছিলেন। আর তিনি জানতে পেরেছিলেন, লোকেরা ওই নবীর উপর ইমান আনছে না। তাই তিনি তাদের জন্য বদ্দোয়া করেছিলেন, চাই তারা তাঁর নিজের কাওমের লোক হোক বা অন্য কাওমের। এই উত্তরটি অবশ্য উৎকৃষ্ট তখনই, যখন এটা প্রমাণিত হবে যে, তাঁর সময়ে অন্য নবী আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু এ ধরনের কোনো তথ্য কেবল অনুমান। প্রমাণের ক্ষেত্রে অনুমান গ্রাহ্য নয়। কেউ কেউ বলে থাকেন, আমাদের নবী স. সকলের জন্য আম নবী– কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর শরীয়ত বিদ্যমান থাকবে। এর মর্ম হচ্ছে, তিনি সকল মানুষের জন্য প্রেরিত। আর কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর শরীয়ত হুবহু বিদ্যমান থাকবে।

হজরত নূহ আ. ও অন্য নবীগণের নবুওয়াত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলো, কেননা বিধান হচ্ছে, এক নবীর পর অন্য নবীর আবির্ভাব হলে পূর্বোক্ত শরীয়তের কিছু না কিছু অংশ রহিত করে দেয়া হয়ে থাকে। আর রসুলেপাক স. এর সুউজ্জ্বল শরীয়ত কখনো রহিত হবে না। তিনি খাতেমুন্নাবিয়্যীন অর্থাৎ সর্বশেষ নবী।

কোনো কোনো ইহুদী বলে, মোহাম্মদ স. আরব জাহানের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাদের উক্তি ভ্রান্ত ও পরিত্যাজ্য। কোনো নবীর নবুওয়াত বা রসুলের রেসালতকে মানলে সেই নবী বা রসুলকেও সত্যবাদী বলে স্বীকার করতে হবে। কেননা রসুল কখনও মিথ্যাবাদী হন না। নবী করীম স. দাবি করেছেন, 'আমি সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি।' তাঁর দাবি সত্য। নিশ্চয় সত্য।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হলো, তাঁকে এক মাসের দূরত্বে রেখে দুশমনের ভয়ভীতি থেকে তাঁকে নিশ্চিন্ত করা হয়েছিলো। এক মাসের বলার কারণ হচ্ছে, রসুলেপাক স. এর শহর আর দুশমনদের শহরের দূরত্ব এক মাসের অধিক রাস্তা ছিলো না। রসুলেপাক স. এর এই বিশেষত্ব ছিলো সাধারণ হিসেবে। সৈন্যসামন্তহীন একাকী অবস্থাতেও তিনি ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ থাকতেন। এই বিশেষত্ব অন্য কোনো নবীর ছিলো না। নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক ছিলো, বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করা হয়েছিলো ফেরেশতাবৃন্দের মাধ্যমে। অন্য নবীর বেলায় এরকম হয়নি। এ সম্পর্কে বিভিন্ন যুদ্ধ, বিশেষ করে বদর যুদ্ধের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, গনিমতের মাল তাঁর জন্য এবং তাঁর উম্মতের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। তাঁর পূর্বে কোনো নবীর জন্য গনিমতের মাল হালাল ছিলো না। কোনো কোনো নবীর জন্য তো জেহাদ করারও অনুমতি ছিলো না, যাতে গনিমত লাভ হয়। কোনো কোনো নবীর জন্য জেহাদ করা অবশ্য হালাল ছিলো, কিন্তু গনিমতের মাল হালাল ছিলো না। তাঁরা গনিমতের মাল কোনো এক জায়গায় সঞ্চিত করতেন। আকাশ থেকে অগ্নিশিখা এসে উক্ত মাল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যেতো। এটা ছিলো জিহাদ কবুল হওয়ার আলামত। কিন্তু এই উম্মতে মরহুমার জন্য গনিমতের মালকে হালাল করা হয়েছে।

আহলে এলেমগণ বলেন, ওই সমস্ত জিনিস রসুলেপাক স. কে দান করা হয়েছে, যা তাঁর উম্মতের বাসনা ও স্বভাবের অনুকূল। আকাঙ্খিত বস্তু লাভ আস্বাদ্য ব্যাপার। আকাঙ্খা পূরণার্থে যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ স্বাভাবিক। আর শ্রমলব্ধ বস্তু হাতছাড়া করতে চায় ক'জন?

নবী করীম স. এর বিশেষত্বগুলোর মধ্যে এটাও অন্যতম যে, তাঁর ও তাঁর উম্মতের জন্য সমস্ত ভূখণ্ডকে সেজদার স্থান বানানো হয়েছে। তাই সকল জায়গায় নামাজ আদায় করা জায়েয। কোনো বিশেষ জায়গাকে সেজদার জন্য নির্ধারণ করা হয়নি। মাটিকে তাঁর উম্মতের জন্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানানো হয়েছে। পানি ব্যবহারের মাধ্যমে অজু গোসল করতে অক্ষম অবস্থায় মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার বিধান করে দেয়া হয়েছে। অন্য কোনো শরীয়তে পানি ব্যবহার ব্যতীত পবিত্রতা অর্জনের উপায় ছিলো না। তেমনি অন্যান্য উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া অন্য কোথাও নামাজ আদায় করা বৈধ ছিলো না। যেমন কানিছা বা গীর্জা, কালিছা বা প্যাগোডা ইত্যাদি। তাই উপাসনালয় থেকে দূরে বসবাসকারীরা হয়তো নামাজই আদায় করতো না।

এই কিতাবের লেখক (শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, আমি মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া ছাড়া অন্য কোনো কিতাবে একথাটি পাইনি যে, হজরত ঈসা আ. যমীনে চলাফেরা করতেন এবং যেস্থানে নামাজের ওয়াক্ত হতো সেস্থানেই নামাজ আদায় করে নিতেন।

উপরের বক্তব্যটি মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার “দাউদী” এবং “ইবনুত্তিব ইয়ান” কিতাব থেকে সংকলন করেছেন। বোখারী শরীফের শরাহ ফতহুলবারীতে সাইয়্যেদুনা হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে হজরত জাবের রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আছে, আম্বিয়া কেরামের মধ্য থেকে কোনো নবীই বায়তুলমুকাদ্দাসে না পৌঁছে নামাজ আদায় করতেন না। বর্ণিত বক্তব্যে কেবল নবীগণের কথা বলা হয়েছে। উম্মতের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। যাহোক, প্রসঙ্গটি মতানৈক্যমুক্ত থেকে মুক্ত নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম। কেউ কেউ বলে থাকেন, সমস্ত যমীন সেজদার স্থান এবং পাক হওয়া অন্য নবীর বেলায় ছিলো না। কেননা যমীন সেজদার স্থান হলেও পাক ছিলো না।

কেউ কেউ আবার এরকমও বলে থাকেন, একথার অর্থ হচ্ছে, যমীন যে পাক এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত জায়গায় সেজদা করা বৈধ ছিলো না। আর উম্মতে মোহাম্মদী স. এর জন্য ওই যমীনই পাক যেখানে প্রকাশ্য নাপাকী নেই।

মহানবী স. এর এটাও একটি বিশেষত্ব যে, তাঁর মোজেজাসমূহ অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের মোজেজা থেকে অধিক ছিলো। তাঁর উপর অবতীর্ণ সমগ্র কোরআন মজীদই মোজেজা। কোরআন মজীদের যে ক্ষুদ্রতম সূরা ‘ইন্না আ'ত্বইনাকাল কাউছার’ অথবা এ ধরনের ক্ষুদ্র অন্যান্য সূরা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা উচিত। তাহলে কোরআনের আলৌকিকত্বের পরিমাণ সম্পর্কে অনুধাবন করা যাবে। ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হবে মোজেজা অধ্যায়ের শেষাংশে।

নবী করীম স. এর আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি খাতেমুল আম্বিয়া অর্থাৎ নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ। তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না। কোরআন মজীদে একথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। হাদীছ শরীফে উক্ত হয়েছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আমার ও অন্যান্য নবীর অবস্থা ও উপমা এরকম— এক ব্যক্তি একটি মহল তৈরী করলো। নির্মাণের পর দেখা গেলো এক কোণে একটি ইট পরিমাণ জায়গা খালি। লোকেরা আনন্দ ও উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে উক্ত মহল পরিদর্শন করতে এলো। এর চারদিক ঘুরে ফিরে পর্যবেক্ষণ করলো এবং তাজ্জব হয়ে এক পর্যায়ে বললো, এই জায়গাটি খালি রাখা হলো কেনো? বুঝে নাও! আমি ওই ইট। আমি খাতেমুল আম্বিয়া। আমার আগমনের পর ওই ইমারতের নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। অপূর্ণতা আর নেই।

রসুলেপাক স. আরও এরশাদ ফরমান, উত্তম চরিত্র ও সুন্দর কার্যাবলীর পরিপূর্ণতা বিধানার্থে আমি আবির্ভূত হয়েছি। এই হাদীছখানাও আম্বিয়া কেরামের মিশনের পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত। সুতরাং তাঁর শরীয়ত হচ্ছে, চিরন্তন শরীয়ত যা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আর এই শরীয়ত অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের শরীয়তকে রহিত করেছে। কাজেই তাঁর উম্মত অন্যান্য উম্মতের চেয়ে উত্তম। তাঁর উম্মতের সংখ্যা অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের উম্মতের চেয়ে অধিক। কোনো নবী তাঁকে পেলে তাঁর অনুসরণই করতেন।

মহানবী স. এর আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে রহমাতুল্লিল আলামীন করে প্রেরণ করেছেন। এক্ষেত্রে রহমতের অর্থ হেদায়েত ধরা হলে তাৎপর্য হবে, সকল মানুষের প্রতি তিনি প্রেরিত। সকল মানুষ হেদায়েত লাভ না করলেও। আর যদি রহমতের অর্থ হেদায়েত না নিয়ে ব্যাপকতর অর্থ গ্রহণ করা হয়, তখন তার তাৎপর্য হবে, তাঁর মহিমান্বিত অস্তিত্বের ওসীলায় সকল সৃষ্টি অস্তিত্ব পেয়েছে। তাঁর স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালা সকল আম্বিয়া কেরামকে নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। যেমন ইয়া আদম, ইয়া নূহ, ইয়া ইব্রাহীম, ইয়া দাউদ, ইয়া যাকারিয়্যা, ইয়া ঈসা, ইয়া ইয়াহ্ইয়া ইত্যাদি। কিন্তু রসুলে আকরম স. কে আল্লাহ্পাক এভাবে ডাকেননি। বরং বলেছেন, ইয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু, ইয়া আইয়্যুহার রসুলু, ইয়া আয়্যিুহাল মুয্যাম্মিল এবং ইয়া আইয়্যুাহাল মুদ্দাছ্ছির।

শেষোক্ত নাম দুটিতে মহব্বত ও স্নেহপরায়ণতার আভাষ পাওয়া যায়। এ ধরনের সম্বোধনের আস্বাদ অনুভব করতে পারেন কেবল প্রেমিকেরাই। মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, কোনো উম্মতের জন্য তাঁর নাম ধরে ডাকা হারাম। যেমন– লোকেরা একে অপরকে ডেকে থাকে, আল্লাহ্তায়ালা এধরনের আহবান করতে বারণ করেছেন। ঘোষণা দিয়েছেন 'তোমরা একে অপরকে যেমন

আহ্বান করো, সেরকমভাবে তাঁকে স. আহ্বান কোরো না।' বরং তাঁকে আহ্বান করতে হলে তাঁর কোনো গুণবাচক নামের দ্বারা আহবান করতে হবে। যেমন– ইয়া হাবীবাল্লাহ্, ইয়া রসুলাল্লাহ্, ইয়া নাবিয়াল্লাহ্ ইত্যাদি। ডাক দেয়ার সময় আদব, সম্মান, বিনয় ও আজেযী এনকেছারীর সঙ্গে অনুচ্চ স্বরে ডাক দিতে হবে।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার তাফসীরে হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ছাবেত ইবনে কায়েস রা. সম্পর্কে কানে কম শোনা এবং উচ্চস্বরে কথা বলার অভিযোগ ছিলো। উল্লিখিত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হলে তিনি ঘরে আবদ্ধ হয়ে রইলেন। নবী করীম স. এর কোনো মজলিশে তিনি আর যেতেন না।

একদিন সাইয়্যেদে আলম স. জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? ছাবেত কেনো আসে না? তিনি তাঁকে ডেকে এনে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি উচ্চস্বরে কথা বলি, আর এ সম্পর্কে আয়াতে কারীমা নাযিল হয়েছে। আমার আশংকা হয়, না জানি আমার আমল বাতিল হয়ে যায়। রসুল করীম স. বললেন, তুমি তো ওই আয়াতে কারীমার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নও। আর আমার সাহাবীগণের কেউই সেরকম নয়।

রসুলে আকরম স. তাঁর আদব দেখে খুশি হয়ে বললেন, তোমার জীবনের দিনগুলো উত্তম এবং উত্তম অবস্থাতেই তুমি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করবে। রসুলেপাক স. তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আরও অধিক আলোচনা এই কিতাবের শেষাংশে আসবে ইনশাআল্লাহ্তায়ালা। উচ্চস্বরে তাঁকে ডাক দেয়া শুধু অবৈধ ছিলো তাই নয়, তাঁর হুজরা শরীফের বাইরে থেকেও তাঁকে ডাক দেয়া অবৈধ ছিলো। এক্ষেত্রে আদব হচ্ছে, চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না তিনি স্বেচ্ছায় বাইরে আসেন।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক এই যে, হকতায়ালা শানুহু কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাঁর হাবীব স. এর জীবনের, তাঁর শহরের এবং তাঁর জামানার কসম করেছেন। রসুলেপাক স. এর আরেকটি বিশেষত্ব, আল্লাহ্তায়ালা ওহীর সমস্ত প্রকারের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে কালাম করেছেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা মাবআছ অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের মধ্যে এটিও একটি অন্যতম বিশেষত্ব যে, রসুলেপাক স. এর নিকট হজরত ইস্রাফীল আ. এসেছিলেন। তিনি ইতোপূর্বে অন্য কোনো নবীর কাছে আসেননি। ইমাম তিবরানী হজরত ইবনে ওমর রা. এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন– রাসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, আমার নিকট ইস্রাফীল এসেছিলেন। আর কোনো নবীর কাছে তিনি আসেননি এবং এর পরেও কারও কাছে আসবেন না। একবার ইস্রাফীল আ. এসে নবী করীম স. এর কাছে আরয

করলেন, আপনার প্রভুপালক বলে পাঠিয়েছেন, আপনি নবী এবং বান্দা হওয়া পছন্দ করেন, নাকি নবী এবং বাদশাহ্ হওয়া পছন্দ করেন। আমি জিব্রাইলের কাছে জানতে চাইলাম, কোনটা পছন্দ করবো? তিনি বললেন, আপনি বিনয়কে গ্রহণ করুন। বান্দা হওয়াকে পছন্দ করুন।

নবী করীম স. বললেন, আমি যদি নবী এবং বাদশাহ হওয়া পছন্দ করতাম তাহলে স্বর্ণের পাহাড় আমার অনুবর্তী হতো। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে যে, হজরত ইস্রাফীল আ. নবী করীম স. এর নিকট একবার দু'বার আগমন করেননি, বরং তিনি নবী করীম স. এর মজলিশে সর্বদাই উপস্থিত থাকতেন।

'সুফরাতুস্ সাআদাত' কিতাবের লেখক বলেন, রসুলে আকরম স. এর বয়স যখন সাত বৎসর তখন তাঁর দাদা হজরত আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর লালনপালনের দায়িত্ব এসে পড়ে হজরত আবু তালিবের উপর। তখন আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইস্রাফীল আ. কে হুকুম করেন, তিনি যেনো সর্বদাই রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির থাকেন। এরপর থেকে নবী করীম স. এর বয়স এগারো বৎসর হওয়া পর্যন্ত হজরত ইস্রাফীল আ. তাঁর সঙ্গেই থাকতেন। তাঁর বয়স যখন এগারো বৎসর পূর্ণ হলো, হজরত জিব্রাইল আ. এর নিকট ফরমান হলো, রসুলেপাক স. এর খেদমতে থাকো।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, তিনি আদম আ. এর সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইমাম মুসলিম হজরত আবু হুরায়রা রা. এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন– নবী করীম স. বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আমি বনী আদমের সরদার হবো।' কিয়ামতের দিন বনী আদমের সরদার হলে দুনিয়াতে তো হবেনই। কেননা সেস্থান ও সময় তো তাঁর নেতৃত্ব, ইজ্জত-সম্মান বহিঃপ্রকাশেরই স্থান। সেখানে তিনি ব্যতীত অন্য কারও তো নিশ্বাস ফেলার অবকাশ থাকবে না। 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' এর তাফসীরের সূক্ষ্মতা সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

ইমাম তিরমিযী হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন আমি সকল বনী আদমের সরদার হবো, একথা অহংকারপ্রসূত নয়। আমার হাতেই সেদিন আল্লাহ্র বন্দনার পতাকা থাকবে। এটা দম্ভোক্তি নয়। হাদীছখানার তাৎপর্য এই যে, রসুলেপাক স. আল্লাহ্তায়ালার অনেক প্রশংসা করবেন, যা আর কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ্তায়ালার মারেফত জ্ঞান তাঁর যতটুকু ছিলো, ততটুকু আর কারও ছিলো না। আর ওই নেয়ামতের অধিকারী তিনি যতটুকু হয়েছিলেন, সেরকম আর কেউ হতে পারেননি। হামদ এর অর্থ মাহমুদিয়াতও হতে পারে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাঁর যত প্রশস্তি ও প্রশংসা করা হবে এরূপ আর অন্য কারও হবে

না। সেইদিন তাঁরই দিন। সেইদিনের মহিমা তাঁরই মহিমা। নবী করীম স. এর বক্তব্যে 'দম্ভোক্তি নয়' কথাটি রয়েছে। এর ভাবার্থ হচ্ছে, উপর্যুক্ত বিশেষত্ব আমার অর্জিত বিশেষত্ব নয়। বরং এটা মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের ফজল ও মেহেরবানি। অতএব কৃতিত্বজাত অহংকার থেকে আমার উক্তি মুক্ত।

আবার উপরোক্ত হাদীছের মর্ম এও হতে পারে যে, আওলাদে আদমের সরদারীর যে সম্পর্ক আমার প্রতি হয়েছে, তাতে অহংকারের কিছু নেই। আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে নির্ভরশীল হয়ে অহংকার করা যায়। যেমন কোনো কোনো আহলে এলেম নবী করীম স. এর বেলায়েতকে তাঁর নবুওয়াতের উপর মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কোনো কোনো আহলে কালাম এই হাদীছের অর্থ এরকম করে থাকেন যে, আমার অহংকার তো প্রকৃতপক্ষে সেই একক সত্তায় লয়প্রাপ্তিতে নিহিত। অস্তিত্বের নিদর্শন ও সৃষ্টির বেষ্টনীর মধ্যে নয়। তাই বুঝি তার ব্যাপকবিদিত কথাটি এরকম, আলফাকরু ফাকরী'– দারিদ্রই আমার অহংকার। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

তিনি সমগ্র আওলাদে আদমের সরদার। সমস্ত মাখলুকাতের সরদার। আল্লাহ্তায়ালার নিকট তিনি সমস্ত আম্বিয়া মুরসালীন, মালায়েকায়ে মুকাররাবীন, সমস্ত যমীন ও আসমানওয়ালাদের চাইতে অধিকতর সম্মানিত ও মর্যাদাশালী।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক, আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে এবং তাঁর ওসীলায় পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণের গোনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোরআন মজীদে ঘোষণা করেছেন, মা তাকাদ্দামা মিন যাম্বিকা ওয়া মা তাআখ্খারা। শায়েখ ইযযুদ্দীন আব্দুস সালাম র. বলেন, এটা রসুলেপাক স. এরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ্তায়ালা দুনিয়াতেই তাঁকে ক্ষমার সুসংবাদ শুনিয়েছেন। তবে তিনি একথা বলেননি যে, অন্য নবীদেরকে এরকম সুসংবাদ দেয়া হয়নি। কিন্তু এতটুকুতো জানা যায়, অন্য সকল নবী কিয়ামতের দিন নাফসী নাফসী বলবেন।

সারকথা, এই সকল নবী যদিও ক্ষমাপ্রাপ্ত এবং নবীগণ আখেরাতের শাস্তি থেকে মুক্ত, তবুও তাঁদের ক্ষমা সম্পর্কিত মর্যাদার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ঘোষণা আসেনি। কিয়ামত দিবসে নবী করীম স. কে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়া হবে। তিনি নিজের চিন্তা ভাবনা থেকে নিঃশংক বলেই উম্মতের চিন্তায় মনোনিবেশ করবেন। উম্মতের জন্য শাফাআত, তাদের গোনাহ্ মাফ করানো এবং তাদের মর্যাদা উচ্চ করার জন্য তিনি অবিরত চেষ্টা করতে থাকবেন। তাঁর বিশেষত্বের আরেকটি দিক এই, তাঁর কারীন অর্থাৎ হামযাদ শয়তান ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। অর্থাৎ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো। কথাটির বিস্তারিত আলোচনা আছে হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীছে। বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন প্রত্যেক

ব্যক্তির জন্য মুআক্কেল নিযুক্ত করা হয়েছে। সকলের জন্যই একজন জ্বীন আর একজন ফেরেশতাকে সাথী করে দেয়া হয়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনার বেলায়ও কি তাই? তিনি বললেন, হাঁ। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তার উপর আমাকে সাহায্য করেছেন; তাই সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে এখন কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছুতে প্ররোচিত করে না। কেউ কেউ বলে থাকেন, শয়তানের ইসলাম গ্রহণ করা মানে অধীন হয়ে যাওয়া। তবে এব্যাপারে অধিকাংশের মত, প্রকৃতই মুসলমান হয়ে যাওয়া।

নবী করীম স. এর আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁর জন্য কোনো অন্যায় বৈধ নয়। মাওয়াদী ও হেজাজী 'মুখতাসার রাউযা' নামক কিতাবে একথা উল্লেখ করেছেন। এক সম্প্রদায় এরকমও বলে থাকেন, ভুলও তাঁর জন্য অবৈধ। শরহে মুসলিমে ইমাম নববী থেকে উক্ত মত সম্পর্কে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকারও মতানৈক্য উল্লেখ ব্যতিরেকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ওই সকল বাণী যা তবলীগ, শরীয়ত ও ওহীর সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তি না হওয়াকে বুঝানো হয়েছে এবং এর উপর এজমা সংঘটিত হয়েছে। তবে খবর বা বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর ভুল ভ্রান্তি হয়েছিলো কিনা, এ সম্পর্কে কেউ কেউ মতানৈক্য করে থাকেন। তাঁরা এ সকল ক্ষেত্রে নবী করীম স. থেকে ভুল ভ্রান্তি হওয়াকে জায়েয মনে করেছেন। তবে তাদের মতটি দুর্বল। কেননা বাস্তববিরোধী সংবাদ মিথ্যা এবং দোষণীয়। এ ব্যাপারে রসুলেপাক স. এর ইজ্জতের প্রসঙ্গকে পাক সাফ মনে করা ওয়াজিব। একথা সন্দেহাতীতভাবে জানা আছে যে, সাহাবা কেরামের স্বভাব ছিলো, তাঁরা রসুলে আকরম স. এর সকল কথাতেই নির্ভর করতেন। তা যে কোনো ব্যাপারে বা যে কোনো বিষয়েই হোক না কেনো। এটাই প্রখ্যাত আলেমগণের মত। নামাজে রসুলেপাক স. এর ভুল হয়েছিলো। এই ভুলের ব্যাপারে ধারণা রাখতে হবে যে, এর মাধ্যমে শরীয়তের বিধান জারী করাই ছিলো উদ্দেশ্য। রসুলেপাক স. এর মানবীয় অংশ এবং প্রাকৃতিক বিধানকে বিদ্যমান রাখা হয়েছিলো। তাঁর বিভিন্ন অঙ্গের কাজ এবং অঙ্গ সঞ্চালন এসব কিছু সৃষ্টি জগতের সাথেই সম্পর্কযুক্ত ছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

এখন আসা যাক ভুলের সূত্র প্রসঙ্গে। বুদ্ধিবাদিতার ভুল– যেমন বদরবন্দীদের কাছ থেকে ফিদইয়া গ্রহণের ব্যাপারটি। এক্ষেত্রে দেখা গেছে, রসুলেপাক স. কে উক্ত বিবেচনাপ্রসূত ভুলের উপর বিদ্যমান রাখা হয়নি। বরং এ সম্পর্কে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সমস্ত বিবেচনাপ্রসূত ভুলের ব্যাপারে একই বিধান। এখন রইলো সন্দেহের ব্যাপার। সন্দেহের বাতিক তাঁর পবিত্র জীবদ্দশায় কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। যেমন নামাজে এরকম সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া যে, দু'রাকাত

নামাজ পড়লেন, না তিন রাকাত। এধরনের সন্দেহ তাঁর ছিলোই না। তিনি এরশাদ করেছেন, সংশয় সন্দেহ আনে শয়তান।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি স্তর হচ্ছে, মৃতব্যক্তিকে কবরে তাঁর স. সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। যেমন বলা হবে, ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মতামত কী, যিনি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। নবী করীম স. সম্পর্কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছ থেকে বুঝা যায়, কবরে অন্য কোনো উম্মতকে তাদের নবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো আলেম বলে থাকেন, কবরের প্রশ্নোত্তর উম্মতে মোহাম্মদী স. এর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে আলমে বরযখে গোনাহ্ থেকে পাকসাফ করে আলমে আখেরাতে উপস্থিত করবেন। নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, আল্লাহ্র নামে কসম করার সময় রসুলেপাক স. এর নামেও কসম করা জায়েয। তবে অন্য কারো নামে কসম করা জায়েয নয়। যেমন, ফেরেশতার নামে বা নবীগণের নামে কসম করা অবৈধ। শায়েখ ইযযুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম বলেন এ বৈধতাটি রসুলেপাক স. এর জন্য অপরিহার্য। অন্য কেউ তাঁর মতো নয়। কথাটি মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়াতে আছে।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, তাঁর পুতপবিত্রা স্ত্রীগণকে উম্মতের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'তাঁর স. স্ত্রীগণ উম্মতের মা।' তাঁদের এহেন মর্যাদা রসুলেপাক স. এর মর্যাদার কারণেই। তাঁরা জান্নাতেও তাঁর স্ত্রী হিসেবে বসবাস করবেন।

আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কালামে ঘোষণা করেছেন, 'তোমাদের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তোমরা আল্লাহ্র রসুলকে কষ্ট দিবে, আর এটাও সমীচীন নয় যে, তাঁর প্রস্থানের পর তাঁর স্ত্রীগণকে বিবাহ করবে।'

রওজাতুল আহবাব কিতাবে আছে, তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ বলেছিলেন, রসুলেপাক স. দুনিয়া থেকে পর্দা করলে, আমি হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. কে বিয়ের প্রস্তাব দেবো। তখনই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। কোনো কোনো কিতাবে এসেছে, বদবখত ইয়াযীদ হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর প্রতি লোভ করেছিলো, তখন মুমিনগণ উপরোক্ত আয়াতে কারীমা শুনিয়ে তাকে একাজ থেকে বিরত করেছিলেন।

আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের বিয়ে হারাম হওয়া সম্পর্কিত বিধান ওই বিবিগণের বেলায় যাঁদেরকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিলো যে, তাঁরা ইচ্ছা করলে দুনিয়া ও তার চাকচিক্য গ্রহণ করতে পারেন। অথবা ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে গ্রহণ করতে পারেন। এরপর যারা দুনিয়া চেয়েছিলেন, তাঁরা রসুলেপাক স. থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। তাদেরকে বিয়ে করা হালাল হওয়া সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমামুল হারামাইন এবং ইমাম গাযযালী র. তাঁদের হালাল হওয়ার ব্যাপারে মত পোষণ করেছেন। কিন্তু যে বিবিগণ রসুলেপাক স. এর ওফাত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তাঁরা চিরকালের জন্য অন্যের জন্য হারাম।

এখন তাঁদেরকে দেখা উম্মতের জন্য হালাল কিনা– সে সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ মতটি হচ্ছে, তাঁদেরকে দেখাও নিষিদ্ধ। মা কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, তাঁদেরকে ইয্যত-সম্মান করা এবং বিয়ে হারাম হওয়া। তাঁদের সঙ্গে নির্জনে অবস্থান, তাঁদের থেকে মীরাছ গ্রহণ– এরকম অর্থে নয়। যেমন কেউ যদি বলে, রসুলেপাক স. এর কন্যাগণ তো মুসলমানদের জন্য ভগ্নি তুল্য, এটা ঠিক নয়। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে এরকম উদ্ধৃত হয়েছে।

মোটকথা, আযওয়াজে মুতাহ্হারাতগণ উম্মতের জন্য হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে, নবী করীম স. এর রওজা শরীফে জীবিত থাকা। উলামায়ে কেরাম বলেন, স্বামীর মৃত্যুর কারণে স্ত্রীগণের যে ইদ্দত পালনের নিয়ম, আযওয়াজে মুতাহ্হারাতগণের বেলায় তা ছিলো না। যাদেরকে রসুলেপাক স. এখতিয়ার দিয়ে দিয়েছিলেন এবং অঙ্গের শুভ্রতা দেখে যাঁদেরকে তিনি পৃথক করে দিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি মত হচ্ছে, তাঁরাও উম্মতের জন্য হারাম।

ইমাম শাফেয়ী র. দৃঢ়তার সাথে এই মতের উপর রয়েছেন। আর এক মত অনুসারে তাঁরা হারাম নয়। ইমামুল হারামাইন বলেন, তাঁরা যদি নবী করীম স. এর সঙ্গে বাসর যাপন করে থাকেন, তাহলে হারাম। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, আশাআছ ইবনে কায়েস হজরত ওমর ফারুক রা. এর জামানায় রসুলেপাক স. এর জনৈক পরিত্যক্তা বিবিকে বিয়ে করেছিলেন। এতে হজরত ওমর ফারুক রা. ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে সঙ্গেছার করতে চেয়েছিলেন। পরে যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন, উক্ত বিবির সঙ্গে নবী করীম স. এর বাসরযাপন হয়নি, তখন সঙ্গেছার করা থেকে বিরত হয়েছিলেন।

বাসর যাপন করার পর নবী করীম স. যে সকল বাঁদীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে উম্মতের বিয়ে বৈধ হওয়া সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে। তন্মধ্যে তৃতীয় মতটি হচ্ছে, তাঁরাও উম্মতের জন্য হারাম হবেন, যদি তাঁদের পৃথক হওয়াটা নবী করীম স. এর ওফাতের কারণে হয়ে থাকে। যেমন হজরত মারিয়া কিবতিয়া রা., যিনি নবী করীম স. এর সাহেবজাদা হজরত ইব্রাহীমের জননী ছিলেন। আর যদি কোনো বাঁদীকে নবী করীম স. তাঁর জীবদ্দশায় বিক্রি করে দিয়ে যেয়ে থাকেন, তিনি উম্মতের জন্য হারাম হবেন না।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক এই ছিলো যে, পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁর আযওয়াজে মুতাহ্হারাতগণের দেহ মোবারক দেখাও

হারাম হয়ে গিয়েছিলো, যদিও তা বোরকা বা চাদরে আচ্ছাদিত থাকতো। কোনো প্রয়োজনে যথা সাক্ষী ইত্যাদির কারণে চেহারা মোবারক বা হাত খোলাও হারাম ছিলো। যদিও এক্ষেত্রে অন্য মেয়েদের জন্য এরূপ করা জায়েয।

কাযীখানের মধ্যে এরকম ফতওয়া প্রদান করা হয়েছে। তিনি স্বীয় গ্রন্থ ফতওয়ায়ে কাযীখানে উল্লেখ করেছেন, উম্মাহাতুল মুমিনীনের চেহারা এবং হাতের পর্দাও ফরজ ছিলো। এতে কোনো মতভেদ নেই। সাক্ষী দেয়ার ক্ষেত্রেও মুখ ও হাত খোলা বৈধ ছিলো না। তবে হাঁ, প্রাকৃতিক প্রয়োজনে জায়েয ছিলো। মুআত্তা গ্রন্থে এই হাদীছ দ্বারা উপরোক্ত বিধানের দলীল নেয়া হয়েছে।

হাদীছখানা হচ্ছে এই, হজরত হাফসা বিনতে ওমর রা. এর ওফাত হলে মেয়েরা তাঁর দেহ মোবারককে আচ্ছাদিত করে ফেলেছিলেন, যেনো কেউ তাঁর দেহ মোবারক দেখতে না পারে। হজরত যয়নব বিনতে জাহাশ রা. হজরত হাফসা রা. এর লাশ মোবারকের উপর কাপড় দিয়ে গম্বুজের মত তৈরী করে দিয়েছিলেন, যেনো দেহের গঠনও অনুমান করা না যায়।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী থেকে বর্ণনা করেছেন, ফতওয়ায়ে কাযীখানে যা বলা হয়েছে তা যে ফরজ, এ সম্পর্কে কোনো দলীল নেই। একথা সুসাব্যস্ত যে, আযওয়াজে মুতাহ্হারাতগণ হজ ও তাওয়াফের জন্য বাইরে আসতেন এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাঁদের কাছ থেকে হাদীছ শুনতেন। তবে তাঁদের দেহ মোবারক কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত থাকতো। তবে শারীরিক কাঠামোকেও তাঁরা লুকিয়ে রাখতেন, এরকম হতো না। উম্মাহাতুল মুমিনীনের পর্দার অর্থ দেহ কাঠামো যাহের না করা, যদিও তা কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। একথা সর্বজনবিদিত এবং সুসাব্যস্ত। তবে এক্ষেত্রে শায়েখ ইবনে হাজার র. এর কথার অর্থ কী? ওইরূপ পর্দা ফরজ নয়, এটা বুঝানোই কি তাঁর উদ্দেশ্য? তাঁর বর্ণনার প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা এরকমই বুঝা যায়। নাকি- এরূপ পর্দা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে হবে, এরূপ বুঝানোই ছিলো উদ্দেশ্য? অথচ তাঁদের হজ ও তওয়াফের সময় দেহকাঠামো দৃষ্টিগোচর হয়েছে, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়।

হাদীছ শরীফে এসেছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বর্ণনা করেছেন, আমরা হজ পালনকালে রাস্তায় অন্য মেয়েদের সঙ্গে চলার সময় চেহারার সম্মুখ থেকে পর্দা উঠিয়ে দিতাম। আবার কোনো পুরুষ মানুষ সামনে পৌঁছে যাবে মনে হলে চেহারার উপর পর্দা ফেলে দিতাম। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, উম্মুল মুমিনীন হজরত সুফিয়া রা. দুর্বলতায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে ভীড়ের মধ্যে তওয়াফ করতে পারছিলেন না, তখন রসুলেপাক স. তাঁকে মানুষের পিছনে থেকে তওয়াফ করার জন্য বলেছিলেন। সকল বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পর্দার ভিতরে থাকলেও তাঁদের দেহ কাঠামো আন্দাজ করা যেতো না, এরকম ছিলো না।

এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায়, উম্মুল মুমিনীনগণ যখন হাদীছ শোনাতেন, তখন তাঁদের অবস্থা কী ছিলো? এর উত্তর হচ্ছে যে, এটাতো সম্ভব যে, তাঁরা পর্দার ভিতরে থেকেই হাদীছ বর্ণনা করতেন। হজরত আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে আয়মন তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একবার আমি হাদীছ শ্রবণার্থে উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর কাছে গেলাম। তখন তাঁর শরীরে কিতয়ী উড়না ছিলো। এই বর্ণনার প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, উড়নাখানা তাঁর দেহ মোবারকের উপর ছিলো এবং দেহ আচ্ছাদিত ছিলো। উম্মুল মুমিনীনগণের পর্দার অর্থ দেহকাঠামোও দেখা যাবে না– এরকম নয়। তবে ওই সকল অঙ্গ যা প্রয়োজনে মেয়েরা খুলতে পারে, যেমন হাত, মুখ– এগুলো তাঁদের জন্য খোলা হারাম ছিলো।

নবী করীম স. এর বিশেষ আরেকটি দিক এই যে, তাঁর সাহেবজাদীগণের সন্তান-সন্ততির বংশ পরিচয় রসুলেপাক স. এর মাধ্যমেই হয়। পিতৃ বংশের মাধ্যমে তাঁরা পরিচিত হতেন না। নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক নবীর আওলাদ তাদের পৃষ্ঠ হতে আর আমার আওলাদ আলী কা. এর পৃষ্ঠ হতে। হজরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রা. এর শান সম্পর্কে হাদীছ শরীফে এসেছে, এদু'জন আমার কন্যার পুত্র। হে আল্লাহ্! আমি এদেরকে ভালবাসি। তুমিও এদেরকে ভালবাসো। আর যারা এদেরকে ভালবাসে, তুমি তাদেরকেও ভালবাসো। অপর এক হাদীছে এসেছে, 'আমার এ দু'সন্তান দুনিয়ার সুগন্ধী।' বর্ণিত আছে, নবী করীম স. সাইয়্যেদা হজরত ফাতেমা রা. কে বলতেন, আমার ফরযন্দ দু'জনকে আমার কাছে আনো। তারপর তিনি তাঁদের দেহের সুঘ্রাণ শুঁকতেন এবং বুকের সঙ্গে তাঁদেরকে জড়িয়ে ধরতেন।

হজরত ইমাম হাসান রা. সম্পর্কে বলতেন, নিশ্চয়ই আমার এই ফরজন্দ একজন সাইয়্যেদ বা নেতা। এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হজরত ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন রা. এর মধ্য থেকে কোনো একজন মসজিদে নববীতে এসে নবী করীম স. এর পবিত্র পৃষ্ঠদেশের উপর বসে গেলেন। তিনি স. তখন সেজদায় ছিলেন। সেজদা থেকে মাথা উত্তোলন করতে বিলম্ব করলেন। নামাজান্তে সাহাবায়েকেরাম নবী করীম স. কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! সেজদা এত দীর্ঘ করার কারণ কী? সেজদার সময় কি ওহী এসেছিলো? রসুল স. বললেন, আমার পিঠে আমার ফরজন্দ সওয়ার হয়েছিলো। সে স্বেচ্ছায় পিঠের উপর থেকে নেমে যাওয়ার আগে মাথা ওঠানো আমার কাছে পছন্দনীয় মনে হচ্ছিলো না। হজরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রা. যে নবী করীম স. এর বংশধর হিসেবে পরিচিত, তার প্রমাণ আয়াতে মুবাহালাতে রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, 'আমি আমার সন্তানদেরকে ডাকবো।'

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক এই, তিনি এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত সবব ও নসব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পার্থিব সম্পর্ক দ্বারা কোনো লাভ হবে না। কিন্তু আমার সবব ও নসব ঠিক থাকবে। নসবের অর্থ আওলাদ আর সববের অর্থ বৈবাহিক সম্পর্ক। এই পরিপ্রেক্ষিতে হজরত ওমর ফারুক রা. হজরত ফাতেমা রা. এর জনৈকা কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, এই বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে তিনি যেনো নবী করীম স. এর সববের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন। এই ঘটনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে আসবে ইনশাআল্লাহ্। মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, তাঁর সাহেবজাদীগণের বর্তমানে তাঁদের স্বামীগণের জন্য অন্য বিয়ে বৈধ ছিলো না। অর্থাৎ তাঁরা জীবিত আছেন, এমতাবস্থায় স্বামীগণ অন্য কোনো রমণীর পাণি গ্রহণ করবেন এবং একস্থানে সতীন হয়ে সাহেবজাদীগণ ঘর করবেন, এটা বৈধ ছিলো না।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। হজরত আলী মুর্তজা রা. এক সময় ইচ্ছে করলেন, আবু জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করবেন, যিনি মুসলমান হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেছিলেন। হজরত ফাতেমা রা. একথা জানতে পেরে নবী করীম স. এর খেদমতে এসে আরয করলেন, আপনার কাওমের লোকেরা তো বলে যে, রসুলুল্লাহ তাঁর সাহেবজাদীগণের বেলায় কোনো অমঙ্গল কামনা করেন না। আলী আবু জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন, অথচ আপনি কিছু বলছেন না।

একথা শুনে নবী করীম স. মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হলেন এবং খোতবা দিলেন। বললেন, আমি তো আবুল আসের সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ে দিয়েছি। ইনি রসুলুল্লাহ্র জামাতা। হজরত যয়নব রা. কে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি তখন ছিলেন জীবিত। রসুল স. বললেন, এখন পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে ভালো আচরণ করে আসছে এবং আমার সন্তুষ্টির প্রতি নজর রেখেছে। ফাতেমা আমার কলীজার টুকরা। কেউ তাকে কষ্ট দিক, তাকে পরীক্ষায় ফেলুক– তা আমার পছন্দ নয়। যা ফাতেমাকে কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়। শুনলাম, আলী মুর্তজা নাকি আবু জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করতে চায়। আল্লাহ্র কসম! রসুলের কন্যা আর আল্লাহ্র শত্রুর কন্যা একসঙ্গে কোনো ব্যক্তির ঘর করতে পারে না। তার উচিত হবে ফাতেমাকে তালাক দিয়ে আবু জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করা।

একথা শুনে হজরত আলী মুর্তজা রা. ওযরখাহী পেশ করলেন এবং আবু জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। এরপর রসুলেপাক স. হজরত আলী রা. এর উপর হারাম করে দিলেন যে, হজরত ফাতেমা রা. এর জীবদ্দশায় তাঁর সতীন যেনো না হয়। বললেন, হে আলী! আমি তোমাকে

ভালোবাসি এবং তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই, তুমি যেনো ফাতেমাকে কষ্ট না দাও। এতে আমাকে কষ্ট দেয়া হয়। এই হাদীছখানা যদিও বিশেষভাবে হজরত ফাতেমা রা. এর ব্যাপারে প্রযোজ্য, তবুও অন্যান্য সাহেবজাদীগণের বেলায়ও একই হুকুম। এছাড়া বুঝানো হয়েছে, তাদের সকলের বেলায়ই সতীন গ্রহণ করা রসুলেপাক স. কে কষ্ট দেয়াকে অপরিহার্য করে। তাই এই বিধান সকল সাহেবজাদীর বেলায় প্রযোজ্য হয়েছে।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, মসজিদে নববীতে যে মেহরাব নির্মিত আছে, তার ডান বা বাম দিকে দাঁড়িয়ে চিন্তা ভাবনা করে যদি কেবলা সোজা করতে চায় তবে এধরনের চিন্তাভাবনা ও এজতেহাদ বৈধ হবে না। শায়েখুল ইসলাম আবু যুরাআ এক ব্যক্তি সম্পর্কে ফতওয়া দিয়েছিলেন– লোকটি মেহরাবে নববীর পাশে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে অস্বীকার করেছিলো। বলেছিলো, আমি কেবলার দিক ঠিক করার জন্য এজতেহাদ করবো এবং এজতেহাদ করে সেই দিকে ফিরে নামাজ আদায় করবো। এখন সে যদি মসজিদে নববীর বর্তমান মেহরাব নবী করীম স. এর জামানায় তৈরী হয়েছিলো বলে জেনে এজতেহাদ করার চিন্তা করে থাকে, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। নাউযুবিল্লাহ্! আর যদি সে এরকম মনে করে যে, এই মেহরাবখানা নবী করীম স. এর জামানায় তৈরী মেহরাব নয়, বরং পরবর্তীতে তৈরী করা হয়েছে এবং এতে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, তাহলে তাকে মুরতাদ হওয়া থেকে বাঁচানো যাবে। বর্ণনা পাওয়া যায় যে, নবী করীম স. যখন মসজিদে নববীতে নামাজে দণ্ডায়মান হতেন, তখন তাঁর সম্মুখ থেকে সমস্ত পর্দা সরিয়ে দেয়া হতো। রসুলেপাক স. এর দৃষ্টির সামনে খানায়ে কাবা উপস্থিত থাকতো। সেই হিসেবে কেবলার হুবহু বরাবরই মসজিদে নববীর মেহরাব তৈরী করা হয়েছিলো।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি যদি নবী করীম স. কে স্বপ্নে দেখে, তবে নিঃসন্দেহে সে তাঁকেই দেখে। কেননা, শয়তান কখনও তাঁর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তাকে এই শক্তি দেয়া হয়নি যে, সে রসুলেপাক স. এর আকৃতি ধারণ করে মানুষকে ধোঁকা দিবে। নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে সত্যই আমাকেই দেখলো। হাদীছখানার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্তায়ালা শয়তানকে এমন শক্তি প্রদান করেছেন, সে তার ইচ্ছা মতো আকৃতি ধারণ করতে পারে। কিন্তু রসুলেপাক স. এর পবিত্র আকৃতি ধারণ করার শক্তি তাকে দেয়া হয়নি। কেননা, তিনি হচ্ছেন হেদায়েতের প্রকাশস্থল। আর অপরপক্ষে শয়তান হচ্ছে গোমরাহীর প্রকাশস্থল। হেদায়েত ও গোমরাহী পরস্পর বিপরীত বস্তু। এমনকি শয়তান পরওয়ারদেগারে আলম আল্লাহ্তায়ালার আনুমানিক আকৃতি ধারণ করতে পারে এবং মানুষকে

ধোঁকায় ফেলতে পারে। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা হেদায়েত ও গোমরাহীর সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু রসুলেপাক স. এর পবিত্র সত্তা কেবলই হেদায়েত। কোনো কোনো আলেম বলে থাকেন, এই ফযীলত বা বিশেষত্ব সকল আম্বিয়া কেরামের জন্যই। শয়তান কোনো নবীরই আকৃতি ধরতে পারে না। তবে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবের লেখক এই ফযীলতকে কেবল রসুলেপাক স. এর জন্যই নির্ধারণ করেছেন।

দর্শনের ক্ষেত্রে নবী করীম স. কে কোনো বিশেষ আকৃতিতে দেখাও শর্ত নয়। যে কোনো ব্যক্তি তাঁকে যে কোনো সুরতে দেখে থাকুক না কেনো, নিঃসন্দেহে সে তাঁকেই দেখেছে মনে করতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে কেউ কেউ সন্দেহ করেছেন। তাঁদের মতে তাঁকে বিশেষ আকৃতিতে দেখা শর্ত। কথাটির অর্থ এই যে, রসুলেপাক স. এর পবিত্র আকৃতি যে রকম ছিলো, ঠিক সেরকমই দেখতে হবে। কেউ কেউ আবার এ বিষযটিকে আরও কঠিন করে দিয়েছেন। তাঁদের মত হচ্ছে, রসুলেপাক স. দুনিয়া থেকে পর্দা করার সময় যেরকম ছিলেন, হুবহু সেরকমই দেখতে হবে। এমনকি দুনিয়া থেকে বিদায়কালে যে কয়খানা দাড়ি মোবারক শাদা হয়ে গিয়েছিলো, তার সঠিক হিসেবও দর্শনের শর্তের অন্তর্ভূত করেছেন। ওই সময় তাঁর দাড়ি মোবারকের চুল বিশ খানার অধিক শুভ্র ছিলো না। তাঁকে ওইরকমই দেখতে হবে। তাঁরা বলে থাকেন, একবার স্বপ্নবিশারদ ইবনে শীরিনের নিকট এক ব্যক্তি রসুল স. এর দীদার সম্পর্কে বললো। তিনি বললেন, তাঁকে কী আকৃতিতে দেখেছো? রসুলেপাক স. এর আকৃতি যেরকম ছিলো, ওই রকম বলতে না পারলে তিনি বলতেন, রসুলেপাক স. এর জিয়ারত তোমার হয়নি। আলেমগণ বলেন, এই হাদীছের কোনো সহীহ্ সনদ নেই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

একবার এক লোক হজরত ইবনে আব্বাস রা.কে বললো, আমি স্বপ্নে রসুলেপাক স. কে দেখেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আকৃতিতে দেখেছো? লোকটি বললো, সাইয়্যেদুনা হজরত ইমাম হাসান রা. এর আকৃতিতে দেখেছি। হজরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, তুমি সত্যই দেখেছো। এ সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম আবার এরকমও বলে থাকেন, তাঁকে বিশেষ আকৃতিতে এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাথে দেখা তাঁর হাকীকতের এদরাক। আর অন্য আকৃতিতে দেখা তাঁর মেছালের এদরাক। যাই হোক এক্ষেত্রে সঠিক কথা এটাই, যার উপর মোহাদ্দেছীনে কেরাম একমত হয়েছেন— যে কোনো সুরতেই দেখা হোক না কেনো, প্রকৃতপক্ষে তা রসুলেপাক স. এরই দীদার। তবে বিশেষ সুরতে দেখা অধিকতর পূর্ণ ও উত্তম। দর্শনে আকৃতির তারতম্য, চেতনার দর্পনের তারতম্য অনুসারে হয়ে থাকে। যার চেতনা ইসলামের নূরে যতটুকু আলোকিত, তার দর্শনও সেই পরিমাণ পূর্ণ। মুসলিম শরীফে আছে, যে আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে অচিরেই

আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে। কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই হাদীছ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ১. উক্ত দর্শনের অর্থ হবে আখেরাতের দর্শন। এ সম্পর্কে অবশ্য উলামায়েকেরাম বলে থাকেন, আখেরাতে তো সকল উম্মতই তাঁর দীদারে ধন্য হবে। তাহলে এ কথার বিশেষত্ব কোথায়? উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন, উক্ত দর্শন দ্বারা এক বিশেষ ধরনের দর্শন এবং বিশেষ রকমের নৈকট্য বুঝতে হবে। ব্যাপারটি এরকম হতে পারে, গোনাহ্গারেরা পার্থিব আকর্ষণে লিপ্ত হয়ে দুর্ভাগ্যের কারণে দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু তাঁকে স্বপ্নে দর্শনকারীরা ব্যর্থতা থেকে সুরক্ষিত থাকবে। ২. অপর এক দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লিখিত হাদীছের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়— জাগ্রত অবস্থায় দর্শন লাভের অর্থ, স্বপ্নে দর্শিত বস্তু ও তার ব্যাখ্যা সঠিক হিসেবে চিহ্নিত হওয়া। এই ব্যাখ্যাটি অবশ্য রসুলেপাক স. এর জামানার লোকদের জন্য। এই হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে, যে ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখবে, অচিরেই সে তাঁর সাহচর্য লাভে ধন্য হবে। এই ব্যাখ্যাটি স্পষ্ট। অন্যান্য বর্ণনাতেও এরকম বুঝা যায়। যেমন একটি বর্ণনা— এক ব্যক্তি রসুল স. এর কাছে নিবেদন করলো, আমার পিতা অতি বৃদ্ধ। তাই রসুলেপাক স. এর দরবারে উপস্থিত হতে পারছেন না। তবে তিনি স্বপ্নে আপনাকে দেখেছেন। তখন নবী করীম স. বলেছিলেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, অচিরেই সে জাগ্রতাবস্থায় আমাকে দেখতে পাবে। হাদীছের মর্মার্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সে পথের পথিকদের জন্য এটি একটি সুসংবাদ। তাঁরা পথিকদের স্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে স্তরে স্তরে উন্নতি সাধন করে এক পর্যায়ে উক্ত নেয়ামত লাভে ধন্য হতে পারবেন এবং জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্যও লাভ করতে পারবেন। কিন্তু রসুলেপাক স. এর দুনিয়া থেকে প্রস্থানের পর জাগ্রত অবস্থায় তাঁর দর্শন লাভ সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম মতানৈক্য করে থাকেন। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবের লেখক তাঁর শায়েখ থেকে বর্ণনা করেছেন– তিনি এরকম বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম বা তৎপরবর্তীগণের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি নবী করীম স. এর ওফাতের পর জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে দেখেছেন। আর একথাতো খুব ভালোভাবেই প্রমাণিত আছে যে, নবী করীম স. এর ইন্তেকালের পর হজরত ফাতেমা রা. বিরহব্যথায় জর্জরিত ছিলেন। সহীভাবে প্রমাণিত যে, বিরহযন্ত্রণায় তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে তিনি নবী করীম স. এর ওফাতের ছ'মাস পর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁর আবাস তো ছিলো নবী করীম স. এর রওজা শরীফের পাশেই। কিন্তু এরকম বর্ণনা কেউ করেননি যে, তিনি জাগ্রত অবস্থায় নবী করীম স.কে দেখেছেন। কিন্তু কোনো কোনো সালেহীন নবী করীম স. এর দর্শন সম্পর্কে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

যেমন হজরত বাযরীর 'তাওছীকু আরবাসুল ইমানের মধ্যে', ইবনে আবী হুমায়রা তাঁর কিতাব বাহজাতুন্নফুস এর মধ্যে, আফীফ ইয়াফেয়ী তাঁর রওজাতুল বাইয়্যাহীন এবং তাঁর অন্যান্য রচনায়। শায়েখ সফিউদ্দীন ইবনুল মনসুর তাঁর পুস্তিকায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায় ইবনে আবীহুমায়রার উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, নবী করীম স. এর দর্শন সম্পর্কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের একটি দল আলোচনা করেছেন। তাঁরা সকলেই জাগ্রত দর্শনকে সমর্থন করেন। বলেন, আমরা রসুল স. কে স্বপ্নে দেখেছি এবং পরে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি। তাঁরা পেরেশানী ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় সম্পর্কেও নবী করীম স. থেকে সমাধান লাভ করেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। রসুল স. তাঁদেরকে মুক্তিলাভের উপায় বলে দিয়েছেন। আউলিয়ার কারামত অস্বীকারকারীদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। কেননা, এ সম্পর্কিত সকল বর্ণনাই তাদের কাছে মিথ্যা। আর আউলিয়ার কারামত বিশ্বাসীরা এটাকে বিশ্বাস করবেই। শেষ কথা এই যে, জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে দর্শন করা ওলীগণের কারামতেরই পর্যায়ভুক্ত। কেননা আউলিয়া কেরামের নিকট এ জাতীয় অস্বাভাবিক ব্যাপার সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নয়। এ ব্যাপারে অন্য কারও অধিকার নেই। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার বর্ণনা করেন, শায়েখ আবুল মনসুর তাঁর পুস্তিকায় বলেছেন, আহলে কামালগণ বয়ান করেছেন, কোনো এক সময় শায়েখ আবুল আব্বাস কুসতুলানী রসুল করীম স. এর দরবারে হাজির হলে তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার হস্ত ধরেছেন হে আহমদ! শায়েখ আবু মসউদ থেকে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন, আমি তোমাদের শায়েখ আবুল আব্বাস এবং ওই জামানার কতিপয় মাশায়েখ ও সালেহ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। অতঃপর সকল দিক থেকে মনযোগ ছিন্ন করে আমি অন্য ব্যাপারে মশগুল হয়ে গেলাম। আমার তখন এনকেশাফ (আত্মিক বিকাশ) শুরু হয়ে গেলো। আমি শায়েখকে নবী করীম স. এর দরবারে দেখলাম। সেখানে রসুলেপাক স. সর্বশেষে আমার সঙ্গে মুসাফেহা করলেন।

হজরত শায়েখ আবুল আব্বাস ছাবা বলেন, একদা আমি নবী পাক স. এর দরবারে হাজির হলাম। দেখলাম, নবী করীম স. আউলিয়া কেরামের নামে হুকুম ও ফরমান রচনা করছেন। আমার এক ভাইয়ের (যার নাম ছিলো মোহাম্মদ) নামেও তিনি একটি ফরমান রচনা করলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার নামে তো কোনো ফরমান রচনা করলেন না। রসুলেপাক স. এরশাদ করলেন, তোমার অন্য মাকাম রয়েছে। ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম স্বীয় গ্রন্থ

আলমুস্তাদ মিনাদ্দালাল এ উল্লেখ করেছেন, আরবাবে কুলুব ব্যক্তিরা জাগ্রত অবস্থায়ই ফেরেশতা এবং আম্বিয়া কেরামের রূহসমূহ দেখে থাকেন, তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনতে পান। তাঁদের কাছ থেকে নূর অর্জন করতে পারেন এবং বিভিন্নভাবে ফায়দা লাভ করতে সক্ষম হন। সাইয়্যেদ সফীউদ্দীন ও সাইয়্যেদ আফীফউদ্দীনের পিতা হজরত সাইয়্যেদ নূরুদ্দীন আল হাই থেকে বর্ণনা করা হয়েছে– তিনি বর্ণনা করেছেন, জিয়ারতের সময় কখনো কখনো তিনি নবী করীম স. এর রওজা শরীফ থেকে সালামের জবাব শুনতে পেতেন। তিনি সালামের জবাব দিতেন এভাবে, হে আমার সন্তান তোমার উপর সালাম। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায় এরকম অনেক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে, শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী কুঃ আওয়ারেফুল মাআরেফ কিতাবে গাউছুল আজম শায়েখ আব্দুল কাদের জীলানী র. থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. বিয়ে করার হুকুম দান পর্যন্ত আমি বিয়ে করার চিন্তাই করিনি। এই কিতাবের লেখক বান্দা মিসকীন (শায়েখ আব্দুল হক ইবনে সাইফুদ্দীন মোহাদ্দেছে দেহলভী) শায়েখ আবুল হাসান আলী ইবনে ইউসুফ শাফেয়ী র. প্রণীত ‘বাহজাতুল আসরার’ এ উল্লেখ করেছেন, শায়েখ আবুল হাসান আলী এবং শায়েখ আব্দুল কাদের জীলানী র. এর মধ্যে মাত্র দু’টি ওয়াসেতা (স্তর) রয়েছে। তিনি শায়েখ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে শায়েখ আব্দুল্লাহ আযহারী হুসাইনী র. থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি হজরত শায়েখ সৈয়দ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জীলানী র. এর মজলিশে ছিলাম। ওই সময় তাঁর মজলিশে দশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলো। হজরত শায়েখ আলী ইবনে হাইতী গাউছুল আজমের সামনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর বসার স্থান এটাই নির্ধারিত ছিলো। হঠাৎ তিনি তন্দ্রাভিভূত হলেন। এমন সময় গাউছুল আজম সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, নীরব হয়ে যাও। সবাই নীরব হলো। ওই সময় তাঁদের নিঃশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ ছিলো না। অতঃপর হজরত গাউছুল আজম মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন এবং হজরত শায়েখ হাইতীর সামনে অত্যন্ত আদবের সাথে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত নিগুঢ়ভাবে তাঁর দিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। শায়েখ আলী হাইতী যখন সচেতন হলেন, তখন গাউছুল আজম র. বললেন, হে শায়েখ! স্বপ্নে কি তুমি রসুল স. এর দীদার লাভ করেছো? তিনি বললেন, হাঁ। তখন গাউছুল আজম র. বললেন, এ জন্যইতো আমি আদব সম্মান রক্ষা করেছি। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, রসুল স. তোমাকে কী নসিহত করলেন? তিনি বললেন, আমাকে আপনার খেদমতে হাজির থাকতে বলেছেন। ওই সময় শায়েখ আলী হাইতী র. বলেছিলেন, আমি যা

কিছু স্বপ্নে দেখেছি, হজরত গাউছুল আজম র. তা জাগ্রত অবস্থায়ই দেখে নিয়েছেন। সেদিন ওই মজলিশের সাতজন লোক আল্লাহ্তায়ালার ভয়ে দুনিয়া হতে চিরবিদায় নিয়েছিলো। রসুলেপাক স. কে চাক্ষুষ দেখা সম্পর্কিত মাশায়েখগণের উক্তি বর্ণনা করার পর মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার শায়েখ বদরুদ্দীন হাসান ইবনে আহরাল থেকে উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন, আউলিয়া কেরাম জাগ্রত অবস্থায় নবী করীম স. কে দর্শন করেছেন, একথা মুতাওয়াতিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে প্রমাণিত। আর মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে এমন আস্থার সৃষ্টি হয়, যাতে দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ আর থাকে না। দর্শন সংঘটিত হওয়ার সময় আউলিয়া কেরামের অনুভূতি বিলুপ্ত হয় এবং তাঁদের মধ্যে এমন এক হালের আবির্ভাব হয়, যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। দর্শনকালে আউলিয়া কেরামের মর্তবা ও হালের তারতম্য হয়ে থাকে। কখনও তাঁরা স্বপ্নে দর্শন করেন। আবার কখনও চেতনা বিলুপ্তিতে নিমজ্জিত হয়ে দর্শন লাভ করে থাকেন, যাকে চাক্ষুষ দর্শন মনে করা হয়। আবার কখনও এমন হয় যে, নিজের খেয়াল ও ধারণার আকৃতিকে দেখে থাকেন এবং মনে করেন, নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থা যাকে তন্দ্রা বলা হয়, এ অবস্থায় রসুলেপাক স. এর দর্শন হয়ে থাকে। তবে হাঁ, জাগ্রতহৃদয়, যারা সর্বদাই মোরাকাবা ও তাওয়াজ্জোহের মধ্যে আছেন, প্রবৃত্তির মলিনতা থেকে যাঁরা পূর্ণপবিত্র, দুনিয়া ও দুনিয়াদার থেকে সম্পর্কছিন্নকারী, যাঁরা সর্বদাই রসুলেপাক স. এর প্রেমে মত্ত, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রতি নির্লিপ্ত, তাঁরা নবী করীম স. এর দীদার এমনভাবে পেয়ে থাকেন, যেমন পেয়ে থাকতেন সাইয়্যেদুনা গাউছুল আজম হজরত আব্দুল কাদের জিলানী র.। তিনি দিব্য জগতেই রসুলেপাক স. এর জিয়ারত করতেন। তাঁর এমন ক্ষমতা ছিলো, যেখানে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, সেখানে পরাক্রমপ্রভাবিত অবস্থায় কথা বলতে পারতেন। হজরত শায়েখ আবুল আব্বাস মরসী র. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এক মুহূর্তের জন্য আমার দর্শন থেকে সাইয়্যেদে আলম স. এর সৌন্দর্যরাজি লুপ্ত হলে আমি নিজেকে মুসলমান মনে করতে পারবো না। এই অবস্থা রসুলেপাক স. এর সুন্নত, আদব, সুলুক ও তরিকায় অবিরত মুশাহাদা ও হুজুরীর পর্যায়ভুক্ত। বিষয়টি রসুলে আকরম স. এর ওই এরশাদের পর্যায়ভুক্ত, যেখানে তিনি বলেছেন, আল এহসানু আন তা'বুদাল্লাহ্ কাআন্নাকা তারাহু– অর্থাৎ এহসান অর্থ এই যে, তুমি আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত এরকম অবস্থায় করবে, যেনো তুমি তাঁকে দেখছো। শায়েখ আবুল আব্বাস মরসীর উপরোক্ত বক্তব্যের পর বদরে এহলাল র. বলেছেন, মাশায়েখে কেরামের বক্তব্যগুলোকে বৈধ বলতে হলে এই

অর্থ গ্রহণ করতে হবে যে, গাফলত ও নিসইয়ানের পর্দা দ্বারা রসুলেপাক স. আচ্ছাদিত নন। অবিরত আমল, মোরাকাবা ও হুজুরীর দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর দর্শন হতে পারে। স্বীয় চোখের দৃষ্টি থেকে রসুলেপাক স. পর্দাচ্ছাদিত নন— এরকম অর্থ গ্রহণ করেননি। কেননা এটা হওয়া অসম্ভব। ওয়াল্লাহু আলাম।

বান্দা মিসকীন (শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, অবিরত মোরাকাবা, নবী করীম স. এর প্রতি মহব্বতের উচ্ছ্বাস ও উপলব্ধি, তাঁর আকৃতি দর্শনের নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা তালেব ও সালেকগণের একটি মর্তবা, যার মাধ্যমে সে লাভবান হয়ে থাকে। এই আলোচনাটি চলছে আকৃতি ও মেছালের দর্শনের উপর। যেমন স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর আকৃতি ও মেছাল দর্শন বৈধ। স্বপ্নে যেমন কোনো ব্যক্তির সামনে রসুলেপাক স. এর পবিত্র জাওহার (মূলসত্তা) আকৃতিবান হয়ে উদ্ভাসিত হতে পারে। এটা সম্ভব। কেননা শয়তান তাঁর আকৃতি ধারণ করতে অক্ষম। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এরকম অবস্থা জাগরণকালেও সম্ভব। যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে, আর জাগ্রত ব্যক্তি খোলা চোখে দেখে। দেখার কাজটি উভয়ই করতে পারে। বাহজাতুল আসরার কিতাবের বর্ণনা দ্বারা এটাই পরিষ্কার হয়েছে।

এক হাদীছে বর্ণনা এসেছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আমি নবী মুসাকে কয়েক হাজার বনী ইসরাইলের সঙ্গে একসাথে এহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়তে পড়তে হজ আদায় করতে দেখেছি। এই অবস্থাটিকে স্বপ্ন আখ্যা দেয়া বাস্ত বতার পরিপন্থী। মানবীয় আকৃতিতে ফেরেশতাদের আবির্ভাব সূক্ষ্ম জগতের ব্যাপার। এই প্রেক্ষিতে দিব্যচোখে দর্শন দ্বারা এটা জরুরী হয় না যে, নবী করীম স. রওজা শরীফ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আবার এ দর্শন দ্বারা দর্শনকারীকে পরিভাষাগত সাহাবী আখ্যা দেয়াও যাবে না। তবে হাঁ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁকে অবশ্যই সাহাবীর হুকুমের অন্তর্ভূত করা যাবে। জিকিরের প্রাবল্যের কারণে অনুভূতির অন্তর্ধানের ফলে যদি দর্শন ঘটে এবং যদি নিদ্রা বা স্বপ্নকে সাব্যস্ত নাও করা হয়, তবুও এতে বাধার কোনো কারণ নেই। কেননা মস্তিষ্কে আর্দ্রতার প্রাবল্যের ফলে অনুভূতির যে নির্লিপ্ততা ঘটে তাতেই নিদ্রার সৃষ্টি। আর জাগ্রত অবস্থায় অনুভূতির অন্তর্ধান জিকির-শুহুদের প্রাবল্যের কারণে হয়ে থাকে। আর এ অন্ত র্ধানটি জাগ্রত অবস্থায় হয়ে থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় নয়। এই আলোচনার সারকথা হচ্ছে, তিরোধানের পর রসুলেপাক স. এর দর্শন লাভ করলে সে দর্শন হবে মেছালী বা উদাহরণিক দর্শন। স্বপ্নের মাধ্যমে যেমন দর্শন হয়ে থাকে, তেমনি জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে। আর মদীনা শরীফের রওজায় তাঁর যে পবিত্র সত্তা

বিদ্যমান, তাই প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব। সাধারণ ব্যক্তিরা স্বপ্নে পেয়ে থাকেন, আর বিশেষ ব্যক্তিরা জাগ্রত অবস্থায় লাভ করে ধন্য হন। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার তাঁর নিজস্ব মত এরকম ব্যক্ত করেছেন যে, ওলীগণের কারামত যারা বিশ্বাস করে, তাদের একথা বিশ্বাস করা স্বাভাবিক। আউলিয়া কেরামের শান হচ্ছে, যমীন ও আসমানের সমস্ত বস্তুই তাঁদের কাছে উন্মোচিত হতে পারে– এতে কোনো সন্দেহ নেই। রসুলে পাক স. এর দীদারও এই পর্যায়ের। ইমাম গায্যালী র. বলেছেন, সাধারণের স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় বিশেষ ব্যক্তিগণ জাগ্রত অবস্থায় দেখে থাকেন। সাধারণজন যা কষ্টপ্রয়াসের দ্বারা হাসিল করে বিশেষ ব্যক্তিরা তা আল্লাহ্ প্রদত্ত দান হিসেবে পেয়ে থাকেন। ওয়াল্লাহু ইয়াকুলুল হক ওয়া ইয়াহ্দিস্সাবীল (আল্লাহ সত্য বলেন এবং তিনিই রাস্তা দেখান)।

সতর্কতাঃ স্বপ্নে রসুলেপাক স. এর দীদার লাভে ধন্য হওয়াটা যদিও সুসাব্যস্ত ও প্রমাণিত, তথাপি উলামা কেরাম বলেন, শরীয়তের বিধান সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি কেউ স্বপ্নের মাধ্যমে কিছু হাসিল করে, তবে তার উপর আমল করা যাবে না। তবে এটা এই পরিপ্রেক্ষিতে নয় যে, উক্ত রুইয়াত বা দর্শনের মধ্যে কোনোরকম সন্দেহ রয়েছে। বরং তার কারণ, নিদ্রাবিভোরতায় আচ্ছন্ন হলে ধারণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। এসম্পর্কে উলামা কেরামের মত এটাই। আহকাম বা বিধান কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, শরীয়তের বিধানের পরিপন্থী কোনো হুকুম বা বিধান লাভ করা। এরকম কিছু হলে তার উপর কিছুতেই আমল করা যাবে না। বিধান সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়া যদি কিছু হাসিল হয়, তা মান্য করা ও আমল করার ব্যাপারে কারও মতবিরোধ নেই। কেননা, এরকম দেখা যায় যে, অনেক হাদীছবেত্তা বর্ণিত হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন স্বয়ং নবী করীম স.। এরকমও দেখা গেছে যে, হাদীছবেত্তাগণ হাদীছের ব্যাপারে রসুলেপাক স. এর নিকট নিবেদন করেছেন, এই হাদীছ আপনার কাছ থেকে এসেছে কিনা? জওয়াবে তিনি হাঁ বা না বলেছেন। জাগ্রত অবস্থায় দর্শন লাভের দ্বারাও কোনো কোনো মাশায়েখ এলেমের নিঃসংশয়তা হাসিল করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

নবী করীম স. এর নামে নাম রাখা

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, তাঁর পবিত্র নামে নাম রাখা বরকতময়, উপকারী, দুনিয়া আখেরাতের হেফাজতের ওসীলা হয়ে থাকে। এমর্মে সাইয়্যেদুনা হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম স. এরশাদ

করেছেন, আল্লাহ্পাকের দরবারে দুই ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান করানো হবে আর আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর হুকুম দিবেন। এতে বিস্মিত হয়ে ওই দুই ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার কাছে নিবেদন করবে, হে আল্লাহ্! কোন জিনিস আমাদেরকে জান্নাতের অধিকারী ও উপযোগী বানালো? তোমার রহমত দ্বারা জান্নাতে যাবো এ ধরনের আশা করা ছাড়া আমরা তো আর কোনো নেক আমল করিনি। তাদের কথা শুনে রব্বুল ইজ্জত বলবেন, যাও তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। কেননা আমি স্বয়ং জাতের কসম দ্বারা আমার উপর অবশ্যকর্তব্য করে নিয়েছিলাম যে, আমি ব্যক্তিকে কক্ষণও জাহান্নামে পাঠাবো না, যার নাম হবে আহমদ বা মোহাম্মদ। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্তায়ালা রসুলেপাক স. কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আমার মর্যাদা ও পরাক্রমের কসম! আমি এমন ব্যক্তিকে আযাব দেবো না যার নাম হবে আপনার নামে।

সাইয়্যেদুনা হজরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, পৃথিবীতে যে কোনো স্থানে মানুষকে খানা খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে দস্তরখান বিছানো হয়, আর সেখানে যদি আহমদ বা মোহাম্মদ নামের কোনো ব্যক্তি হাজির হয়, তাহলে যে ঘরে দস্তরখানা বিছানো হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা সে ঘরকে দৈনিক দু'বার পবিত্র করে দেন। হাদীছটি আবু মনসুর দায়লামী বর্ণনা করেছেন। এরকমও বর্ণিত আছে, এমন কোনো ঘর নেই, যেখানে মোহাম্মদ নামের কোনো ব্যক্তি রয়েছে অথচ আল্লাহ্তায়ালা সেখানে বরকত প্রদান করেননি।

এক হাদীছে আছে, কোনো কওমের পরামর্শ বিনিময় সভায় মোহাম্মদ নামের কেউ উপস্থিত থাকলে নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা সেখানে বরকত দান করবেন। অপর এক হাদীছে আছে, যার নাম মোহাম্মদ, রসুলেপাক স. তার জন্য শাফায়াত করবেন এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। এই কিতাবের রচয়িতা শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী একবার স্বপ্নে দেখলেন, তিনি গাউছুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী র. এর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। উপস্থিত জনতা বলছেন, মোহাম্মদ আবদুল হক আপনার কাছে সালাম নিবেদন করছেন। একথা শুনে গাউছুল আজম র. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে মুআনাকা করলেন। তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন তোমার উপর দোযখের আগুন হারাম হয়ে গিয়েছে। বাহ্যতঃ দেখা যায়, এই শুভসংবাদ লাভের কারণ নবী করীম স. এর নামে নাম রাখা। এ ব্যাপারে উলামা কেরামের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম নবী করীম স. এর পবিত্র নাম ও পবিত্র উপাধি সহযোগে নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। যে কোনো একটির মাধ্যমে নাম রাখা জায়েয রেখেছেন অর্থাৎ হয় মোহাম্মদ নাম রাখা যাবে, না হয় আবুল কাসেম। দু'টি একত্রিত করে মোহাম্মদ আবুল কাসেম, এরকম নাম রাখা যাবে না। এই মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

ইমাম নববী বলেন, নবী করীম স. এর নাম ও কুনিয়াত একত্র করে নাম রাখার ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী র. এর মত হচ্ছে, সাধারণত নিষিদ্ধ। ইমাম মালেক র. এর মত, বৈধ। আর তৃতীয় মতটি হচ্ছে, আবুল কাসেম নাম রাখা ওই ব্যক্তির জন্য জায়েয, যার নাম মোহাম্মদ নয়। যে হজরতগণ সাধারণতঃ জায়েযের প্রবক্তা, তারা নিষেধারোপকারী হাদীছগুলোকে নবী করীম স. এর পৃথিবীতে বসবাসের সময়ের জন্য নির্দিষ্ট মনে করে থাকেন। আর এই মতটিই সঠিকতার অধিক নিকটবর্তী।

মহানবী স. এর দরবারে উচ্চ আওয়াজের নিষিদ্ধতা

নবী করীম স. এর বিশেষত্বসমূহের মধ্যে অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে, তাঁর হাদীছ পাঠকালে গোসল করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা মোস্তাহাব। রসুলে করীম স. এর হাদীছ শরীফ পাঠের সময় আওয়াজ সংযত করা উচিত। যেমন তাঁর জীবদ্দশায় তিনি যখন কথা বলতেন, তখন অন্যান্যদের আওয়াজকে নীচু করা হতো। এমর্মে আল্লাহ্‌তায়ালার এরশাদ হচ্ছে, 'হে ইমানদারগণ! নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজকে উচ্চ করো না। হাদীছ শরীফ তো নবী করীম স. এরই কালাম, যা বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের কাছে পেশ করা হয়েছে। এই হাদীছের সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা তাঁর আপন যবান মোবারক থেকে নিঃসৃত শব্দের মতই। আর হাদীছ পাঠ করার সময় কোনো উঁচু জায়গায় রেখে পাঠ করা অপরিহার্য।

হজরত মুতরিক র. থেকে বর্ণিত আছে, কেউ ইমাম মালেক র. এর সাক্ষাৎ কামনা করলে তিনি প্রথমে বাঁদীকে পাঠিয়ে দিয়ে জেনে নিতেন, তারা কি কোনো হাদীছ শুনতে এসেছে? নাকি শরীয়তের কোনো মাসআলা জানার জন্য এসেছে? লোকেরা যদি মাসআলা জানার জন্য এসেছে বলতো, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতেন এবং তাদেরকে মাসআলা মাসায়েলের তালিম দিতেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি ভিতর থেকেই মাসআলার জবাব দিতেন। আর যদি লোকেরা বলতো, তারা হাদীছ শরীফ শোনার জন্য এসেছে, তখন তিনি গোসলখানায় যেতেন এবং গোসল করে শাদা পোশাক পরতেন, পাগড়ি বাঁধতেন, চাদর গায়ে দিতেন, খোশবু লাগাতেন। কুরসী প্রস্তুত করা হতো। এরপর তিনি বাইরে এসে কুরসীতে উপবেশন করতেন। আউদ ও আম্বরের আগরবাতি জ্বালানো হতো। এরপর অত্যন্ত বিনয় ও তাযীমের সাথে তিনি হাদীছ শরীফ বর্ণনা করতেন। হাদীছের পাঠদান ছাড়া অন্য কোনো সময় তিনি কুরসীতে উপবেশন করতেন না। উলামা কেরাম বলেন, ইমাম মালেক র. এই পদ্ধতি হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রা. থেকে গ্রহণ করেছিলেন। হজরত কাতাদা ও ইমাম মালেক

র. প্রমুখ হজরতগণের এক জামাত বেঅজু অবস্থায় হাদীছ পাঠ করাকে মাকরুহ মনে করতেন। হজরত আ'মাশ রা. এর তো এরূপ অভ্যাস ছিলো যে, তিনি যখন বেঅজু হয়ে যেতেন, সঙ্গে সঙ্গে তায়াম্মুম করে নিতেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই, রসুলে আকরম স. এর আলোচনা, তাঁর হাদীছ শরীফ পঠন পাঠন, তাঁর পবিত্র নামের ও পূতঃ জীবনচরিতের আলোচনা করা ও শোনার সময় ওই রকমই তাযীম সম্মান করা জরুরী, যেরকম তাঁর ইহকালীন জীবনে তাঁর উপস্থিতিতে করা জরুরী ছিলো। হাদীছ শরীফ পাঠকালে কোনো ব্যক্তির আগমনে তার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নয়। কেননা এতে রসুলেপাক স. এর চাইতে অন্যের সম্মানকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং অন্যের প্রতি মনোনিবেশ করার ফলে হাদীছ শরীফের মাধ্যমে নবী করীম স. এর ফয়েজ প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে কোনো ফাসেক ফাজের ও বেদাতীর সম্মানে দণ্ডায়মান হওয়া কক্ষণো সমীচীন নয়। সলফে সালেহীনের তো এরকম নীতি ছিলো যে, নবী করীম স. এর হাদীছের সম্মানার্থে হাদীছ অধ্যয়নের ধারাকে তাঁরা ছিন্ন করতেন না। নড়াচড়াও করতেন না, দেহের উপর সাংঘাতিক কোনো বিপদ ও ক্ষতি নেমে এলেও। কথিত আছে, একবার হাদীছ শরীফ অধ্যয়নকালে ইমাম মালেক র. এর শরীরে একটি বিচ্ছু এসে সতেরোটি দংশন করেছিলো। তবুও তিনি পার্শ্ব পরিবর্তন করেননি। তিনি কায়মনোবাক্যে অধ্যয়নেই রত ছিলেন। হাদীছতো নবী করীম স. এর। তাই তাঁর সম্মানার্থে সেই হাদীছের পাঠ বন্ধ করেননি। এই ঘটনাটি ইবনুল হাজ্জ আলমাদ খাল নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, এক মুহূর্তের দর্শন পেলে অথবা মোবারক মজলিশে উপবেশন করলে তাঁর জন্য সাহাবিয়াত সাব্যস্ত হবে। মুহূর্তের সাহচর্যে বা দর্শনে সাহাবীর গৌরব লাভ রসুলেপাক স. এর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভূত। সাধারণতঃ দীর্ঘকাল কারও সাহচর্যে অবস্থান করাকে সোহবত বা মোসাহেবাত ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে এক মুহূর্ত বা একটি দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট। বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় মত অনুসারে এরকম ব্যক্তিকেই সাহাবী বলা হয়।

উলামা কেরাম এধরনের বৈশিষ্ট্যের অনেক আলোচনা করেছেন, যা নবী করীম স. সহ অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের মধ্যে ছিলো। যেমন নিদ্রায় অজুভঙ্গ না হওয়া, শয়তান নবীর আকৃতি ধারণ করতে অক্ষম হওয়া, হাই না আসা ইত্যাদি। তবে নবী করীম স. এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, কেউ একবার তাঁর সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এবং সাহচর্যে এলে সেই ব্যক্তির নূরানিয়াত ও কামালিয়াত হাসেল হয়ে যেতো। ওই গুণাবলী তার মধ্যে প্রকাশিত হতো। যেমন বলা হয়ে থাকে,

নবী করীম স. এর একটি দৃষ্টিপাতের প্রভাবে মূর্খ ও নির্বোধ জ্ঞানী হয়ে যেতো এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলা শুরু করতো। কুওয়াতুল কুলুব নামক কিতাবে আছে, হজরত সাইয়্যেদে আলম স. এর জামাল মোবারকের উপর একবার দৃষ্টি পড়লে এমন কাশফ জারী হতো, যা বহুবার মোরাকাবা করেও হাসিল হয় না। এটা রসুলেপাক স. এর একটি স্বতন্ত্র মোজেজা, যা কেবল তাঁরই বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো নবী এর অংশ পাননি।

মহানবী স. এর আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁর সাহাবীগণ সকলেই আদেল বা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁদের ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসা কিতাবুল্লাহ্ ও হাদীছ শরীফে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের আদালতের ব্যাপারে কারও কোনো কটুক্তি নেই। হাদীছের সনদে রাবী বা বর্ণনাকারীর সংখ্যা একজনে এসে দাঁড়ালে ওই মোহাদ্দেছকে মুনফারেদ বা গরীব বলা হয়। কিন্তু সাহাবীর ক্ষেত্রে এরকম হলে উক্ত হাদীছকে মুনফারেদ বা গরীব বলা হয় না। সকল সাহাবী আদেল বা ন্যায়নিষ্ঠ– এ ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের ঐকমত্য রয়েছে, যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ফেতনা ও রাজনৈতিক বিশৃংখলার শিকার হয়েছিলেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামআত তাঁদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণপূর্বক বলে থাকেন, তাঁদের সময় সৃষ্ট রাজনৈতিক বিশৃংখলাগুলো এজতেহাদী ভুল হিসেবে সংঘটিত হয়েছিলো। তাঁদের ফযীলত ও কামালত সম্পর্কে সন্দেহের সূত্রপাত হতেই পারে না। কেননা তাঁরা রসুলেপাক স. এর আদেশ নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। চূড়ান্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁরা আদেশ বাস্তবায়ন করতে যত্নবান হতেন। তাঁরা সর্বদাই রসুলেপাক স. এর সংসর্গে কালাতিপাত করতেন। বিভিন্ন যুদ্ধে নবীকরীম স. এর সঙ্গী হতেন। বিভিন্ন এলাকা, রাজ্য ও অঞ্চল বিজয়ে অংশগ্রহণ করতেন। হেদায়েতের কার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। নামাজ, রোজা ও যাকাত ইত্যাদি ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁদের মতো বীরত্ব, সাহসিকতা, দানশীলতা ও প্রশংসনীয় গুণাবলী পূর্ববতী কোনো উম্মতের মধ্যে পাওয়া যায় না। জমহুর উলামার মাযহাব এই যে, সাহাবা কেরাম রা. সকলেই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মিল্লাতের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। তাঁদের পরবর্তীরা তাঁদের মতো মাকাম ও মর্তবা লাভ করতে পারে না। কোনো কোনো আলেম, যেমন প্রখ্যাত মোহাদ্দেছ হজরত ইবনে আব্দুল্লাহ্ ও তাঁর মতো আরও অনেকে এরকম মন্তব্য পেশ করেছেন যে, একালে এ সমাজে এমন কে হতে পারেন, যিনি সাহাবীগণের পর তাঁদের মতো? এলেম ও আমলের ফযীলতের দিক দিয়ে তাঁদের মতো মর্যাদাবান কে? কোনো সাহাবী কখনও কবীরা গোনাহ্

করে ফেললেও তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। কবীরা গোনাহ্র জন্য তাঁদের উপর শরীয়তের হদও কায়েম করা হয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালা তাঁদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। ইবনে আব্দুল্লাহ্ ওই সকল হাদীছের মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করেছেন, যা আখেরী উম্মতের ফযীলত বা মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। কোনো কোনো মোহাদ্দেছ অবশ্য বলে থাকেন, সাহাবা কেরামের মর্যাদা প্রযোজ্য হবে তাঁদের বেলায়, যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে নবী করীম স. এর সংসর্গে ছিলেন এবং বহুবিধ ফয়েজ লাভ করে উপকৃত হয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে প্রথম মতটিই সর্বাধিক পছন্দনীয়। সবচাইতে সত্য ও বড় কথা, তাঁরা নবী করীম স. এর দর্শন লাভ করেছিলেন। প্রত্যক্ষ ইমান দ্বারা ধন্য হয়েছিলেন। এই মর্যাদা কেবল তাঁদের জন্যই নির্ধারিত। অন্য কেউ এরকম ফযীলতের অধিকারী হতে পারেন না। আখেরী উম্মেতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছের প্রেক্ষিত অবশ্য ভিন্ন। সাহাবা কেরামের ইমান ছিলো ইমান বিল গয়িব। যা 'ইউমিনুনা বিল গয়িব' আয়াতে কারীমার তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফাস্সিরগণ বর্ণনা করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, মুসল্লী নামাজ আদায়কালে তাশাহ্হুদের মধ্যে অথবা নামাজের বাইরে দরূদ ও সালাম পেশ করার সময় নবী করীম স. কে 'আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু' বলে। তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে এভাবে সম্বোধন করা হয় না। সম্বোধন দ্বারা রসুলেপাক স. ছাড়া অন্য কারও উপর সালাম প্রেরণ করা যদি উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে তা হবে হজরত ইবনে মাসউদ রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। ওই হাদীছে তিনি বলেছেন, আমরা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে নামাজ আদায়কালে বলতাম, আস্লালামু আলাল্লাহ্ আস্সালামু আলা জিব্রাইল, আসসালামু আলা মিকাইল। আসসালামু আলা অমুক ইত্যাদি। রসুলেপাক স. নামাজ থেকে ফারেগ হয়ে আমাদের দিকে ফিরে বললেন 'তোমরা আস্সালামু আলাল্লাহ্ বোলো না। কেননা আল্লাহ্তায়ালাতো নিজেই সালাম। অর্থাৎ যাবতীয় ত্রুটি ও ভীতি থেকে তিনি তো সালেম বা নিরাপদ এবং সুরক্ষিত। বান্দাকে ত্রুটি ও ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেন তিনিই। কাজেই ভয় ও মুখাপেক্ষিতার ধারণা সৃষ্টি করে এমন সালাম তাঁর উপর পেশ করা অর্থহীন। এখন থেকে নামাজের বৈঠকে বসলে পাঠ করবে 'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্সলাওয়াতু ওয়াত্তইয়িবাত। আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সলিহীন।' বান্দা এই তাশাহহুদ শরীফ পাঠ করলে আল্লাহ্তায়ালা সালামতী দান করবেন। আল হাদীছ।

সুতারং দেখা যায় বিশেষত্বের সাথে রসুলেপাক স. কে সালাম প্রদান করাই প্রকৃত কথা। অন্যান্যদেরকে সাধারণ পর্যায়ে রাখা হয়েছে। আত্তাহিয়্যাতোর মধ্যে আস্সালামু আলাইকা বলে নবী করীম স. কে সম্বোধন করা হয়েছে। অথচ দৃশ্যতঃ তিনি অনুপস্থিত। এটাও তাঁর একটা বিশেষত্ব। এর কারণও রয়েছে। উলামা কেরাম বলেন, মেরাজ রজনীতে আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যত তাঁর হাবীব স. কে এভাবেই সম্বোধন করেছিলেন। এরপর আল্লাহ্তায়ালার উক্ত কালামটিকে হুবহু রেখে দেয়া হয়েছে। বোখারীর শরাহ কেরমানীতে বলা হয়েছে নবী করীম স. এর অন্তরাল গ্রহণের পর সাহাবাগণ আসসালামু আলান্নাবিয়্যি বলতেন। আসসালামু আলাইকা বলতেন না।

কোনো কোনো আরেফ বলেছেন, আত্তাহিয়্যাতোর মধ্যে রসুলেপাক স. কে সম্বোধন করা হয় তাঁর রূহ মোবারকের মুশাহাদার (দর্শনের) পরিপ্রেক্ষিতে। সমস্ত বিদ্যমান বস্তুর মধ্যে বিশেষ করে নামাজী ব্যক্তির আত্মার মধ্যে তাঁর পবিত্র রূহের সূক্ষ্মসত্তাসমূহ উদ্ভাসিত হয়। নামাজের সময় রসুলে আকরম স. এর শুহুদ (আত্মিক দর্শন) এবং ওজুদের উদ্ভাসন থেকে বেখবর হওয়া উচিত নয়। রসুলেপাক স. এর রূহানী ফয়ুজাত কামনা করা উচিত।

রসুলেপাক স. এর আরো একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি কাউকে আহ্বান করলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া এবং তথায় উপস্থিত হয়ে যাওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। নামাজরত থাকলেও নামাজ ছেড়ে হাজির হতে হবে। হজরত সাঈদ ইবনে মুআল্লা রা. এর হাদীছ– তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি একদা নামাজে রত ছিলাম। এমতাবস্থায় রসুলেপাক স. আমাকে ডাকলেন। আমি উত্তর করিনি। নামাজান্তে রসুলেপাক স. এর দরবারে যেয়ে নিবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি নামাজে ছিলাম, জবাব দিতে পারিনি। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা কি এরশাদ করেননি.

'তোমরা আল্লাহ্ ও রসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তাঁরা তোমাদিগকে উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে আহ্বান করবেন।' কাজেই রসুলেপাক স. এর ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব এবং এরকম না করলে গোনাহ্গার হতে হবে। প্রশ্ন জাগে নামাজরত অবস্থায় নবী করীম স. এর ডাকে সাড়া দিয়ে সেখানে উপস্থিত হলে নামাজ বাতিল হবে কিনা? এ সম্পর্কে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার বলেন, শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেমসহ আরও কতিপয় আলেম এ সম্পর্কে মত পোষণ করেন, এতে নামাজ নষ্ট হবে না। কিন্তু কোনো কোনো আলেমের মতে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য উক্ত হাদীছের মাধ্যমে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বুঝা যায় না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, তাঁর উপর মিথ্যা অপবাদ আনয়ন করা অন্যের উপর অপবাদ আরোপ করার চেয়ে জঘন্যতর। রসুলে আকরম স. এর উপর মিথ্যা অপবাদ উপস্থাপনকারীর বর্ণনা কক্ষণো গ্রহণ করা হয় না। মিথ্যারোপ করা থেকে সে ব্যক্তি যদি তওবা করে, তবুও তার বিবরণ গ্রহণ করা যাবে না বলে একদল হাদীছবেত্তা মত পোষণ করেছেন। হজরত সাঈদ ইবনে জুবায়র রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর নামে মিথ্যা রটনা করেছিলো। রসুলেপাক স. হজরত আলী রা. ও হজরত যোবায়ের রা. কে নির্দেশ দিলেন, যাও, ওকে পেলে হত্যা করো। শায়েখ মোহাম্মদ জুওয়ায়নী যিনি ইমামুল হারামাইনের পিতা ছিলেন– তাঁর মত হচ্ছে, রসুলে আকরম স. এর উপর মিথ্যা আরোপকারী কাফের। কিন্তু আয়েম্মায়ে কেরাম তাঁর এই মতের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেননি। তবে এ ব্যাপারে সঠিক কথা এই যে, রসুলেপাক স. এর উপর মিথ্যা আরোপ করা জঘন্য অপরাধ এবং কবীরা গোনাহ্। তবে এতে কাফের হবে না, যদি সে এ কাজকে হালাল হিসেবে মনে না করে। এরপর যদি ওই অপরাধী বিশুদ্ধ তওবা করে এবং তার তওবার প্রতিক্রিয়া বাস্তব জীবনে পরিলক্ষিত হয়, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, তিনি সগীরা, কবীরা, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত সর্বপ্রকার গোনাহ্ থেকে পবিত্র ছিলেন। এটাই পছন্দনীয় মাযহাব। তিনি ছাড়া অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের পবিত্রতার ব্যাপারেও এই একই মত। এর বিস্তারিত আলোচনা এলমে কালামের কিতাবাদিতে আছে। তাঁর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, পাগল, মাতাল ও দীর্ঘস্থায়ী বেহুঁশীর সম্পর্ক তাঁর শানে আরোপ করা যাবে না। কেনোনা এগুলোও দোষক্রটির অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের শানেও এগুলো আরোপ করা যাবে না। আল্লামা সুবকী র. বলেছেন, আম্বিয়া কেরামের বেহুঁশী অন্যান্যদের বেহুঁশী থেকে ভিন্ন। তাঁদের ব্যথা যন্ত্রণার প্রাবল্য তাঁদের জাহেরী অনুভূতির উপর প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অন্তর থাকে প্রভাবহীন। এ মর্মেই হাদীছ শরীফে উক্ত হয়েছে, আমার নেত্রদ্বয় নিদ্রিত হয়। হৃদয় নয়। হৃদয়কে নিদ্রা থেকে হেফাজত রাখা হয়েছে, যা বেহুঁশীর তুলনায় অনেক শক্তিশালী। সুতরাং বেহুঁশী দ্বারা আক্রান্ত না হওয়াটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আল্লামা সুবকী র. আরও বলেন, আম্বিয়া কেরামের জন্য দৃষ্টিহীনতা বৈধ নয়। কেনোনা এটাও একটি ক্রুটি। পৃথিবীতে এমন কোনো নবীই আগমন করেননি, যিনি অন্ধ ছিলেন। তবে হজরত শুআইব আ. এর অন্ধত্ব সম্পর্কে যা শোনা যায়, তা কিন্তু প্রমাণিত নয়। আর হজরত ইয়াকুব আ. এর অন্ধত্বের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তিনি তো মূলত অন্ধ ছিলেন না। পুত্রশোকে রোদন করতে করতে পবিত্র চোখের উপর ছানি পড়ে গিয়েছিলো, যা তাঁর দৃষ্টিকে সাময়িক আচ্ছাদিত করেছিলো। 'তাঁর চোখ দুটি চিন্তার কারণে শাদা হয়ে গিয়েছিলো'– এই আয়াতে কারীমার তাফসীর

প্রসঙ্গে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. বলেন, মাতম ও বিলাপের প্রাবল্যের সময় তাঁর চোখ দিয়ে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হতো। অত্যধিক পানি প্রবাহের কারণে মনে হতো যেনো চক্ষুদ্বয় শুভ্র হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওই শুভ্রতা পানির কারণেই পরিলক্ষিত হতো। এটি উপরোক্ত মতের বিশুদ্ধতার দলীল। কেনোনা, ক্রন্দনের প্রাবল্যের মধ্যে চিন্তা এসে অন্ধত্বকে অধিক ক্রিয়াশীল করে তোলে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. বলেন, তিনি সার্বিকভাবে দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়েছিলেন কিনা, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। পরবর্তী ঘটনা এরকম, আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইউসুফ আ. এর পবিত্র জামা তাঁর মস্তকে স্থাপনের পর তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছিলো। কেউ কেউ বলেন, তিনি অন্ধ হয়েছিলেন একথা ঠিক নয়। অত্যধিক ক্রন্দন ও দুশ্চিন্তার কারণে দৃষ্টিশক্তিতে দুর্বলতা এসেছিলো এবং এই দুর্বলতাকেই তিনি দৃষ্টিহীনতা মনে করতেন। এরপর যখন হজরত ইউসুফ আ. এর জামা তাঁর চেহারায় স্থাপন করা হয়েছিলো, তখন দৃষ্টিশক্তিতে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছিলো। আল্লামা সুবকী র. আম্বিয়া কেরামের মধ্যে অন্ধত্ব জায়েয না হওয়ার কারণ এই বলেছেন যে, এটা দোষ এবং ত্রুটি। আম্বিয়া কেরামের এমন রোগে আক্রান্ত হওয়া যা দোষ ও ত্রুটির কারণ, তার দ্বারা তাঁদের নবুওয়াতও ত্রুটিযুক্ত মনে হওয়া সম্ভব। যেমন হজরত আইয়্যুব আ. এর উপর পরীক্ষাস্বরূপ অসুস্থতা আপতিত হয়েছিলো। এ জাতীয় অন্যান্য অসুখ, যেমন কুষ্ঠরোগ, শ্বেতী, অন্ধত্ব ইত্যাদির সঙ্গে কোনো নবীর সম্পর্ক রাখা জায়েয নয়। এগুলো নবুওয়াতের শানের পরিপন্থী। এগুলো ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে অথচ আম্বিয়া কেরাম এ সমূহ থেকে পবিত্র। হজরত শুআয়েব আ. অন্ধ হয়েছিলেন বলে কিস্সা আছে। কিন্তু ওই কিস্সা দলীল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। কাজেই এজাতীয় কথা দ্বারা তাঁর শানের প্রতি কেবল বিদ্রূপ এবং ধৃষ্টতাই প্রদর্শন করা হয়। অবশ্য হজরত ইয়াকুব আ. এর দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার ঘটনা সঠিক। কেনোনা, আল্লাহ্তায়ালা এ মর্মে নিজেই ঘোষণা করেছেন, 'সুতরাং তাঁর দৃষ্টি ফিরে এলো।' হজরত মুকাতিল বারী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইয়াকুব আ. ছ'মাস দেখতে পাননি। পরবর্তীতে হজরত ইউসুফ আ. এর জামা মোবারকের ওসীলায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। একটি কথা প্রচলিত আছে, কোনো নবীই বোবা ছিলেন না, তবে হয়তো কেউ সাময়িক অন্ধ ছিলেন।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, তাঁর নিন্দাকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব। এতে সকল ইমামের ঐকমত্য রয়েছে। মতানৈক্যের দিকগুলো হচ্ছে, হত্যা কি হদ হিসেবে করা হবে? সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে? নাকি তওবা করার সুযোগ দেয়া হবে? সে কি মুরতাদ? এ সমস্ত ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু কতল করার ব্যাপারে মতানৈক্য নেই।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব এখতিয়ার রয়েছে। তিনি যা নির্ধারণ করতে চাইতেন, সেটাই বিধানে রূপলাভ করতো। এ ব্যাপারে দু'টি বক্তব্য রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, রসুলেপাক স. এর কাছে আহকাম সোপর্দ করা হতো। তিনি যা ভালো মনে করতেন, সে সম্পর্কেই বিধান আরোপ করতেন। দ্বিতীয় বক্তব্যটি হচ্ছে, আহকামের ব্যাপারে আলাদা ওহী নাযিল হতো। সুতরাং দেখা যায়, হজরত খুযায়মা ইবনে ছাবেত রা. এর ব্যাপারে হুকুম দেয়া হলো, তাঁর একার সাক্ষ্যই দুজনের সাক্ষ্যের সমতুল্য হবে।

ঘটনাটি হচ্ছে, একদা রসুলেপাক স. এক বেদুইনের নিকট থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করেছিলেন। পরে ওই বেদুইন একথা অস্বীকার করে বসলো। বললো, আপনি সাক্ষী উপস্থিত করুন। মুসলমানেরা বেদুইনকে বললো, আল্লাহ্‌র নবী সত্য বলেছেন। বেদুইন কারও কথা মানলো না। এমতাবস্থায় হজরত খুযায়মা রা. উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ঘোড়া বিক্রি করেছো। রসুলে আকরম স. বললেন, তুমি কেমন করে সাক্ষ্য দিচ্ছো, আমিতো তোমাকে সাক্ষী নিযুক্ত করিনি। হজরত খুযায়মা রা. বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্‌! আমরা আপনার সকল কথা বিশ্বাস করি, আর এই বেদুইনের ব্যাপারে আপনাকে অবিশ্বাস করবো? এই ঘটনার পরপ্রেক্ষিতে রসুলে করীম স. হজরত খুযায়মার একার সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্যের সমতুল্য সাব্যস্ত করলেন। আর এহেন ফযীলত লাভের ব্যাপারে তিনি হজরত খুযায়মাকে বিশিষ্ট করে দিলেন।

খাত্তাবী বলেন, এই হাদীছটিকে অনেকে অস্থানে ব্যবহার করে থাকে। আর বেদাতীদের একটি দলতো এই হাদীছের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে করে থাকে, কোনো একজন চেনা জানা লোককে সাক্ষী বানালেই চলবে। কথাটির তাৎপর্য এই যে, তাদের মতে, ওই ব্যক্তি চেনা জানা সেই সাক্ষীর ব্যাপারে কিছু দাবি করবে, আর তার দাবি গৃহীত হবে। অথচ হাদীছ শরীফের ওরুদের কারণ হচ্ছে, রসুলেপাক স.। বেদুইনটির এলেম মোতাবেক তার উপর বিধান প্রয়োগ করার জন্য এখানে নবী করীম স. হজরত খুযায়মার সাক্ষ্যকে নিজের কথার পক্ষে জোর প্রদানার্থে এবং প্রতিপক্ষের উপর প্রাবল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এনেছেন। তাই হজরত খুযায়মা রা. দুই সাক্ষীর সমমর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। হজরত উম্মে আতিয়া রা. যিনি মর্যাদাশীলা মহিলা সাহাবীগণের অন্যতমা ছিলেন, তাঁর ব্যাপারেও রসুলেপাক স. স্বতন্ত্র বিধান দিয়েছেন।

নবী করীম স. পুরুষগণের বায়াত সম্পাদনান্তে যখন মহিলাদের বায়াত গ্রহণ করছিলেন, তখন তাঁদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্‌র বাণী 'নারীরা যেনো ভালো কাজে আপনার নাফরমানী না করে' বলা হলো। নবী করীম স. বিভিন্ন ভালো কাজ বাস্তবায়ন

ও মন্দ কাজ পরিহার সম্পর্কে তাঁদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করলেন। তাঁদের একটি মন্দ কাজ ছিলো, বিলাপ করা। নবী করীম স. অঙ্গীকার আদায় করলেন, নারীরা কারও মৃত্যুতে যেনো বিলাপ না করে। তখন হজরত উম্মে আতিয়া রা. নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! অমুক জনপদের লোক জাহেলী যুগে বিলাপ করার ব্যাপারে আমার সহযোগী হতো। এখন এ কাজে তাদের অনুসরণ না করে যে আমি পারছি না। রসুলেপাক স. একথা শুনে হজরত উম্মে আতিয়া রা. কে উক্ত কবীলার খাতিরে বিলাপ করার ব্যাপারে অনুমতি দিলেন।

ইমাম নববী র. বলেন, উম্মে আতিয়া রা. কে বিলাপ করার অনুমতি প্রদানে প্রমাণিত হয় যে, তিনি স. যার ব্যাপারে যা চাইতেন, তা নির্ধারণ করে দেয়ার ক্ষমতা তিনি আল্লাহ্পাকের তরফ থেকেই পেয়েছিলেন। হজরত আসমা বিনতে উমায়স রা.কেও শোক পালন করার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন হজরত জা'ফর ইবনে আবী তালেব রা.। তিনি ইনতেকাল করলে, নবী করীম স. হজরত আসমা বিনতে উমায়স রা.কে বললেন, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মাতমী লেবাস পরিধান করো এবং শোক যাপন করো। এরপর তোমার যা অভিপ্রায়।

হজরত আবু বুরদা ইবনে নিয়ায রা. এর কোরবানীর ক্ষেত্রেও নবী করীম স. স্বাধীন হুকুম দিয়েছিলেন। বকরীর বয়স এক বৎসর পুরা না হওয়া পর্যন্ত কোরবানী করা বৈধ নয়। কিন্তু নবী করীম হজরত আবু বুরদা ইবনে নিয়ায রা. এর জন্য বৈধ করে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি হচ্ছে, তিনি স. একদিন বললেন, ঈদের নামাজের আগে কোরবানী করলে কোরবানী হবে না। একথা শুনে হজরত আবু বুরদা রা. বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমার একটিই বকরী ছিলো। ঈদের নামাজের আগেই আমি বকরিটি জবেহ্ করে ফেলেছি। আমি মনে করেছিলাম, আজকের দিনটাতো খানা পিনারই দিন। তাই তাড়াতাড়ি জবাই করে পরিবার পরিজন এবং প্রতিবেশীদেরকে নিয়ে আনন্দ করে খেয়েছি। এখন এক বৎসরের কম বয়সের একটি বকরীর বাচ্চা ছাড়াতো আমার আর কোরবানী দেয়ার মতো কিছু নেই। তবে বাচ্চাটি বেশ মোটা তাজা এবং দুম্বার মতই মাংসল। বাচ্চাটি দিয়ে কি কোরবানী হবে? রসুল স. এরশাদ করলেন, হাঁ, তোমার ক্ষেত্রে হবে।

এক রমণীর বিয়ের মহর সংক্রান্ত ব্যাপারেও রসুলেপাক স. স্বতন্ত্র নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। মহর আদায়ের পরিবর্তে পুরুষটি উক্ত মহিলাকে কোরআন মজীদ শিক্ষা প্রদান করবে– এরকম হুকুম দিয়েছিলেন। ঘটনাটি কোরআন মজীদে এভাবে উক্ত হয়েছে 'একজন রমণী রসুলেপাক স. এর খেদমতে নিবেদন করলো, আমি নিজেকে রসুল স. এর জন্য সম্প্রদান করছি। এভাবে কোনো মহিলা নিজেকে রসুল স. এর জন্য সম্প্রদান করলে তাঁকে গ্রহণ করা রসুলেপাক স. এর

জন্য জায়েয ছিলো। কিন্তু রসুলেপাক স. তাঁকে গ্রহণ করলেন না। পাশেই উপবিষ্ট এক দরিদ্র সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! রমণীটি যদি আপনার উপযোগী না হয়, তাহলে আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিন। তিনি স. বললেন, মহর আদায় করার মতো কী আছে তোমার? তিনি বললেন, পরনের লুঙ্গিখানা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। রসুল স. বললেন, তালাশ করে দেখো, কিছু জোগাড় করতে পারো কিনা। অন্ততঃপক্ষে একটি লোহার আঙটি হলেও চলবে। তিনি বললেন, কোরআন মজীদের অমুক অমুক সুরা আমার মুখস্থ আছে, আর কিছু নেই। রসুল স. বললেন, কোরআনের যে অংশটুকু তোমার মুখস্থ আছে, তার বিনিময়ে তুমি তাকে বিয়ে করো। তুমি তাকে সেই অংশটুকু শিক্ষা দিবে এবং সেটাকে মহর হিসেবে নির্ধারণ করে নিবে। তবে তুমি ছাড়া অন্য কারও জন্য এই বিধান গ্রহণযোগ্য হবে না। কোরআন কখনও কারও জন্য মহর হতে পারে না।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি অন্যতম দিক হচ্ছে, তাঁর গায়ে যখন জ্বর উঠতো, তখন দু'জন মানুষের জ্বর হতো, যাতে তিনি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করতে পারেন। একদা তিনি অসুস্থ হলে হজরত জিব্রাইল আ. সেবা শুশ্রূষা করা এবং অবস্থা জানার জন্য নবী করীম স. এর কাছে তিনবার উপস্থিত হয়েছিলেন। নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, তাঁর ইনতেকালের পর তাঁর জানাযা আদায় করা হয়েছিলো ইমাম ছাড়াই। মুসলমানেরা দলে দলে এসে জানাযা আদায় করেছিলেন। মৃত্যুর তিন দিন পর তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো, আর তাঁর কবর শরীফে ওই মখমলের চাদরখানা বিছিয়ে দেয়া হয়েছিলো, যা তাঁর দেহ মোবারকের নীচে বিছানো ছিলো। অথচ এ দুটি কাজ অন্য কারও জন্য বৈধ নয়।

এই ঘটনা সম্পর্কে অবশ্য ভিন্ন রকম বর্ণনাও রয়েছে। তা হচ্ছে, তাঁর কবর শরীফে যে মখমলের চাদর বিছানো হয়েছিলো তাঁর এক গোলাম, যার নাম ছিলো শকরবান, তিনি সাহাবীগণের অজান্তে সেটা বিছিয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, রসুলেপাক স. এর দেহ মোবারকের নীচে বিছানো এই চাদরটি পরে অন্য কারও দেহের নীচে যেনো বিছানো না হয়। নবী করীম স. এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর ইনতেকালের পর পৃথিবীতে অন্ধকার নেমেছিলো। এর বিস্তারিত বর্ণনা যথাস্থানে করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, মাটি তাঁর পবিত্র শরীরকে ভক্ষণ করতে পারেনি। অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের পবিত্র শরীরও মাটিতে মিশে যায়নি। যদিও এ বিশেষত্ব সকল নবীর মধ্যে ছিলো, তৎসত্ত্বেও এটাকে উলামায়ে কেরাম নবী করীম স. এর বিশেষত্বের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর কেবল আম্বিয়া কেরাম কেনো, নবী করীম স. এর উম্মতের আউলিয়া কেরামের বেলায়ও এরকম বর্ণনা রয়েছে।

যেমন শায়েখ আলী মুত্তাকী র. এর কবর বিশেষ কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খোঁড়া হয়েছিলো। কবর খোঁড়ার পর দেখা গেলো, কাফন সহকারে তাঁর পবিত্র লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। ঘটনাটি ছিলো এরকম, তাঁর এক নওজোয়ান এবং নেককার ভ্রাতুষ্পুত্র কামনা করলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে যেনো তাঁর চাচার কবরে দাফন করা হয়। আর মক্কা মুআযযমায় তখন এরকম ধারণা ছিলো যে, মৃতকে কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির কবরে দাফন করলে তাতে বরকত লাভ হয়। যমীন কর্তৃক নবী করীম স. এর পবিত্র শরীর ভক্ষিত না হওয়া হায়াতে তাইয়্যেবার বাহ্যিক নিদর্শন। আর এই হায়াত অর্থাৎ বরযখী জীবন নবী করীম স. এবং অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের জন্য বিশিষ্ট।

নবী করীম স. এর আরেকটি অন্যতম বিশেষত্ব এই ছিলো যে, তাঁর উত্তরাধিকার সম্পত্তি তাঁর জাগতিক হায়াত ও বিদ্যমানতার উপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত হতো না। তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তির মালিক তিনিই। কেউ কেউ বলেন, তাঁর সম্পত্তি তাঁর ইহকালীন জীবনের সমাপ্তির পর সদকা হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছিলো। যেমন হাদীছ শরীফে উক্ত হয়েছে, 'আমি যা রেখে যাবো তা সদকা হবে।' সে সমস্ত সদকা ওই সকল খাতে ব্যয়িত হবে, যে সকল খাতে তিনি নিজে ব্যয় করে থাকতেন। যেমন রসুলেপাক স. এর খরচের খাতগুলো ছিলো নিজের আহল ও আয়াল আওলাদ, ফকীর এবং সাধারণ মুসলমানের জন্য কল্যাণকর কাজ। তাঁর ইহকালীন জীবনে তিনি যেভাবে এসকল খাতে ব্যয় করতেন, তেমনি ইনতেকালের পর রেখে যাওয়া সম্পত্তিকে সেসকল খাতেই খরচ করতে হবে। তাঁর উত্তরাধিকার সম্পত্তির বেলায় অবশ্য তাঁর জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিলো যে, তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর পুরো সম্পত্তিকে কারও নামে ওসিয়ত করে যেতে পারতেন। অথচ অন্য কারো জন্য এক তৃতীয়াংশের অধিক কারো ব্যাপারে ওসিয়াত করা বৈধ নয়।।

এই বিধান অন্যান্য নবীর উত্তরাধিকার সম্পত্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁদের ইনতেকালের পর কোনো ওয়ারিছ হতো না। তবে আল্লাহ্‌র বাণী, 'হজরত সুলায়মান হজরত দাউদ এর ওয়ারিছ হয়েছিলেন' এবং 'হে আমার রব! তুমি আমার জন্য তোমার পক্ষ থেকে ওলী বানাও যে আমার ওয়ারিছ হতে পারে'— আয়াতদ্বয়ের দ্বারা ওয়ারিছি সাব্যস্ত হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জবাব হচ্ছে, উক্ত ওয়ারিছি দ্বারা জাগতিক ধনসম্পত্তি লাভের ওয়ারিছি বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে নবুওয়াত ও এলেমের ওয়ারিছিকে।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি অন্যতম দিক হচ্ছে, তিনি তাঁর রওজা শরীফে জীবিত আছেন। অন্যান্য নবীগণও তাই। রসুলেপাক স. শুধু জীবিত আছেন, তাই নয়। বরং আযান ও একামতের সাথে নামাজও আদায় করে যাচ্ছেন। ইবনে যাবালা এবং ইবনে নাজ্জার বর্ণনা করেন, আইয়্যামে হুররার সময়

মসজিদে নববীতে তিন দিন পর্যন্ত আযান হয়নি। আইয়ামে হুররা বলা হয় ইয়াযিদী বর্বতার সময়কে। তখন কুখ্যাত ইয়াযিদী বাহিনী মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা করে শতশত সাহাবীকে শহীদ করেছিলো। নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট করেছিলো। মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে গাধা ঘোড়া বেঁধেছিলো (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক)। তখন নরপিশাচ ইয়াযিদী বাহিনীর আতংকে মানুষ মদীনা মুনাওয়ারা ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছিলো। কেবল হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রা. মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বর্ণনা করেন, যোহরের ওয়াক্ত হলে আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নবী করীম স. এর রওজা শরীফের কাছে চলে গেলাম। সেখানে পরিষ্কার আযানের আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং সেখানেই যোহরের নামাজ আদায় করলাম। তারপর থেকে প্রত্যেক নামাজের সময়ই রওজা শরীফ থেকে আজান ও একামতের শব্দ শুনতাম। এমতাবস্থায় তিন রাত অতিবাহিত হয়েছিলো। এরপর যখন মানুষেরা মদীনা শরীফে ফিরে এলো, তখন তারাও রওজা শরীফ থেকে আযান শুনতে পেলো, যেরূপ আমি শুনেছি।

দুনিয়া থেকে প্রস্থানের পর নবী করীম স. যে জীবিত অবস্থায় রয়েছেন, এ সম্পর্কে একমত হলেও আরেকটি ব্যাপারে উলামা কেরাম মতানৈক্য করেছেন। সেটি হচ্ছে, তিনি জীবিত আছেন ঠিক, কিন্তু কোথায় আছেন? তিনি রওজা শরীফে জীবিত? নাকি কোনো বিশেষ স্থানে? জান্নাতে? আসমানে?

কেউ কেউ বলেন, আমরা নবী করীম স. এর পবিত্র দেহ রওজা শরীফে দেখেছি। সেখান থেকে তাঁর দেহ মোবারক অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করার দলীল আমাদের কাছে নেই। সুতরাং এটাই প্রমাণিত যে, তাঁর দেহ মোবারক ওই নূরানী মাটিতেই সমাহিত অবস্থায় আলোকময় হয়ে আছে। কেউ যদি বলেন, কবর তো সংকীর্ণ স্থান। এরূপ সংকীর্ণ স্থানে নবী করীম স. এর পবিত্র দেহ আবদ্ধ থাকা সমীচীন নয়। জবাবে আমরা ওই হাদীছটি পেশ করতে চাই, যে হাদীছে বলা হয়েছে, মুমিনের কবরকে চারিদিকে সত্তর গজ করে প্রশস্ত করে দেয়া হবে। একজন মুমিনের কবরের অবস্থা এরকম হলে রসুলে আকরম স. এর কবর শরীফের প্রশস্ততা কতো হতে পারে? অনুমান করা যায়? যদি কেউ এরকম বলে, রসুলে আকরম স. এর ওফাতের পর তাঁর বরযখী জীবনের জন্য কবর শরীফের মাটির চেয়ে ফেরদাউসে আ'লাই তো বেশী উপযোগী। এমতো বক্তব্যের জবাবে বলবো, তার কবর শরীফের চেয়ে উত্তম জান্নাত কোথায়? জান্নাত তো রসুল স. এর গোলামদের বসবাসের জায়গা। এই মর্মে ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী র. এর উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, ভূখণ্ডের যে অংশের সাথে রসুলেপাক স. এর পবিত্র শরীর মিলিত আছে, সে অংশকে যদি পৃথিবীর সমস্ত

জায়গা, এমনকি পবিত্র কাবার উপরেও অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়, তবে মনে হয় না কোনো মুসলমান আপত্তি করবে। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রা. কর্তৃক বর্ণিত 'আমি কবর শরীফ থেকে নবী করীম স. এর আযানের আওয়াজ শুনেছি' এ হাদীছখানা শবে মেরাজ সম্পর্কিত নবী করীম স. এর উক্ত হাদীছের সমর্থক।

মেরাজের বর্ণনায় নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আমি মুসা আ. কে তাঁর কবরে নামাজ পড়তে দেখেছি। এখন প্রশ্ন আসে, মেরাজ সম্পর্কিত হাদীছে এরকম বর্ণনাও রয়েছে যে, নবী করীম স. আম্বিয়া কেরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বিভিন্ন আকাশে। আবার আরেক বর্ণনায় আছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আমি হজরত মুসা আ. কে সত্তর জন বনী ইসরাইলের সঙ্গে হজ্ব করতে এবং তালবিয়া পাঠ করতে দেখেছি। এই জটিলতার জবাব হচ্ছে, এহেন দর্শন সংঘটিত হয়েছে স্থানের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, কোরআন মজীদ তো নবী করীম স. এর মৃত্যুর ঘোষণা দিয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন 'নিশ্চয়ই আপনি মৃত্যুবরণকারী এবং তারাও মৃত্যুবরণকারী।' নবী করীম স. এরশাদ করেছেন 'আমি মৃত্যুবরণকারী একজন পুরুষ।' নবী করীম স. এর ইনতেকালের পর হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে মোহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাছাড়া নবী করীম স. এর মউত ও প্রস্থান গ্রহণের উপর উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। উত্তর এই যে, রসুলেপাক স. মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই গ্রহণ করেছেন এবং দুনিয়া থেকে প্রস্থান করেছেন। কিন্তু তারপর আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে জীবিত করে দিয়েছেন। যেমন হাদীছ শরীফে এসেছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে কবরের মধ্যে চল্লিশ দিনের চেয়ে অধিক সময় রাখবেন, এর চেয়েও আমি তাঁর নিকট অধিকতর সম্মানিত। হাদীছ শরীফে আরও এসেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা কোনো নবীর দেহ ভক্ষণ করাকে মাটির জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং নবী করীম স. এর যেমন জিসমানী, দুনিয়াবী ও বদনী হায়াত ছিলো এখনো ঠিক তেমনই আছে। এই হায়াত শহীদগণের হায়াতের চেয়ে অধিকতর পরিপূর্ণ। কেনোনা শহীদগণের হায়াত রূহানী ও পরকালীন হায়াত। আর পরকালীন হায়াত রূহের জন্য নির্ধারিত। জগতে যে দেহ নিয়ে তাঁর জন্ম হয়েছিলো সেই দেহের মেছাল বানিয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা শহীদগণের আত্মা সেখানে সংস্থাপন করতে পারেন। অথবা কোনো এক প্রকার দেহ যা আত্মাকে ধারণ করতে পারে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাই সৃষ্টি করে তার সঙ্গে শহীদের আত্মা সংশ্লিষ্ট করতে পারেন। যেমন হাদীছ শরীফে এসেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা শহীদগণের আত্মা সবুজ বর্ণের এক প্রকারের পাখির মধ্যে আমানত রেখে দিয়েছেন। পাখিগুলো আরশের ঝাড়বাতির নীচে অথবা জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আম্বিয়া কেরামের পবিত্র আত্মা তাঁদের

ওই পবিত্র দেহের মধ্যেই ফিরিয়ে দেয়া হয়, যে দেহ দুনিয়াতে ছিলো। তাঁদের পবিত্র দেহ পঁচে যায় না, মাটিতেও মিশে যায় না। আল্লাহ্তায়ালা দেহ ছাড়াও আত্মাকে সংরক্ষণ করতে সক্ষম। তবে আম্বিয়া কেরামের পার্থিব দেহেই তাঁদের আত্মাকে সংরক্ষণ করা হয়েছে বলে উদ্ধৃতি রয়েছে। যেমন হজরত মুসা আ. এর কবরে নামাজ আদায় করার বর্ণনা। নামাজ আদায় করা পার্থিব দেহের কাজ। শবে মেরাজের ঘটনায় আম্বিয়া কেরামের যে সকল গুণের কথা বলা হয়েছে সেগুলো দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কথার দ্বারা দুনিয়ায় তাঁদের যে জীবন ছিলো, হুবহু ওই জীবনকে বুঝতে হবে, তা নয়। পানাহার এবং দৈহিক প্রয়োজনাদি ইহকালীন জীবনে হয়ে থাকে। বরযখী জীবনে এসবের প্রকার ও প্রকৃতি ভিন্ন। পানাহার এবং অন্যান্য দৈহিক প্রয়োজনাদি মানুষের অভ্যাসগত কাজ। আর ওই জগতের অবস্থাতো জাগতিক অভ্যাসের বিপরীত। বরযখী জীবনের অবস্থা এমনও তো হতে পারে যে, সেখানকার হিমেল সুঘ্রাণ, নারী, বিভিন্ন প্রকারের রিযিক ইত্যাদি রূহানীভাবেও হতে পারে। যেমন শহীদগণের মর্যাদার্থে বলা হয়েছে 'তাদেরকে কবরের জীবনে রিযিক দেয়া হচ্ছে। তারা আনন্দিত। তাঁদেরকে প্রদত্ত আহার্য জান্নাতী হলেও বিস্ময়ের কিছু নেই। হাদীছ শরীফে তো এরকম বর্ণনাও এসেছে, তিনি আমাকে আহার করাচ্ছেন, পান করাচ্ছেন।

এখন একটি প্রসঙ্গ বাকি রইলো। তা হচ্ছে, নবী করীম স. রওজা শরীফে শুয়ে উম্মতের ব্যাপারে কিছু জানতে পারেন কিনা এবং উম্মতের কোনো কথা শুনতে পান কিনা। এ ব্যাপারে বলতে হয়, শুধু তিনি নন, সকল নবীর বেলায় এটা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি বিষয়টির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে উলামা কেরাম তো এই মতে উপনীত হয়েছেন যে, সকল মৃতব্যক্তির বেলায় এরকম হওয়া সম্ভব। হাদীছ শরীফে এসেছে, কবরের মধ্যে মৃতগণ নামাজ পাঠ, তালবিয়া পাঠ, জিকির ও তাসবীহ পাঠ ইত্যাদি করে থাকেন।

কেউ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে, বরযখ তো কোনো দারুল আমল (আমলের জগত) নয় এবং সেখানে শরীয়তের বিধান বাধ্যতামূলকও নয়। তাহলে কবরবাসীরা আমল করবে কেনো? উত্তরঃ আলমে বরযখে সওয়াব ও পুরস্কারের সোপান তৈরী করা হয়। দুনিয়ার আমলের বিধান মোতাবেকই তা হয়ে থাকে। আবার অধিকাংশ সময় সেখানকার আমল স্বইচ্ছায় হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে তা আরোপিত নয়। বরং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে উদ্দীপনা ও আগ্রহ সহকারে মনের আনন্দে কবরবাসীরা তা করে থাকে। যেমন, দুনিয়াতে নফল ইবাদত বন্দেগী করা হয়। যেমন বেহেশতীরা বেহেশতে তসবীহ পাঠ করবে, কোরআন তেলাওয়াত করবে। হাদীছ শরীফে আছে, কোরআনের পাঠক বেহেশতে প্রবেশ করলে আল্লাহ্তায়ালা আদেশ করবেন, 'তরতীলের সাথে

কোরআন পাঠ করো এবং উন্নত হও। রসুলেপাক স. কিয়ামতের দিন শাফায়াতের দরজা খোলার নিমিত্তে যে সেজদা করবেন, তাও এ পর্যায়েরই আমল।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি অন্যতম দিক হচ্ছে, দুনিয়া থেকে প্রস্থানের পরও তাঁর সম্পদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর তাঁর পরিবার পরিজনের নফকার ব্যবস্থা আল্লাহ্পাক করবেন বলে অঙ্গীকারও করেছেন। ইমামুল হারামাইন একে রসুলেপাক স. এর বিশেষত্বের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, রসুলেপাক স. যা কিছু রেখে গেছেন, তার উপর তাঁর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সাইয়্যেদুনা হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. যখন খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন তাঁর খেলাফতের নীতিনির্ধারণীর মধ্যে এটাও স্থির করে নেন যে, রসুলেপাক স. এর আহল ও আয়াল, খাদেমসমূহ এবং অন্যান্য খাতে বাইতুলমাল থেকে খরচ বহন করা হবে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. জানতেন, রসুলেপাক স. এর মাল তাঁরই মালিকানায় রয়েছে। এই মাসআলাটি দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হয় যে, দুনিয়াবী বিধানের ক্ষেত্রেও তাঁর হায়াতকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং শহীদগণের হায়াতের তুলনায় তাঁর হায়াত অধিকতর উঁচুমানের। অবশ্য কেউ কেউ নবী করীম স. এর ওফাতের পর তাঁর মালিকানা রহিত হয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। উভয় প্রকার মতের অনুসারীরাই রসুলেপাক স. এর বাণী 'রেখে যাওয়া সম্পত্তি হচ্ছে সদকা' দ্বারা হেদায়েত গ্রহণ করতে পারে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

এই মাসআলাটি রসুলেপাক স. এবং অন্য নবীগণের হায়াত সংক্রান্ত আলোচনায় এসে গেছে। এছাড়াও এই কিতাবের শেষের দিকে ওফাতুন্নবী নামক পরিচ্ছেদে এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র আলোচনা আসবে। আলোচনাটি পুনরাবৃত্তি মনে হলেও দোষের কিছু নেই। কারণ এতে করে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার ও সুদৃঢ় হবে।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বসমূহের মধ্যে আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁর রওজা শরীফে ফেরেশতারা নিয়োজিত রয়েছে। তাদের কাজ হচ্ছে, জিয়ারতকারীদের সালাত ও সালাম রসুল স. এর কাছে পেশ করা। এই হাদীছটি নিম্নোক্ত ভাষ্যের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। ভাষ্যটি এই— আল্লাহ্তায়ালার এমন কতিপয় ফেরেশতা আছে, যারা যমীনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। আমার উম্মতের তরফ থেকে তারা আমার নিকট সালাম পৌঁছে দেয়। হজরত আম্মারা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালার একজন ফেরেশতা আছেন। তাঁর শ্রবণশক্তি এতো অধিক যে, এমন শ্রবণশক্তি অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। যে কোনো স্থান থেকে আমার উপর সালাত ও সালাম পেশ করা হোক না কেনো, উক্ত ফেরেশতা সেই সালাত ও সালাম সঙ্গে সঙ্গে আমার নিকট পৌঁছে দেয়।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক, উম্মতের আমল তাঁর নিকট পেশ করা হয়। রসুল স. তা দেখে উম্মতের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকেন। ইবনে মোবারক হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রা. থেকে বর্ণনা করেন, এমন কোনো দিন নেই যে, সকাল সন্ধ্যা উম্মতের আমল রসুলেপাক স. এর নিকট পেশ করা না হয়। রসুলেপাক স. কিয়ামতের দিন উম্মতের কপাল এবং তাদের আমল দ্বারা উম্মতকে চিনে নিবেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আমার কাছে উম্মতের আমল পেশ করা হয়। তন্মধ্যে বদআমলগুলো আমি আড়াল করি। আর নেক আমলগুলো আল্লাহ্পাকের নিকট পেশ করি। আড়াল করার অর্থও এখানে পেশ করা। আল্লাহ্তায়ালার বিধানই যেনো এরকম। পেশ করার পর আমল সাব্যস্ত হয়। আর যেসব আমল পেশ হয় না, সেগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়।

কাব আহবার কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আছে, রসুলেপাক স. এর রওজা শরীফে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা নেমে এসে ঘাড় দুলিয়ে কবর শরীফ তওয়াফ করতে থাকে। নবী করীম স. কিয়ামতের দিন যখন আপন কবর শরীফ থেকে বেরিয়ে হাশরের ময়দানে উঠবেন, তখন ওই সকল ফেরেশতা সমভিব্যহারেই উঠবেন। তখন নবী করীম স. কে নিয়ে ওই ফেরেশতাবৃন্দ যেফাফের মতো মিছিল করে যাবেন। যেফাফের অর্থ দুলহানকে দুলহার গৃহে নিয়ে আসা। তবে এখানে লাযেমী অর্থ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ মাহবুব (প্রেমাস্পদ)কে মোহেব (প্রেমিক) এর কাছে নিয়ে যাওয়া। মোটকথা ফেরেশতাবৃন্দ মিছিল সহকারে অভিবাদন করতে করতে তাঁকে বারেগাহে এলাহীতে নিয়ে যাবেন।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের অন্যতম দিক হচ্ছে, তাঁর পবিত্র মিম্বর তাঁর হাউযের উপর অবস্থিত। হাদীছ শরীফে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমার মিম্বর জান্নাতের তরআসমূহের মধ্যে একটি তরআ। তরআ শব্দের অর্থ দরজা বা ফটক। কেউ অর্থ করেছেন স্তর। আবার কেউ অর্থ করেছেন, উদ্যানের উঁচু স্থান। হাদীছ শরীফে এসেছে, একদিন সাইয়্যেদে আলম স. মিম্বর শরীফে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, এই মুহূর্তে আমার পা জান্নাতের তরআসমূহের একটি তরআর উপরে রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, আমার মিম্বার আমার হাউযের উপরে অবস্থিত। অন্য হাদীছে এসেছে, তিনি এরশাদ করেছেন, এখন আমি আমার হাউযের ইকরে দাঁড়িয়ে আছি। ইকর ওই স্থানকে বলা হয়, যেখান থেকে হাউযের মধ্যে পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। 'হাউযের উপর মিম্বর অবস্থিত' কথাটির তাৎপর্য বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন এর অর্থ হবে মিম্বরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, তা থেকে বরকত লাভ করা, তার সম্মুখে সর্বদাই আমলে সালেহা পালন করা ইত্যাদি। তাহলে এর দ্বারা উম্মত

হাউযে নবী স. তথা হাউযে কাউছারের কাছে আসতে পারবে এবং তা থেকে জীবনরক্ষাকারী পানি পান করতে পারবে।

এটাও সম্ভব, নবী করীম স. স্বীয় মিম্বরকে যেরূপ মর্যদা দান করেছেন, কাল কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকাতের রঙে রঞ্জিত করে হাশরের ময়দানে আল্লাহ্পাক তাঁকে উত্থিত করবেন এবং হাউযে কাউছারের পাশে রাখবেন।

জান্নাতের তরআ মানে বেহেশতের দরজা। এর অর্থ, রসুলেপাক স. এর মহিমা প্রকাশার্থে আল্লাহ্তায়ালা কিয়ামতের দিন তাঁর মিম্বর শরীফকে জান্নাতের দরজা হিসেবে সংস্থাপন করবেন। কেউ আবার এরকম ব্যাখ্যা করেন, এখানে মিম্বর বলতে ওই মিম্বরকে বুঝানো হয়েছে, যা নবী করীম স. এর জন্য কিয়ামতের দিন কায়েম করা হবে। এই মিম্বর বলতে মসজিদে নববীর মিম্বরকে বুঝানো হয়নি। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা হাদীছ শরীফের বাক্যের ভাব ও চাহিদা থেকে বহু দূরে। কেনোনা, হাদীছ শরীফের বর্ণনা, আমার হুজরা এবং মিম্বরের মধ্যবর্তীস্থানে জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান রয়েছে, আর আমার মিম্বর আমার হাউযের উপর অবস্থিত। হাদীছের বাণীবিভা ঝুঁকে আছে এই মিম্বর শরীফের দিকেই, যা রওজায়ে মুকাদ্দাসার তাহদীদের জন্য আলোচনা করা হয়েছে। তারিখে মদীনাতে এরকমই উল্লেখ করা হয়েছে।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবের লেখক বলেছেন, কোনো একজন আলেমও উল্লিখিত হাদীছের যাহেরী অর্থ গ্রহণ করতে দ্বিমত করেননি। আর এটাই সত্য। কেনোনা সত্যসংবাদদাতা স. অদৃশ্য জগতের যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন, তার উপর ইমান আনা ওয়াজিব।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, তাঁর মিম্বর এবং কবর শরীফের মধ্যবর্তীস্থানে বেহেশতের বাগানসমূহের কোনো একটি বাগান রয়েছে। এই হাদীছখানা ইমাম বোখারী র. 'মা বাইনা বাইতী ওয়া মিম্বারী' এই বাক্যে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কেও উলামা কেরাম বিভিন্ন আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন। কেউ বলেছেন, 'রওজায়ে জান্নাত' বা বেহেশতের বাগান দ্বারা মধ্যবর্তীস্থানটিকে বুঝানো হয়েছে। কেনোনা সেখানে বসে জিকির আজকার মোরাকাবা মোশাহাদা ও ইবাদত বন্দেগী করলে ওই কাজগুলো রহমত নাযিলের কারণ হবে, সৌভাগ্য লাভের ওসীলা হবে। যেমন মসজিদকেও রিয়াযুল জান্নাত বা বেহেশতের বাগান বলা হয়েছে।

নবী করীম স. এরশাদ করেছেন 'ইযা মারারতুম বিরিয়াযিল জান্নাতি ফারতাউ' অর্থাৎ তোমরা যখন বেহেশতের বাগানসমূহের নিকট দিয়ে যাবে, তখন তা থেকে ফল আহরণ করে নিও।

বিশেষ করে রসুলেপাক স. এর জামানায় সৌভাগ্য লাভই তার বাস্তব নিদর্শন। সেখান থেকেই সকলে এলেমের ফল, জিকিরের নূর এবং জান্নাতের নিদর্শন লাভে ধন্য হতেন। কেউ কেউ রওজাতুল জান্নাতের অর্থ এইভাবে করেন যে, নবী করীম স. এর ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তীস্থান বেহেশতের বাগান এই হিসেবে যে, সে স্থানে আনুগত্য ও ইবাদত প্রতিষ্ঠিত করলে তা জান্নাতে পৌঁছার কারণ হবে।

যেমন নবী করীম স. এরশাদ করেছেন 'জান্নাত তরবারীর ছায়ার তলে অবস্থিত।' তিনি আরও এরশাদ করেছেন, 'মায়ের পদতলে জান্নাত।' রিয়াযুল জান্নাতের ব্যাখ্যায় দুটি মত পেশ করা হয়েছে। দুটিই নেহায়েত দুর্বল এবং সত্য থেকে দূরে। কেনোনা রিয়াযুল জান্নাতের অর্থ যদি রহমত নাযিল হওয়া, জান্নাতী বাগানে পৌঁছা এবং এর উপর ছওয়াব নির্ভর করা, ইত্যাকার অর্থ হয়, তাহলে তো তা সমস্ত মসজিদ এবং অন্যান্য কল্যাণকর স্থানেও হতে পারে। তাহলে উক্ত স্থানের বিশেষত্বটি আর রইলো কোথায়? এরূপ সুসংবাদ শুধুমাত্র মসজিদে নববী এবং মিম্বর মোবারকের সাথে বিশিষ্ট নয়। আবার উক্ত স্থানকে খাস রহমত এবং জান্নাতের বিশেষ প্রকারের একটি বাগান– এরূপ অর্থ যদি করা হয়, তবু তা সত্য থেকে দূরেই থাকবে।

এ প্রসঙ্গে হক কথা এটাই যে, রসুলেপাক স. এর বাণীর মর্মার্থ, যথার্থতা বাস্তবসম্মতভাবেই করতে হবে। হুজরা শরীফ এবং মিম্বর শরীফের মধ্যবর্তী স্থানটি প্রকৃত পক্ষেই জান্নাতের একটি বাগিচা। কিয়ামতের দিন একে জান্নাতে রূপান্তরিত করা হবে। যমীনের অন্যান্য স্থানের মতো তা নিশ্চিহ্ন হবে না। ইবনে ফরহুন এবং ইবনে জওযী হজরত ইমাম মালেক র. থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর আলেমগণের ঐকমত্যকে এর সাথে শামিল করেছেন। শায়েখ ইবনে হাজার আছকালানী এবং অধিকাংশ মোহাদ্দেছ এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মালেকী মতাবলম্বী উলামাদের মধ্য থেকে ইবনে আবী জুমরাহ র. বলেছেন, ওই অংশটি স্বয়ং জান্নাতের বাগিচার অংশবিশেষ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, যে অংশটুকু আল্লাহ্তায়ালা সেখান থেকে দুনিয়ার এই স্থানে স্থাপন করেছেন। হাজারে আসওয়াদ যেরকম মাকামে ইব্রাহীমের স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তাকে আবার স্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বান্দার উপর রহমত নাযিল হওয়া, জান্নাতের অধিকারী হওয়া, এ স্থানের ফজল ও উচ্চ মর্যাদার কারণেই হয়।

কবর শরীফকে রিয়াযুল জান্নাত বলার অন্য আরেকটি দৃষ্টিকোণও থাকতে পারে। যেমন হজরত ইব্রাহীম আ. কে জান্নাতে একখানা বিশেষ পাথর দ্বারা মর্যাদামণ্ডিত করা হয়েছিল। তদ্রূপ হাবীবে খোদা স. কে রওজাতুন মিন রিয়াযিল জান্নাত দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। যমীনের এই খণ্ডটুকু বাহ্যিক দৃষ্টিতে পৃথিবীর

মাটির মতো দেখা গেলেও ক্ষতি নেই। কেনোনা মানুষ যতক্ষণ এ পৃথিবীতে স্বভাবের ঘন পর্দা এবং মানবীয় আদত ও খাসলতের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকবে, ততক্ষণ তার নিকট বস্তুর হাকীকত উন্মোচিত হওয়া এবং আখেরাতের কার্যাবলী অনুভব করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে এরকম ধারণাও ঠিক নয় যে, এই স্থানের হাকীকত যখন রওজাতুন মিন রিয়াযিল জান্নাত, তখন এস্থান থেকেও তৃষ্ণা এবং দিগম্বরত্ব দূর হওয়া উচিত। কেনোনা এগুলোতো জান্নাতের রীতি এবং আনুষংগিক ব্যাপার।

যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই বেহেশতের মধ্যে পিপাসা হবে না এবং তুমি দিগম্বর হবে না।' সম্ভবতঃ জান্নাতের আনুষংগিক বস্তুসমূহকে এই স্থান থেকে বের করে দিয়ে তারপর হয়তো রূপান্তরিত অবস্থায় পৃথক আকারে আনা হয়েছে। হাজারে আসওয়াদ এবং মাকামে ইব্রাহিমীর বেলায়ও তেমন। কেউ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে, এ ধরনের ব্যাপারে শ্রুতিগত দলীল ও হাদীছ ছাড়া কোনো যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। রুকন অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীমের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। কাজেই সেগুলোর প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব। উত্তরে আমরা বলবো, এ ব্যাপারেও দলীল এবং রসুল স. এর হাদীছের সাক্ষ্য আছে। হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীমের হাকীকত সাদেক মাসদুক স. এর খবর দ্বারাইতো জানা গেছে। তেমনি রওজা শরীফ ও মিম্বর শরীফের অবস্থাও জানা গেছে। রূপকতার আশ্রয় নিলে উভয়ক্ষেত্রেই নিতে হবে। আর যদি হাকীকতের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তাও উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁর কবর শরীফ বিদীর্ণ হবে এবং সকলের পূর্বে তিনি বাইরে তশরীফ আনবেন। সর্বাগ্রে তিনিই উত্থিত হবেন। এর অর্থ হচ্ছে কিয়ামতের সমাবেশস্থলে তিনিই প্রথম ব্যক্তি হবেন, যিনি জান্নাতের দরজায় করাঘাত করবেন।

হাদীছ শরীফে এসেছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আমি কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজা খুলবো। জান্নাতের রক্ষী ফেরেশতা বলবে 'বিকা উমরতু লা-আফতাহু লিআহাদিল কাবলাকা' আপনার ব্যাপারেই আমাকে হুকুম করা হয়েছে। আপনার পূর্বে কারো জন্যই জান্নাতের দরজা খুলবো না। এখানে বিকা শব্দটির মধ্যে যে 'বা' অক্ষর রয়েছে তা কসমের অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তখন তার অর্থ হবে 'আপনার কসম, আপনার পূর্বে অন্য কারও জন্য খুলবো না।" এরকম অর্থ অধিকতর সুন্দর আর মহব্বতের আস্বাদনে স্বাদু। তিনিই সকলের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর তিনিই সকলের পূর্বে শাফায়াতের দরোজা উন্মুক্ত করবেন।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি অন্যতম দিক হচ্ছে, তিনি বোরাকের পিঠে সওয়ার হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেন। তাঁকে বেহেশতের সবচেয়ে উন্নতমানের জোড়া লেবাস দান করা হবে। অন্য এক হাদীছে আছে, কিয়ামতের দিন মানুষ একত্রিত হবে। তখন আমি এবং আমার উম্মত উঁচুস্থানে দণ্ডায়মান হবো। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে জোড়া লেবাস পরিধান করাবেন। তিনি স. তখন সময় আরশের মাকামের এমন একটি স্থানে দণ্ডায়মান হবেন, যেখানে কেউই দণ্ডায়মান হতে পারেনি। আর সেস্থানটিতে দাঁড়ানোর জন্য পূর্বাপর সকলেই আকাংখা পোষণ করবে।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, তাঁকে মাকামে মাহমুদ দান করা হবে। তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম হজরত মুজাহিদ র. বলেন, তিনি স. মাকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থান লাভ করবেন, তার মানে আরশের উপর আসন গ্রহণ করবেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি কুরসীর উপর আসন গ্রহণ করবেন। তাফসীরে বায়যাবীতে বলা হয়েছে, মাকামে মাহমুদ এমন একটি স্থান, যেখানে গেলে সকলেই নবী করীম স. কে চিনতে পারবে। সবাই তাঁর প্রশংসা করবে। তাফসীরে বায়যাবী শরীফের কথাটি সাধারণতঃ সকল স্থানের জন্যই প্রযোজ্য। কেনোনা নবী করীম স. যে স্থানে দণ্ডায়মান হবেন, সে স্থানই তাঁর ওসীলায় মর্যাদা ও বুযুর্গী লাভ করবে। কাজেই একথার দ্বারা মাকামে মাহমুদের কোনো বিশেষত্ব প্রমাণিত হয় না। তবে এ সম্পর্কে মশহুর কথা এই যে, এ মাকামটি শাফায়াতের মাকাম।

সাইয়্যেদে আলম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি অন্যতম দিক হচ্ছে, কিয়ামতের ময়দানে যারা বিচারের জন্য দণ্ডায়মান হবে, তাদের মধ্যে তাঁকে বিরাট শাফায়াতের অধিকার প্রদান করা হবে। হাশরবাসীরা তাঁর শরণাপন্ন হবে। তিনি তাঁর শাফায়াতের মাধ্যমে কোনো জামাতকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আবার বেহেশতের মধ্যে কারও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়ে দিবেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা যথাস্থানে করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, কিয়ামতের দিন তাঁকে প্রশংসার ঝাণ্ডা দান করা হবে। কিয়ামতের দিন হজরত আদম আ. সহ সকল নবী ওই ঝাণ্ডার নীচে অবস্থান করবেন। আর ওসীলা জান্নাতের যে একটি সর্বোন্নত স্তর, তাও বিশেষ করে নবী করীম স. কে প্রদান করা হবে। মোট কথা, আল্লাহ্তায়ালার নিকট নবী করীম স. হচ্ছেন সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত ও মর্যাদামণ্ডিত। তাই কিয়ামতের দিন তিনিই হবেন সকলের অগ্রণী।

যেমন তিনি স. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আমি বনী আদমের সরদার হবো এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত হবো। আর

সেদিন আমার হাতে থাকবে প্রশংসার ঝাণ্ডা। এতে আমার কোনো অহংকার নেই। আদমসহ সকল নবী আমার ঝাণ্ডার তলে আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

মহানবী স. এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যখন জান্নাতের দরোজা খোলার জন্য এগিয়ে যাবেন, তখন তাঁর সম্মানার্থে জান্নাতের রক্ষী দণ্ডায়মান হবে এবং তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে দরোজা খুলে দিবে। রক্ষী ফেরেশতা বলবে আমি আপনার পূর্বে কারও জন্য দরোজা খুলিনি। আর আপনার পর আর কারও জন্য দাঁড়িয়েও থাকবো না। এর দ্বারা নবী করীম স. এর মর্যাদার আধিক্যই প্রকাশ পাবে। নতুবা জান্নাতের রক্ষী ফেরেশতাগণ তো তাঁরই খাদেম। আর আল্লাহ্‌র হুকুমে বেহেশতে তিনি বাদশাহ্‌তুল্য হবেন।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে হাউযে কাউছার দিয়েছেন। হাউযে কাউছারের পানি মধুর চেয়ে মিষ্ট এবং দুধের চেয়ে শুভ্র। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রবফের চেয়ে শাদা। আর তার পেয়ালার সংখ্যা হবে আকাশের তারকার চেয়েও বেশী। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, আখেরাতে নবীগণের জন্য এক একটি হাউয হবে যা হবে তাঁদের আপন আপন মর্যাদা অনুসারে। আর নবী করীম স. এর হাউযে কাউছার হবে সেগুলোর চেয়ে অধিকতর প্রশস্ত এবং সম্মানিত।

নবী করীম স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, আল্লাহ্‌তায়ালা কোরআন মজীদে আম্বিয়া কেরামের তওবা, ক্ষমা এবং তাঁদের দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন ভুল ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নবী করীম স. এর বেলায় আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন 'নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি এজন্য যে, আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ভুলত্রুটিগুলো আল্লাহ্‌তায়ালা মাফ করে দিবেন এবং তাঁর নেয়ামতসম্ভার আপনার উপর পরিপূর্ণ করে দিবেন।' এখানে দেখা যায়, আল্লাহ্‌তায়ালা ফাতাহ বা বিজয়ের কথাটি আগে উল্লেখ করেছেন। তারপর অতীত ও ভবিষ্যতের ভুল ক্ষমা করার কথা বলেছেন। এখানে ভুলটি কী তা কিন্তু অস্পষ্ট। এই আয়াতের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রথম খণ্ডের একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, অন্যান্য নবী আ.গণ আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে চাওয়ার পর পেয়েছেন। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন নবী করীম স. কে না চাইতেই দিয়েছেন। হজরত আদম আ. আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে নিবেদন করেছেন 'যে দিন মানুষকে উঠানো হবে সে দিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না।' অথচ রসুলেপাক স. এবং তাঁর উম্মতের শানে আল্লাহ্‌তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন 'সে দিন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর হাবীবকে এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা ইমান এনেছেন তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না।' হজরত মুসা আ. আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে নিবেদন করলেন, 'হে আমার

প্রভু! আমার বক্ষ সম্প্রসারিত করে দিন।' আর নবী করীম স. এর ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন 'আমি কি আপনার বক্ষকে সম্প্রসারিত করে দিইনি।'

মহানবী স. এর বিশেষত্বের আরেকটি অন্যতম দিক হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে মহব্বতের মাকাম প্রদানে ধন্য করেছেন। আর হজরত ইব্রাহীম আ. কে খিল্লতের মাকাম দ্বারা বিশেষিত করেছেন।

মহব্বতের মাকাম খিল্লতের মাকামের চেয়ে উন্নত। কোনো কোনো আরেফীন উলামা খলীল ও হাবীব শব্দের পার্থক্যের ব্যাপারে সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। বলেছেন, খলীল শব্দের উৎপত্তি খিল্লত থেকে। অর্থ হাজত বা প্রয়োজন। হজরত ইব্রাহীম আ. আল্লাহ্তায়ালার প্রতি আপাদমস্তক মুখাপেক্ষী ছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে খলীল আখ্যা দিয়েছেন। আর হাবীব শব্দটি ফাঈল এর ওযনে এসেছে, যার অর্থ হবে মাফউল। সুতরাং রসুলে আকরম স. কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকেই মোহেব (প্রেমিক), আবার মাহবুব বা প্রেমাস্পদ।

আরেফগণ বলেন, খলীলের কাজ আল্লাহ্তায়ালার রেজামন্দির জন্য হয়ে থাকে। আর হাবীবের রেজামন্দির জন্য হয় আল্লাহ্র কাজ। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ওই কেবলার দিকে ফিরিয়ে দেবো যা আপনি পছন্দ করেন।'

আল্লাহ্তায়ালা আরও ঘোষণা করেন 'অচিরেই আপনার প্রভু আপনাকে এতোবেশী দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।' খলীলের আরেকটি বিশেষত্ব হলো, মাহবুবের মোলাকাতের জন্য তিনি কখনও তাড়াহুড়া করবেন না। যেমন বর্ণিত আছে, হজরত ইব্রাহীম আ. এর কাছে তাঁর রূহ কবয করার জন্য মালাকুল মউত এলে তিনি তাওয়াককুফ বা মৌনতা অবলম্বন করেছিলেন। একটু পরে তিনি জিব্রাইল আ. কে বলেছিলেন, বরং পরওয়ারদেগারে আলমের কাছে জিজ্ঞেস করুন, দেখা যাক তিনি কী হুকুম দেন, এখনই কি হাযির হতে হবে? নাকি কিছু বিলম্ব করলেও চলবে? কিন্তু নবী করীম স. এর বেলায় দেখা যায়, তিনি বলেছিলেন, 'আমি রফীকে আ'লা বা সর্বোন্নত বন্ধুকেই গ্রহণ করলাম। ' তিনি বিভিন্ন দোয়ায় বলতেন, হে আল্লাহ্! যে দৃষ্টি তোমার চেহারার বুযুর্গীর দিকে ধাবিত, আমি তোমার কাছে এমন দৃষ্টি প্রার্থনা করি। আর প্রার্থনা করি দীদারের আগ্রহ। খলীলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কিয়ামতের দিন মাগফেরাতের আকাঙ্ক্ষা তাঁর থাকবে। যেমন বলা হয়েছে 'ওই ব্যক্তি যিনি এই আকাঙ্ক্ষা করবেন যেনো কিয়ামতের দিন তাঁর গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।' আর হাবীবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁর মাগফেরাত হবে রব্বুলআলামীনেরই কামনা।

যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আমি আপনাকে ফাতহে মূবীন দান করেছি, আপনার মাগফেরাতের জন্য।' খলীল আল্লাহ্র নিকট দোয়া করেন 'পুনরুত্থানের দিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না।' আর হাবীব বা মাহবুব সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন 'ওই দিন আল্লাহ্তায়ালা নবীকে লাঞ্ছিত করবেন না।' হাবীবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে 'ওই সকল লোক যারা তাঁর সঙ্গে ইমান এনেছেন।'

খলীল তিনি, যিনি বলেছেন, 'আমি আমার প্রভুর দিকে গমনকারী। অচিরেই তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন।' আর তিনিই হাবীব যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'আপনার প্রভু তো আপনাকে বেভুল পেয়েছিলেন। তাই পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।' খলীল বলেছেন 'পরবর্তীদের মধ্যে আমার জন্য সত্য ভাষণ প্রস্তুত করে দিন।' আর হাবীবের শানে আল্লাহ্তায়ালা নিজেই বলেছেন 'আমি আপনার আলোচনাকে সমুন্নত করেছি।' খলীল আল্লাহ্তায়ালার কাছে চেয়েছেন 'আমাকে জান্নাতে নাঈমের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্গত বানিয়ে দিন।' আর হাবীবের শানে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন 'আমি আপনাকে কাউছার দান করেছি।' খলীল আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছেন 'আমাকে এবং আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে রক্ষা করুন।' আর হাবীব সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহ্তায়ালাতো তোমাদের থেকে, নবীর পরিবারবর্গ থেকে অপবিত্রতা দূর করে দিতে চান এবং তোমাদিগকে খুব ভালোভাবে পবিত্র করে দিতে চান।' এ সকল আয়াতে কারীমার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হাবীবের মহব্বত আর খলীলের খিল্লত এর মর্যাদার মধ্যে তারতম্য আছে।

মহানবী স. এর মর্যাদার আরেকটি দিক হচ্ছে, তিনি নফল নামাজ বসে পড়লে দাঁড়িয়ে পড়ার ছওয়াব লাভ করতেন। কিন্তু অন্যদের বেলায় তা নয়। এমর্মে নবী করীম স. এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বসে নামাজ পড়বে, সে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীর অর্ধেক ছওয়াব পাবে।

এই হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা সাধারণভাবে সকলকে বুঝায়। নবী করীম স. কিন্তু ব্যতিক্রম। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদা আমি নবী করীম স. কে বসে নামাজ পড়তে দেখলাম। নিবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি তো শুনেছি বসে নামাজ আদায়কারীর নামাজ দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক। তিনি বললেন, হাঁ। আমার এরশাদ এরকমই। তবে আমি তো অন্য কারও মতো নই।

মহানবী স. এর বিশেষ আরেকটি দিক হচ্ছে, আদম আ. এর কাল থেকে প্রথম সিঙ্গা ফুৎকার পর্যন্ত দুনিয়াতে যা ঘটেছে এবং ঘটবে, সবকিছুই আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব স. কে জানিয়ে দিয়েছেন। এমনকি অতীতের,

ভবিষ্যতের সকলের অবস্থা সম্পর্কেও আল্লাহ্তায়ালা তাকে জ্ঞাত করেছেন। আর সেগুলো থেকে কারো কারো অবস্থা তিনি সাহাবা কেরামকেও অবহিত করেছেন। জনৈক আরেফ ব্যক্তি এরকম একটি কিতাব রচনা করেছিলেন যার মধ্যে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সমস্ত উলুমে এলাহী রসুলেপাক স. কে শিক্ষা দান করা হয়েছে। এ কথাটি অবশ্য বাহ্যিকভাবে অনেক দলিল প্রমাণের বিপরীত পরিদৃষ্ট হয়। তবে এর প্রবক্তা কী উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছেন, তার হাকীকত আল্লাহ্তায়ালাই ভালো জানেন।

উম্মতে মোহাম্মদী স. এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

মহানবী স. এর উম্মতে মরহুমার মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যও বেশুমার। আর এ সমূহ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যগুলোও রসুলেপাক স. এর প্রতি ধাবিত। কেনোনা তিনি একটি অনুগত উম্মতের নবী। এখানে একটি কথা ভালোভাবে জেনে রাখতে হবে, যদিও জ্বীন ও ইনসান উভয়ই তাঁর উম্মত এবং উভয় জাতিরই তিনি নবী, তথাপি বিশেষত্ব ও যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালার যে করুণা প্রকাশ পেয়েছে, তা কেবল মানুষের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। 'তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, মানুষের জন্য তোমাদিগকে বের করা হয়েছে' আল্লাহ্পাকের এই সম্বোধন, সরাসরি রসুলেপাক স. এর সাহাবীগণের প্রতি। কেনোনা, ইমানের দিক দিয়ে তাঁরাই অগ্রগামী আর তাঁরা আল্লাহ্পাকের নৈকট্যভাজন। আরও বলা হয়েছে 'তোমরা ভালো কাজের আদেশ করো, আর মন্দ কাজের প্রতিবন্ধক হও।' প্রকৃতপ্রস্তাবে উত্তম উম্মত হওয়ার জন্য উপরোক্ত গুণ দু'টিই শর্ত। নবী করীম স. এর সংসর্গের কারণে সাহাবা কেরামের মধ্যে উক্ত গুণগুলো পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছিলো। তাঁরা ওই সকল ব্যক্তি, যাঁরা মহানবী স. এর সুন্দর অবয়ব সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর নূর ও নিদর্শনের ফয়েজ সঞ্চয় করেছিলেন মাধ্যম ব্যতিরেকেই।

এর দ্বারা আরেকটি সত্য প্রকাশিত হলো যে, এই উম্মতের পরবর্তীগণের তুলনায় পূর্ববর্তীগণই শ্রেষ্ঠ। এ ব্যাপারে নবী করীম স. এর ভাষ্যও রয়েছে, 'সবচেয়ে উত্তম যুগ হলো তাদের যুগ, যাদের মধ্যে আমি আছি। এরপর উত্তম তারা, যারা তাদের পূর্ববর্তীগণকে পেয়েছে। অতঃপর উত্তম তারা, যারা তাদের পূর্ববর্তীগণকে পেয়েছে। মশহুর এ তিনটি স্তরের প্রথমে রয়েছেন সাহাবা, তারপর তাবেয়ীন। তারপর তাবে তাবেয়ীন। সহীহ্ বোখারীর এক হাদীছ দ্বারা চতুর্থ স্তরেরও সন্ধান পাওয়া যায়, যাকে আতবায়ে তাবা বলা হয়েছে।

এরপর রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, অতঃপর মিথ্যার প্রসার ঘটবে। হাদীছাংশের তাৎপর্য এই যে, উক্ত তিন বা চারটি স্তরের পর পূর্ববর্তীগণের মধ্যে যেরকম দ্বীনদারী, সত্যবাদিতা, সততা ও সুসম্পর্ক ছিলো, তা লোপ পেয়ে যাবে

এবং মিথ্যা, ধোঁকাবাজি ও অপবাদ ব্যাপকতা লাভ করবে। সাহাবা কেরামের দলে এমন লোকও আছেন, যাঁরা নবী করীম স. কে এক পলক দেখার পর ইমান এনেছেন। এরপর আপন কাজ কর্মে লিপ্ত হয়ে গিয়েছেন। দীর্ঘকালব্যাপী নবী করীম স. এর খেদমতে হাজির হবার সুযোগ আর পাননি। এই শ্রেণীর সাহাবীগণের ব্যাপারে কোনো কোনো আলেম মত পেশ করেন, পরবর্তী লোকদের উপরে তাঁদেরও ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। উলামা কেরামের এরূপ মতামতের উদ্দেশ্য পরিষ্কার নয়। তাঁরা যদি বুঝিয়ে থাকেন, নবী করীম স. এর দর্শন ও মোশাহাদার বরকতে এক মুহূর্তেও ওই পূর্ণতা অর্জিত হতে পারে, যা অন্যান্যরা দীর্ঘ সময়ের সাধনায় অর্জন করতে পারে না, তাহলে ব্যাপারটি তাওয়াককুফ সাপেক্ষ। এরদ্বারা সাহাবা কেরামের ব্যক্তিগত মর্যাদার তারতম্যকে উপেক্ষা করা হয়। আর এটাতো বাস্তবতার পরিপন্থী– এ কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও এ মহান সত্যটি অনস্বীকার্য যে, নবী করীম স. এর দর্শন ও মোশাহাদা এমন এক মহান মর্যাদা যা অন্যান্য যাবতীয় কামালাত ও মর্যাদা থেকে অধিকতর পরিপূর্ণ। কোনো ফযীলত ও মর্যাদাই সংসর্গের সমতুল্য হতে পারে না। মোটকথা, যা কিছুই বলা হোক না কেন, সংক্ষিপ্ততম সংসর্গ লাভকারীও তাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, যাঁরা সোহবত ও দর্শন থেকে বঞ্চিত। উসুলীনদের জামাত 'সোহবত' শব্দটির ব্যবহারে প্রথম জামাত অর্থাৎ দীর্ঘ সংসর্গ লাভকারী সাহাবীগণের জামাতকে নির্দিষ্ট করে থাকেন। অথচ এটা মোহাদ্দেছীনের জামাতের পরিপন্থী। তাঁদের মতে সোহবত শব্দের ব্যবহার সংক্ষিপ্ততম সময়ের দর্শন ও সাক্ষাতের ক্ষেত্রেও হতে পারে।

নবী করীম স. এর উম্মতের মর্যাদা ও বিশেষত্ব সাধারণতঃ বেশুমার। এ সম্পর্কে অনেক হাদীছ ও আছার বর্ণিত হয়েছে। তবে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মর্যাদা এটাই যে, তাঁরা মোহাম্মদ স. এর উম্মত। নবী করীম স. যেমন আখেরী জামানার নবী, খাতেমুন্নাবিয়্যীন, সকল নবীর ফাযায়েল ও কামালাত একককভাবে যেমন তাঁর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে, সুন্দরতম চরিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর সমাহার ঘটেছে, তেমনি তাঁর উম্মতও খাতেমুল উমাম। দ্বীন ও নেয়ামতের পূর্ণতায় বিশেষিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা ফরমান, 'আজ আমি তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আর তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সমাপ্ত করে দিয়েছি।' হজরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, নবী মুসা একদা আল্লাহ্তায়ালার কাছে নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভু! আমার উম্মতের মতো আর কোনো উম্মত আছে কি? যাদের উপর তুমি মেঘ খণ্ড দ্বারা ছায়া দান করেছো, আকাশ থেকে মান্না সালওয়া নাযিল করেছো।

আল্লাহ্তায়ালা বললেন, হে মুসা! তুমিতো উম্মতে মোহাম্মদীর ফযীলত সম্পর্কে জানো না। সমস্ত মাখলুকাতের উপর আমার যতটুকু অনুগ্রহ, ঠিক তার সমপরিমাণ অনুগ্রহ সেই উম্মতের উপর। হজরত মুসা আ. আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দাও। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, তুমি তাদের দেখা পাবে না। যেহেতু তারা শেষ যুগের উম্মত হয়ে দুনিয়াতে আসবে। তবে হাঁ, তোমাকে আমি তাদের কালাম শোনাতে পারি। আল্লাহ্তায়ালা উম্মতে মোহাম্মদীকে ডাক দিলেন। সকল উম্মত সমস্বরে জওয়াব দিল, হে আল্লাহ্। আমরা হাজির, আমরা হাজির। অথচ ওই সময় তারা সকলেই পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের পৃষ্ঠে এবং মাতা-মাতামহ, প্রমাতামহের রেহেমের মধ্যে ছিলো। আল্লাহ্তায়ালা উম্মতে মোহাম্মদী সম্পর্কে এরশাদ করলেন, তোমাদের ব্যাপারে আমার রহমত আমার গযবের উপর অগ্রগামী, আর ক্ষমা অগ্রগামী আযাবের উপর। তোমরা দোয়া করার আগেই আমি কবুল করে নেবো। কেউ লা–ইলাহা ইল্লাল্লহ মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সাক্ষ্য দিলে আমি তার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেবো।' রসুল করীম স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আমার উপরে যখন তাঁর নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ চাইলেন, তখন এরশাদ করলেন, হে মোহাম্মদ! আপনি যখন ভূতচতুষ্টয়ের মধ্যে ছিলেন, তখন আমি আপনার নূরকে ডাক দিয়েছিলাম। আপনার উম্মতকেও ডাক দিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিলো, আপনার উম্মতের কথা মুসাকে শোনাবো। তখন আপনি তুর পাহাড়ে ছিলেন না। এই হাদীছ হজরত কাতাদা রা.ও বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনার মধ্যে অতিরিক্ত রয়েছে 'তখন মুসা বললেন, হে আমার রব! আশ্চর্য তো! উম্মতে মোহাম্মদীর কণ্ঠ এতো সুন্দর। এতো আকর্ষণীয়? হে পরওয়ারদেগার! আমাকে তাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়ে দাও।' হজরত আবু নাঈম হুলিয়া নামক কিতাবে পুনরায় হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা নবী মুসাকে ওহীর মাধ্যমে জানালেন, এ মুহূর্তে কেউ যদি আহমদকে অস্বীকারকারী হয়, তাহলে তাকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবো।'

মুসা বললেন, আহমদ কে?

আল্লাহ্তায়ালা বললেন, আহমদ ওই মহান ব্যক্তি, যিনি আমার সর্বাধিক নৈকট্যভাজন। আসমান যমীন সৃষ্টির পূর্বেই আমি তাঁর নাম আমার নামের পাশে আরশে লিপিবদ্ধ করেছি। আমার তামাম মাখলুকের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা হারাম, যতক্ষণ না তিনি এবং তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই হাদীছ দ্বারা

বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়, রসুলেপাক স. এর উম্মত তাঁর অনুসরণের কারণে অন্য সকল আম্বিয়া কেরামের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

যে অতিথিপ্রিয় হন, তাঁর সঙ্গীগণও তো প্রিয়পাত্রই হয়ে থাকে। তবে হাদীছ শরীফে 'তামাম মাখলুক' কথাটি আছে, তার অর্থ নবীগণ ছাড়া অন্য সকল মানুষ। কেনোনা কোনো উম্মত নবীর ঊর্ধ্বে যেতে পারে না বা তাঁর সমপর্যায়েও আসতে পারে না। এরূপ নয়। কক্ষণো নয়। সাধারণ মানুষ কেনো! কোনো ওলীও নবীর মর্যাদা লাভ করতে পারে না।

নবী মুসা জিজ্ঞেস করলেন, উম্মতে মোহাম্মদী কী রকম। তাদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ কীরূপ? আল্লাহ্তায়ালা তাঁর ও তাঁর উম্মতের গুণাবলী উল্লেখ করলেন।

রসুল মুসা নিবেদন করলেন, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে দয়া করে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দিন। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করলেন, কোনো উম্মতের জন্য নবী সেই কাওম থেকেই হয়।

রসুল মুসা বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তাহলে আমাকে সেই নবীর উম্মত বানিয়ে দিন। হজরত ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্তায়ালা হজরত শুয়াইয়া আ. এর নিকট ওহী পাঠিয়ে বললেন, আমি উম্মী নবীকে দুনিয়াতে প্রেরণ করবো, যে নবী দুনিয়াতে এসে বধির কান, অন্ধ চোখ এবং ওই অন্তরসমূহ যা ঔদাসিন্যের পর্দায় ঢাকা পড়েছে, সেগুলোকে খুলে দিবেন। তাঁর জন্মস্থান হবে মক্কা মুকাররমা এবং তাঁর হিজরতের জায়গা হবে মদীনা মুনাওয়ারা। আর তাঁর রাজ্য হবে শাম।

রসুলেপাক স. এর উম্মতের গুণাবলী সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা এমনও বলেছেন, আমি তাঁর উম্মতকে সমস্ত উম্মতের চেয়ে উত্তম বানাবো। তারা ভালো কাজের আদেশ করবে, আর মন্দ কাজের প্রতিবন্ধক হবে। আমার এককত্বকে স্বীকার করবে, আমার উপর ইমান আনবে। তারা আমার নির্ভেজাল ইবাদত করবে। আমি অন্যান্য নবীগণের উপর যা নাযিল করেছি, তার সমস্তকেই তারা প্রত্যয়ন করবে। চন্দ্র ও সূর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখবে অর্থাৎ ইবাদতের সময় সম্পর্কে সচেতন হবে। খোশনসীব ওই অন্তর, চেহারা ও আত্মা, যারা আমার সাথে এখলাসের সম্পর্ক করবে। তাদের প্রতিটি মজলিশ, শয্যা, সফর, অবস্থান, চলমানতা ও স্থিরতা– সর্বাবস্থায় আমার তসবীহ, তকবীর, তাহমীদ ও তৌহিদকে তাদের জন্য আমি সহজ করে দেবো। অবলীলাক্রমে সর্বাবস্থায় তারা এগুলো চালিয়ে যাবে। ফেরেশতাদের সারির ন্যায় মসজিদে তারা সারিবদ্ধ হবে। ফেরেশতারা আছে আমার আরশের আশেপাশে, আর তারা হচ্ছে আমার প্রিয়পাত্র এবং আমার দ্বীনের সাহায্যকারী। আমি তাদের মাধ্যমে আমার উপাসনালয়কে মূর্তিপূজারী দুশমনদের থেকে মুক্ত করবো। তারা আমার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়ে, উপবিষ্ট হয়ে, রুকু

সেজদার সাথে নামাজ আদায় করবে। তারা এমন হবে যে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আপন ঘরবাড়ি ও মাল দৌলত রেখে বেরিয়ে আসবে। তারা আমার রাস্তায় জেহাদ করবে। আমি তাদের কিতাব অর্থাৎ কোরআনের মাধ্যমে সকল কিতাবকে, তাদের শরীয়তের মাধ্যমে সকল শরীয়তকে এবং তাদের দ্বীনের মাধ্যমে সকল দ্বীনকে সমাপ্ত করে দেবো। তাদের জামানা পাওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ তাদের কিতাবের উপর ইমান না আনে এবং তাদের দ্বীন ও শরীয়তকে না মানে, তারা আমার প্রিয়পাত্র থাকবে না। আমি তাদের উপর অসন্তুষ্ট।

আমি তাদেরকে সকল উম্মতের চেয়ে উত্তম উম্মত এবং উম্মতে ওসাতা বানিয়েছি। তারা কিয়ামতের দিন সকল উম্মতের সাক্ষী হবে। তাদের স্বভাব হবে এরকম— রাগান্বিত হলে আমার তাহলীল অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ধ্বনি দিবে। যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হলে আমার তসবীহ পাঠ করবে, আমার পবিত্রতা বর্ণনা করবে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী বলবে। মুখমণ্ডল ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পবিত্র রাখবে। টাখনুর উপর ইযার পরিধান করবে। প্রতিটি চড়াই উৎরাই কালে আল্লাহু আকবার বলবে। রক্ত প্রবাহিত করে কোরবানী করবে। তাদের কিতাব তাদের সীনায় থাকবে। রাতের বেলায় তারা আবেদ, আর দিনের বেলায় সিংহতুল্য বীরযোদ্ধা। তারা কতই না ভাগ্যবান, যারা উক্ত উম্মতের সঙ্গে থাকবে। তাদের মাযহাব ও রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এসব তো আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করি। আমি মহান করুণাময় আল্লাহ্তায়ালা। –এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম।

ইবাদতের ক্ষেত্রে উম্মতে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য

অতীতের আসমানী কিতাবসমূহে যে সকল ফযীলত ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব এই উম্মতে মরহুমার জন্য নির্ধারিত। কাজেই উক্ত গুণাবলী অর্জনের জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কেনোনা উত্তম ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তো এটাই। আর এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই উম্মতের প্রথম সারির লোক অর্থাৎ সাহাবা কেরাম ও তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ উক্ত গুণাবলীর চরম শিখরে ছিলেন।

উম্মতে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালা তাদের জন্য গনিমতের মাল হালাল করে দিয়েছেন। পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের বেলায় তা হালাল ছিলো না। পৃথিবীর সমগ্র ভূখণ্ডকে তাদের জন্য মসজিদ বা নামাজের উপযোগী বনিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা যেখানে ইচ্ছে সেখানেই নামাজ আদায় করতে পারবে। মৃত্তিকাকে পবিত্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে। পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দেয়া হয়েছে। পানি না পাওয়া বা পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হওয়া অবস্থায় মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে দেহ পবিত্র করতে পারবে। রসুলেপাক স. এর বৈশিষ্ট্যের আলোচনাতেও এরূপ

বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই উম্মতও তাঁর সঙ্গে ওই সমস্ত গুণাবলী ও বিধানের অংশীদার। কোনো কোনো আলেম অজুকেও এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিগণিত করে থাকেন। তাঁদের দলীল এই হাদীছখানা, অজুর আলামতের দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চমকিত থাকবে। এমতাবস্থায় আমার উম্মতকে কিয়ামতের ময়দানে ওঠার জন্য ডাক দেয়া হবে।

এর হাকীকত এমনও হতে পারে, অজুর পুরস্কার উম্মতে মোহাম্মদীর জন্যই নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। অন্য কেউ তা পাবে না। ফতহুল বারী কিতাবে হজরত সারা রা. এর ঘটনা বর্ণনান্তে উল্লেখ করা হয়েছে–

অত্যাচারী কাফের বাদশাহ্ নমরুদ যখন বিবি সারাকে বন্দী করতে চাইলো, তখন তিনি অজু করে নামাজে মশগুল হয়েছিলেন। জুরায়হ রাহেব এর কিসসার মধ্যে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে, তখন তিনি অজু করে নামাজ পড়েছিলেন এবং আশপাশের বাচ্চাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। তাহলে দেখা যায়, অজু কেবল এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য নয়। অজু পূর্বেও ছিলো।

এই উম্মতের বিশেষত্ব হচ্ছে, অজুর কারণে অঙ্গের ঔজ্জ্বল্য এবং নূরানিয়াত। মুসলিম শরীফে হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, ললাটের ঔজ্জ্বল্য তোমরা ছাড়া অন্য কেউ পাবে না। উম্মতে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। অতীতের উম্মতসমূহের নামাজ ছিলো চার ওয়াক্ত। এশার নামাজ কোনো উম্মতেরই ছিলো না। সর্বপ্রথম আমাদের নবী স. এশার নামাজ আদায় করেছিলেন। হাদীছ শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, এশার নামাজ রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করো। কেনোনা অতীতের উম্মতগণের নামাজসমূহের উপর তোমাদেরকে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া আযান, একামত এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলা– এগুলোও উম্মতে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো উম্মতের উপর এসবের হুকুম অবতীর্ণ হয়নি।

হজরত সুলায়মান আ. অবশ্য স্বতন্ত্র। কেনোনা তিনি সাবা সম্প্রদায়ের রাণী বিলকিসের নিকট লিখিত পত্র বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম দ্বারা আরম্ভ করেছিলেন। আমীন বলাও উম্মতে মোহাম্মদীর একটি বৈশিষ্ট্য।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, ইহুদীরা আমাদের প্রতি অন্য কোনোকিছুর কারণে এত বেশী হিংসা করে না, যত বেশী হিংসা করে জুমার নামাজের জন্য। আল্লাহ্তায়ালা আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন। তদ্রূপ ইমামের পিছনে আমীন বলাকেও তারা হিংসা করে।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যের আরেকটি দিক হচ্ছে, নামাজের মধ্যে রুকু করা। হজরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সর্বপ্রথম আমরা রুকু করেছি আসরের নামাজে। আমরা তখন রসুল করীম স. এর কাছে নিবেদন করেছিলাম, এ রুকুটি কী– এরকম তো আপনি আগে করেননি। তিনি স. বললেন, এটা করার জন্য আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে। এই হাদীছ থেকে বুঝা যায়, আমাদের ধর্মেও প্রাথমিক অবস্থায় রুকুর প্রচলন ছিলো না। পরবর্তীতে এর হুকুম হয়েছে। অবশ্য কোরআন মজীদে এক জায়গায় আছে 'হে মরিয়ম! আপন প্রভুর আনুগত্য করো, আর রুকু ও সেজদা করো। এই আয়াতে বুঝা যায়, পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও রুকুর বিধান ছিলো। উত্তর এই যে, এখানে কুনুত, রুকু ও সেজদা এসব কিছুকে দায়েমী কুনুত বা নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য বুঝতে হবে। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'ওই ব্যক্তি, যে অহর্নিশি সেজদারত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্য করে।' এখানে কুনুত অর্থ আনুগত্য, কিয়াম এবং খুশু বা একাগ্রতা। সেজদার অর্থ নামাজ। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'সেজদার পরে' অর্থাৎ নামাজের পরে। রুকুর অর্থ একাগ্রতা ও বিনয়। আয়াতের মধ্যে রুকুর পূর্বে সেজদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এদ্বারাও বুঝা যায় এই রুকুর অর্থ নামাজের রুকু নয়, বরং একাগ্রতা ও বিনয়– প্রকাশ্য অর্থে রুকু নয়। কেনোনা নামাজের মধ্যে রুকুর পূর্বে সেজদা দেয়ার বিধান নেই। উল্লিখিত তাওজীহ ও হজরত আলী রা. এর বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর রুকু করার বিধান ছিলো না। নামাজে ও যুদ্ধক্ষেত্রে এই উম্মত সারিবদ্ধ হলে ঐরূপ মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করে, যেরূপ ফেরেশতাবৃন্দ সারিবদ্ধভাবে আল্লাহ্তায়ালার হুকুম তামীল করে নৈকট্য লাভ করেন। এটাও এই উম্মতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অধিকন্তু যদি এরূপ বলা হয়, নামাজের জামাতও এই উম্মতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, তবে আল্লাহ্তায়ালা এ ব্যাপারে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

এই উম্মতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাহিয়া বা সালাম। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে সালামের কথা রয়েছে। অবশ্য হাদীছে উল্লিখিত শব্দের জাহেরী অর্থ নামাজান্তে সালাম ফিরানো। তবে তাহিয়া ও সালাম শব্দের বাহ্যিক অর্থ, সাক্ষাতের সময় পরস্পরে সালাম বিনিময় করা।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যের আরেকটি দিক হচ্ছে জুমার নামাজ। জুমার নামাজ অন্য কোনো উম্মতের উপর আরোপিত ছিলো না। যেমন, হাদীছ শরীফে এসেছে, জুমার দিন, উম্মতে মোহাম্মদীর ওই দিন, যেই দিনটি আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে অনুগ্রহ করে দিয়েছেন। সুতরাং এ দিনে আমি আল্লাহ্ তাদের জন্য, আর অনুগৃহীত মানুষেরাও আমার জন্য। ইহুদীরা এই দিন উদযাপন করে শনিবারে। আর নামাজ উদযাপন করে রবিবারে।

উম্মতে মোহাম্মদীর আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, জুমার দিন তাদের জন্য আল্লাহ্তায়ালার দেয়া একটি বিশেষ মুহূর্ত থাকে, যে মুহূর্তে আল্লাহ্তায়ালার কাছে বান্দা প্রার্থনা করলে, তিনি কবুল করেন। বর্ণনাটি সম্পর্কে প্রায় চল্লিশটির মতো মতামত রয়েছে, যেগুলোকে আমি পারস্পরিক সামঞ্জস্যবিধান সাপেক্ষে 'সুফরাতুস সাআদাহ' নামক কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতর দুটি মত এই যে (১) সেই মুহূর্তটি হচ্ছে ইমাম খোতবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে নিয়ে জুমার নামাজ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত। (২) মুহূর্তটি হচ্ছে জুমার দিনের শেষ মুহূর্ত। সাইয়্যেদাতুন্নিসা হজরত ফাতেমা যাহরা রা. এর মত এটাই। উলামা কেরাম বলেন, হজরত ফাতেমা রা. জুমা দিবসের শেষ লগ্ন নির্ধারণ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে একজন খাদেম নিয়োজিত করেছিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

উম্মতে মোহাম্মদীর আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, রমজানুল মোবারকের প্রথম রাতে আল্লাহ্তায়ালা তাদের প্রতি বিশেষ রহমতের নযরে তাকান। আর আল্লাহ্তায়ালা যাদের প্রতি রহমতের নযরে একবার তাকান, তাকে আর কখনও আযাব প্রদান করেন না। ওই সময় তাদের জন্য জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন। রোজাদারদের মুখের গন্ধকে আল্লাহ্তায়ালা মেশক আম্বরের চেয়ে অধিক ভালোবাসেন। রমজানের প্রতিরাত্রে এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট ফেরেশতারা এসতেগফার করতে থাকে। আর এই এসতেগফার রোজাদারের ইফতার গ্রহণ পর্যন্ত চলতে থাকে।

এভাবে শেষরাতে আল্লাহ্তায়ালা সকলকেই ক্ষমা করে দেন। এই রমজান মাসে আল্লাহ্তায়ালা উম্মতকে পাঁচটি বিশেষ অনুগ্রহ করে থাকেন যা পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের ভাগ্যে জোটেনি। হাদীছ শরীফে এসেছে, রোজাদার যখন ইফতার করে, তখন ফেরেশতাগণ তাদের জন্য এসতেগফার করে। দুষ্ট জ্বীনকে এ মাসে শিকলাবদ্ধ করা হয়। এই উম্মতের বিশেষত্বের আরও দিক আছে। যেমন, বিলম্বে সেহরী খাওয়া এবং তাড়াতাড়ি ইফতার করা– এগুলোকে মোস্তাহাব বানানো হয়েছে। রাতের বেলায় সুবেহ সাদেক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করা এবং স্ত্রী সহবাস করাকে মোবাহ করে দেয়া হয়েছে। ইতোপূর্বের উম্মতের বেলায় এসব ছিলো হারাম। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়ও এরকম হারাম ছিলো। পরে এ বিধান রহিত হয়েছে।

এ উম্মতের বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে শবে কদর। ইমাম নববী র. 'শরহে মুহাযযাব' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি হাজার মাস পর্যন্ত আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করেছেন। মুহূর্তের জন্যও তিনি তাঁর তরবারী কোষাবদ্ধ করেননি। একথা শুনে সাহাবা কেরাম আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমরা কি কেউ ওরকম শক্তির অধিকারী হতে পারবো? তখন

আল্লাহ্তায়ালা সুরা কদর নাযিল করে শবে কদরকে এই উম্মতের জন্য হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দিলেন। শবে কদর সম্পর্কে আরও অধিক আলোচনা যথাস্থানে করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

রমজান মাসের রোজা পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরজ ছিলো কিনা সে সম্পর্কে উলামা কেরামের মতভেদ রয়েছে।

আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতিও ফরজ করা হয়েছিলো' এ থেকে এ কথাই স্পষ্ট হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও রমজানের রোজা ফরজ ছিলো। ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে ওমর রা. থেকে মরফু সনদের ভিত্তিতে বর্ণনা করেন, রমজানের রোজা পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরজ ছিলো। এই হাদীছের সনদের মধ্যে একজন রাবী মজহুল রয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা বলি, উক্ত রোজা ছিলো সাধারণ রোজা। সংখ্যা ও সময়ের সাথে সম্পৃক্ত রমজানের যে রোজা, তা নয়। তাহলে কামা দ্বারা যে তশবীহ দেয়া হয়েছে তাও মতলক বা সাধারণ হিসেবেই ধর্তব্য হবে। জমহুরের মতও এরমই।

আমলের দিক দিয়ে উম্মতে মোহাম্মদীর বিশেষত্ব

বিপদাপদের সময় 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন' পড়ার আমলও উম্মতে মোহাম্মদীর একটি অন্যতম বিশেষত্ব। এই দোয়া পাঠ করা আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে কেবল রহমত ও হেদায়েতপ্রাপ্তির কারণ বটে। হজরত সাঈদ ইবনে জুবায়র রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, এই উম্মতের জন্য বিপদের সময় এমন এক নেয়ামত দেয়া হয়েছে, যা কোনো নবীকেও দেয়া হয়নি। সে নেয়ামতটি হচ্ছে বিপদের সময় উক্ত দোয়া পাঠ করা।

এই নেয়ামত যদি কোনো নবীকে দান করা হতো, তবে তা অবশ্যই হজরত ইয়াকুব আ. কে দান করা হতো। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন 'ওহে! আক্ষেপ ইউসুফের উপর!' বান্দা মিসকীন (শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, উক্ত হাদীছ দ্বারা দৃশ্যতঃ আম্বিয়া কেরামের উপর উম্মতে মোহাম্মদীর প্রাধান্য বুঝা যায়। কিন্তু আসল ব্যাপার সেরকম নয়। হজরত ইয়াকুব আ.কে ইন্না লিল্লাহ অবশ্য দান করা হয়নি। কিন্তু তার সম অর্থবোধক বাণী তাঁকে দান করা হয়েছিলো। 'ইয়া ইউসুফ' বলে যখন তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন, তখন তাঁকে দান করা হয়েছিলো 'এখন সুন্দর ধৈর্যই কাজ, আর আল্লাহ্তায়ালাই হচ্ছেন সাহায্যকারী।' এক্ষেত্রে যদি এরূপ বলা হয় যে, "ইন্না লিল্লাহ" নামক যে নেয়ামত এ উম্মতকে দান করা হয়েছে, এরকম নেয়ামত আর কোনো উম্মতকেই দান করা

হয়নি, তাহলে উত্তম হয়। এক্ষেত্রে একটি কথা স্পষ্টভাবে জানা থাকা উচিত যে, এই উম্মতের বিশেষত্ব পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায়। নবীগণের তুলনায় নয়।

উম্মতে মোহাম্মদীর বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালা মেহেরবানি করে এই উম্মতের উপর থেকে ইসর ও আগলাল নামক শাস্তিদ্বয় উঠিয়ে দিয়েছেন। ইসর এর আলিফে যদি যের দিয়ে পড়া হয়, তবে তার অর্থ দাঁড়ায় অঙ্গীকার, ভার, গোনাহ্। আর যদি আলিফে যবর দিয়ে পড়া হয়, তবে অর্থ হবে ভঙ্গ করা, বন্ধ করা, প্রতিহত করা। আর আগলাল এর অর্থ হিংসা রাখা, গনিমতের মধ্যে খেয়ানত করা। মোটকথা শাস্তি দু'টি উঠিয়ে দেয়ার ভাবার্থ হচ্ছে শাস্তিকে লঘু করা, কষ্ট দূর করা, যা অতীতের উম্মতের বেলায় ছিলো। যেমন স্বেচ্ছায় হত্যা বা ভুলক্রমে হত্যার মধ্যে কেসাস নির্ধারণ করা। অন্যায়কারীর অঙ্গ কেটে দেয়া। কোনো অঙ্গে নাপাকী লাগলে তা কেটে ফেলে দেয়া, তওবার ক্ষেত্রে আত্মাহুতি দেয়া। এজাতীয় কঠিন শাস্তি ছিলো পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্য। কিন্তু এই উম্মতের খাতিরে তা রহিত করে দেয়া হয়েছে।

বনী ইসরাইলদের বিধান ছিলো, রাতের অন্ধকারে কেউ গোনাহ্র কাজ করলে পরদিন সকালে তার ঘরের দরজায় লেখা থাকতো, সে এই গোনাহ্ করেছে এবং এর শাস্তি ছিলো দুই চোখ উপড়িয়ে ফেলা। তাই করা হতো। এই উম্মতের বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালা অন্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের দায়িত্বভার লঘু করে দিয়েছেন। এদের ধর্মে কঠোরতা রাখা হয়নি। দ্বীন পালনকে সহজসাধ্য করে দেয়া হয়েছে। যেমন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে না পারলে বসে পড়লেও চলবে। সফরে রোজা ভঙ্গ করা এবং ফরজ নামাজে কসর করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তওবার দরজা রয়েছে তাদের জন্য। হককুল্লাহ্র ত্রুটির ক্ষেত্রে কাফফারা এবং হক্কুল এবাদের ত্রুটির ক্ষেত্রে দিয়ত ও যেমান আদায় করাকে বিধানসম্মত করা হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, বনী ইসরাইলের উপর যে সকল কঠোরতা ছিলো, এই উম্মতের উপর থেকে তা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যের আরেকটি দিক হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালা তাদের উপর থেকে ভুল করা, বিস্মৃত হওয়া এবং গোনাহ্তে লিপ্ত হতে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু বনী ইসরাইলের অবস্থা ছিলো, নির্দেশিত কাজ করতে ভুলে গেলে অথবা তা আদায় করার ক্ষেত্রে ভুল করলে অতি তাড়াতাড়ি তাদের উপর আযাব নাযিল হতো এবং তাদের গোনাহ্র প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুসারে খাদ্যবস্তু থেকে কিছু অংশ তাদের জন্য হারাম করে দেয়া হতো। নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা আমার উম্মতের উপর থেকে খাতা, নিসইয়ান এবং মজবুরীর আমলের পাপ উঠিয়ে দিয়েছেন। খাতা ও নিসইয়ানের মধ্যে পার্থক্য এই যে,

নিসইয়ান হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে কোনো জিনিস ভুলে যাওয়া। যেমন কোনো রোজাদার ভুলবশতঃ পানাহার করে ফেললো। আর খাতা হচ্ছে, রোজার কথা রোজাদারের স্মরণে আছে, কিন্তু কুলি করার সময় অসাবধানতাবশতঃ কণ্ঠনালীতে পানি প্রবেশ করলো। আর মজবুরীর আমল হচ্ছে, বলপ্রয়োগ করে কাউকে গোনাহ্‌র কাজে লিপ্ত করে দেয়া।

যেমন, কোনো জালেম কাউকে বললো 'কুফুরী কথা উচ্চারণ করো, নইলে হত্যা করবো।' এমতাবস্থায় কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করলে ক্ষতি হবে না। আল্লাহ্‌পাক এ ব্যাপারে তাকে পাকড়াও করবেন না।

এখন আলোচনায় আসা যাক, হাদীছে নফল (মনের কথা) অর্থাৎ মনের ভিতর যে সকল খেয়াল চিন্তা ও ওয়াসওয়াসার উদয় হয় সে সম্পর্কে। এর কয়েকটি অবস্থা আছে।

১. নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই মনে যে সমস্ত চিন্তা খেয়াল হয় তাকে হাজেস বলা হয়।

২. উক্ত খেয়ালকে লালন করলে বা উৎসাহিত করলে তাকে বলা হয় খাতের। এরপর হচ্ছে কসদ ও এরাদার স্তর। করা না করার স্বাধীনতা।

বান্দার অন্তরস্থিত ব্যাপার ক্ষমাযোগ্য। বরং এরাদা হওয়া সত্ত্বেও যদি উক্ত গোনাহ্‌টি না করে, তবে তার জন্য একটি নেকী লিখে দেয়া হয়।

এরপর হচ্ছে আযম ও তাহিয়ার স্তর। অর্থাৎ গোনাহ্‌র খেয়াল, আগ্রহ ও ইচ্ছা কার্যকর করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলো, কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা প্রতিকূল হওয়ায় গোনাহ্‌র কাজটি করা যাচ্ছে না। এ অবস্থার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে পাকড়াও করবেন। কেনোনা এ অবস্থাটি অন্তরের স্থিরসিদ্ধান্ত। (উক্ত অবস্থায় অন্তর থেকে আল্লাহ্‌তায়ালাকে সরিয়ে দিয়ে গোনাহ্‌কে দৃঢ় স্থান দেয়া হয়েছে। তাই এর জন্য তাকে পাকড়াও হতে হবে)।–অনুবাদক।

আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'তোমাদের হৃদয়ে যা রয়েছে তা প্রকাশ করো আর গোপন রাখো আল্লাহ্‌তায়ালা এ ব্যাপারে তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।' তবে ব্যভিচারের স্থিরসংকল্প কিন্তু ব্যভিচারতুল্য নয়। ব্যভিচার করলে যে গোনাহ্ হয়, সংকল্প করলে সেরকম হবে না। হাঁ ব্যভিচারের সংকল্প এমন একটি গোপন গোনাহ্ যার জন্য অন্যান্য গোপন গোনাহ্‌র মতো পাকড়াও হওয়াও সম্ভব। উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য সবচেয়ে পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, খাইরুল উমাম (শ্রেষ্ঠ উম্মত) হওয়ার মর্যাদা লাভ করা। কেনোনা এই উম্মতের শরীয়ত পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়তের চেয়ে সর্বাধিক পরিপূর্ণ।

রসুলে আকরম স. সকল উত্তম স্বভাব ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর পূর্ণতা সাধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তাই তাঁর আনীত শরীয়ত ও দ্বীন পূর্ববর্তী সকল দ্বীন ও শরীয়তের চেয়ে অধিকতর পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গতো হবেই।

হজরত মুসা আ. এর শরীয়ত কষ্টসাধ্য ও কঠিন ছিলো। যেমন, কতলে নফস বা তওবার উদ্দেশ্যে প্রাণ সংহার, হালাল বস্তু হারাম করে দেয়া, অপরাধের সাথে সাথে শাস্তি পাওয়া, অঙ্গীকার গ্রহণ, দুর্বিষহ দায়িত্বভার চাপিয়ে দেয়া এবং আল্লাহ্‌তায়ালার কহর ও পরাক্রমশীলতার বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি। ভীতিপ্রদ, ভয়াবহ ও রাগান্বিত হাল এবং শাস্তির জন্য সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করার দিক দিয়ে হজরত মুসা সা. এর চেয়ে কঠিন কেউ ছিলেন না। মানুষ তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারতো না। বর্ণিত আছে, যেদিন হজরত মুসা আ. কালামে এলাহী ও তাজাল্লী দ্বারা ধন্য হয়েছিলেন, সেদিন থেকে তিনি চাদরে মুখ ঢেকে রাস্তায় বের হতেন। স্থায়ী রোষোত্তপ্ততা থেকে মানুষ যেনো বিচলিত না হয়, এজন্য তিনি একাজটি করতেন। তাঁর উম্মতের লোকগুলোও ছিলো দূরন্ত এবং কর্কশ প্রকৃতির। সহজে সংশোধিত হওয়ার লোক তারা ছিলো না। সে দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'অতঃপর উহার পর তোমাদের হৃদয় পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেলো, এমনকি তার চেয়েও কঠিন।' এদিকে হজরত ঈসা আ. এর শরীয়ত ছিলো দয়া, মেহেরবানি, নম্রতা ও বিনয়ে ভরপুর। যুদ্ধ বিগ্রহের বিধান ছিলো না। নাসারাদের ধর্মে যুদ্ধ করা হারাম ছিলো। কেউ যুদ্ধ করলে সে হতো নাফরমান ও গোনাহ্‌গার। তাই হজরত ঈসা আ. এর উম্মতের লোকেরা সাধারণতঃ মোলায়েম প্রকৃতির ও নরম স্বভাবের ছিলো। তাদের উপর কঠিন বিধান আরোপ করা হয়নি। বরং ইঞ্জীল কিতাবে তাদের প্রতি এরূপ নির্দেশ রয়েছে যে, 'কেউ যদি তোমাদের ডান গালে একটি চপেটাঘাত করে, তাহলে বাম গালটিও তার সামনে এগিয়ে দাও। কেউ যদি কাপড়ের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে এবং তোমাদের পরিধেয় বস্ত্র খুলে নিতে চায় তাহলে পরিধেয় বস্ত্রের সাথে সাথে চাদর খানাও তাকে দিয়ে দাও। কেউ এক মাইল পথ নিতে চাইলে তার সাহায্যার্থে তুমি দুই মাইল যাও।"

ধর্মে তারা রুহবানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদের আবির্ভাব ঘটিয়েছে। এটা বেদাত। এটা তাদের স্বসৃষ্ট মতবাদ বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের জন্য ইঞ্জীল কিতাবে যা লিখেছেন এবং ওয়াজিব করেছেন,– 'তাদের বৈরাগ্যবাদ তারা নিজেরাই আবিষ্কার করেছে, আমি তাদের উপর এসব ফরজ করিনি।' হজরত ঈসা আ. এর মধ্যে ছিলো খালেস জামালের হাল। লূতফ এবং এহসানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো তার মধ্যে।

হজরত মুসা আ. ছিলেন বিপরীত স্বভাবের। তাঁর মধ্যে জালাল, পরাক্রান্তি ও ভয়াবহতা ছিলো। কিন্তু আমাদের নবী করীম স. এর মধ্যে ছিলো কামাল, জামাল এবং জালাল, এই ত্রিবিধ গুণের সমন্বয়।

শক্তি, ন্যায়পরায়ণতা, কঠোরতা, নম্রতা, দয়া ও মেহেরবাণী এ ধরনের যাবতীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তিনি স.। তাঁর শরীয়ত অন্যান্য সমস্ত শরীয়তের তুলনায় আকমাল। তাঁর উম্মত অন্যান্য উম্মতের চেয়ে আকমাল। তাঁর হাল এবং মাকামও তদ্রূপ আকমাল বা অধিকতর পূর্ণ। কাজেই তাঁর শরীয়ত হচ্ছে মধ্যবর্তীতামণ্ডিত, ভারসাম্যময় এবং পূর্ণাঙ্গ।

তাঁর শরীয়তের বিধানগুলো এতো আকর্ষণীয় যে, কোনো বিষয় ফরজ, কোনো বিষয় ওয়াজিব, কোনোটি মনছুব বা জায়েয, আবার কোনোটি মোস্তাহাব। কঠোরতার স্থলে কঠোর বিধান, নম্রতার স্থলে বিনম্রতা। কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় তরবারী চালনার বিধান, আবার কোনো ক্ষেত্রে দানশীলতার অনুপম দৃশ্য। কোনোস্থানে দেখা যায় আদল ইনসাফের বহিঃপ্রকাশ। কোথাও আবার পরিলক্ষিত হয় ফজল ও মেহেরবানির বারিবর্ষণ। একসময় একটি অন্যায়ের বিনিময়ে সমপরিমাণ শাস্তির বিধান দেয়া হয়ে থাকে। আদল ও ইনসাফের মাধ্যমে কাজ করা হয়। আবার আরেক সময় মাফ করে দিলে এবং সংশোধন করে দিলে তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার কাছে। এর মাধ্যমে ক্ষমার দিকে উৎসাহিত করা হয়। শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে জুলুমের আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য হুঁশিয়ার করে বলা হয়, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা যুলুমকারীদেরকে ভালোবাসেন না।'

এ জাতীয় বাণীর মাধ্যমে যুলুমকে হারাম করে দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে 'কেউ তোমাদেরকে শাস্তি দিলে তাদের দেয়া শাস্তির পরিমাণে তাদেরকে শাস্তি দাও।' এজাতীয় বাণীর মাধ্যমে আদল ও ইনসাফকে ওয়াজিব করা হয়েছে, আবার যুলুমকেও হারাম করা হয়েছে। 'তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যধারীদের জন্য তা অবশ্যই কল্যাণকর।'

এই বাণীর মাধ্যমে দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এই উম্মতের জন্য যাবতীয় ক্ষতিকর ও মন্দ জিনিসকে হারাম করে দেয়া হয়েছে। যাবতীয় পছন্দনীয় ও উপকারী কাজকে মোবাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই হারাম করে দেয়া উম্মতের জন্য বিশেষ রহমতস্বরূপ। কেনোনা অতীতে এ জাতীয় কাজের জন্যই আল্লাহ্তায়ালার আযাব নেমে এসেছিলো।

এ মর্মে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহ্তায়ালা তোমাদিগকে বেছে নিয়েছেন, রক্ষা করেছেন এবং ধর্মের মধ্যে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।' উম্মতে মোহাম্মদী স. কে আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত উম্মতের উপর সাক্ষী বানিয়েছেন এবং নবীগণের স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন। কেনোনা নবীগণ সকলেই আপন আপন উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষী প্রদান করবেন। এ উম্মতকে 'উত্তম উম্মত যাকে মানুষের

জন্য বের করা হয়েছে' বলে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। সম্মান ও পদমর্যাদার মাধ্যমে তাদেরকে বিশেষিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমত দিয়ে বিশেষিত করেন। তিনিতো মহান অনুগ্রহশীল।'

উম্মতে মোহাম্মদীর আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, কোনো গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার উপর তারা একতাবদ্ধ হবে না। এই হাদীছখানা বহু সনদের মাধ্যমে মশহুর। হাদীছ শরীফে এসেছে, নবী করীম স. এরশাদ করেন, আল্লাহ্তায়ালার কাছে আমি প্রার্থনা করলাম, হে আমার রব! আমার উম্মতের সকল লোক যেনো কোনো গোমরাহীর উপর একতাবদ্ধ না হয়। আল্লাহ্তায়ালা আমার প্রার্থনা কবুল করেছেন। অধিকন্তু এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্তায়ালার আরেকটি বিশেষ মেহেরবানি, তাদের এজমা (ঐকমত্য) শরীয়তের একটি দলীল হিসেবে মঞ্জুরী পেয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতগণের এজমা শরীয়তের দলীল হিসেবে স্বীকৃত ছিলো না। এ উম্মতের মধ্যে এখতেলাফ একটি রহমত স্বরূপ, যা অতীত উম্মতের জন্য আযাব ছিলো। হাদীছ শরীফে উক্ত হয়েছে, আমার সাহাবীগণের পারস্পরিক মতানৈক্য তোমাদের জন্য রহমত। আমার উম্মতের পারস্পরিক মতানৈক্য রহমত— এই হাদীছখানাও সর্বজনবিদিত। মুফতী ও আলেম মুজতাহিদগণের বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মীয় মতানৈক্য সুবিদিত ব্যাপার।

উপর্যুক্ত হাদীছের ইঙ্গিত এদিকেই। তাই দেখা যায়, কেউ কোনো বিষয়ে হালাল হওয়ার ফতওয়া দিয়েছেন। আবার অন্যে এটাকে হারাম বলেছেন। অথচ একে অপরের প্রতি দোষারোপ করেননি। কোনো কোনো আলেম আবার উক্ত হাদীছের মর্ম এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, উম্মতের কাজ ও পেশার বিভিন্নতার মধ্যে রহমত রয়েছে। উম্মত বিভিন্ন ধরনের কাজ ও পেশা গ্রহণ করে শিল্প বা সৃজনশীলতার মধ্যে শৃংখলা ও সহজসাধ্যতার উদ্ভব ঘটাবে। তেমনি ফেকাহ শাস্ত্রের মাসআলায় আলেমগণের এখতেলাফের মাধ্যমে রূখসত বা সহজসাধ্য আমল করা এবং আমলের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা পরিহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উম্মতে মোহাম্মদীর আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে, তাউন বা প্লেগ রোগ তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দান করে এবং বিশেষ রহমতের কারণ হয়। অথচ এ রোগটি অন্যান্য উম্মতের জন্য ছিলো আযাব। যেমন হাদীছ শরীফে উক্ত হয়েছে, প্লেগ একটি আযাব যা বনী ইসরাইলের উপর নাযিল হয়েছিলো। অন্য এক বর্ণনায় আছে, প্লেগ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর নাযিল হয়েছিলো আযাবরূপে।

সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, মুসলমানের শহীদী মর্যাদা রয়েছে প্লেগে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, প্লেগ আমার উম্মতের জন্য শহীদী দরোজা এবং এটি তাদের জন্য রহমত। আর কাফেরদের জন্য আযাব।

যেহেতু এ রোগটি মুসলমানদের জন্য রহমত এবং শাহাদত, কাজেই এ থেকে পলায়ন করা মুসলমানদের জন্য ধর্মযুদ্ধ থেকে পলায়ন করা সদৃশ।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এবং হজরত জাবের রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আছে, প্লেগ থেকে পলায়ন করা কবীরা গোনাহ্। এই উম্মতের বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, যখন এ উম্মতের কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে দু'জন লোক সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, লোকটি ভালো ছিলো তখন সে লোকটির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী উম্মতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এরকম ছিলো যে, একশ' লোক ভালো বললে জান্নাত ওয়াজিব হতো।

এ সম্পর্কে হাদীছ শরীফে এসেছে, তোমরা যার সম্পর্কে ভালো বলবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যার সম্পর্কে মন্দ বলবে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ উম্মতের আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, অতীত উম্মতসমূহের তুলনায় এদের আয়ু কম। তাই আমলও কম। ছওয়াব ও পুরস্কার কিন্তু কম নয়। তারা ছওয়াব পায় অত্যধিক।

যেমন সহীহ্ হাদীছ শরীফে এসেছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, তোমাদের কাজের বর্ণনা আর তোমাদের পূর্বের ইহুদী নাসারাদের কাজের বর্ণনার উপমা হচ্ছে, যেমন কোনো লোক সারা দিনের জন্য তিনজন শ্রমিক নিয়োগ করলো। একজনকে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত, আরেকজনকে দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত এবং শেষের জনকে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হলো এবং প্রত্যেকের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হলো এক দেরহাম করে। কাজ শেষে যখন পারিশ্রমিক প্রদানের পালা, তখন শ্রমিক তিনজন বলতে লাগলো, আমাদের কাজের পরিমাণের মধ্যে তারতম্য রয়েছে, অথচ সকলের পারিশ্রমিক সমান, এটা কেমন কথা। তখন লোকটি বললো, কাজের শর্ত মোতাবেক আমি সকলকেই দিয়েছি। বাকীটা আমার অনুগ্রহ। এটা যাকে ইচ্ছা তাকেই প্রদান করবো।

প্রথম শ্রমিক দ্বারা ইহুদী, দ্বিতীয় শ্রমিক দ্বারা নাসারা আর তৃতীয় শ্রমিক দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীকে বুঝানো হয়েছে।

এই উম্মতের আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে, হাদীছ শরীফের সনদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হওয়ার মর্যাদা লাভ করা। কেনোনা নবী করীম স. এর হাদীছের ক্রমধারা বিদ্যমান এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এটা তাদের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ্তায়ালাই এ উম্মতের জন্য এ মর্যাদা ও ফযীলত দান করেছেন।

অতীতের কোনো উম্মত এরকম মর্যাদা পায়নি। পূর্বের সহীফাসমূহ যদিও তাদের মাধ্যমেই মানুষের কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু তারা ওই সহীফার খবরসমূহকে

আত্মচিন্তার সঙ্গে সংমিশ্রিত করে ফেলেছে এবং পরবর্তী লোকেরা সেগুলো অনির্ভরযোগ্য লোকদের কাছে থেকে পেয়েছে।

দুষ্ট লোকেরা তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে এরূপ সুকৌশলে তাদের ভ্রান্ত মতবাদকে সংমিশ্রিত করে দিয়েছে যে, আসল ও নকলের মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ করা দুষ্কর। আর এই উম্মতের লোকেরা নবী করীম স. এর হাদীছ শরীফ এমন নির্ভরযোগ্য লোকদের মাধ্যমে পেয়েছেন, যাঁরা সর্বকালেই সত্যবাদী ও আমানতদার হিসেবে মশহুর ছিলেন। আর তাঁরাও এভাবেই হাদীছ সংগ্রহ করেছেন অন্যের নিকট থেকে। এভাবে রসুলেপাক স. পর্যন্ত এর ক্রমধারা চলে গিয়েছে। সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁরা সীমাহীন যাচাই, বাছাই, পর্যালোচনা ও সত্যান্বেষণে ব্যাপৃত রয়েছেন, যাতে করে মর্যাদার দিক দিয়ে অধিকতর মযবুত ও সুরক্ষিত হাদীছ চিনে নিতে পারেন এবং জাল হাদীছকে বিশুদ্ধ হাদীছ থেকে পৃথক করে নিতে পারেন। বর্ণনাকারীগণের মধ্যে যাঁদের আপন শায়েখের সঙ্গে ওঠা বসা ও সোহবত বেশী ছিলো তাঁদের হাদীছকে ওই বর্ণনাকারীর হাদীছের তুলনায় বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন, যাঁদের আপন শায়খের সঙ্গে উঠাবসা ও সোহবত ছিলো কম। তাছাড়া বিভিন্ন ধারায় যাঁরা হাদীছ পেয়েছেন, তাঁদের হাদীছকেও বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন।

এভাবে তাঁরা হাদীছকে ভুলভ্রান্তির অনুপ্রবেশ থেকে সংরক্ষণ করেছেন। তাঁরা শব্দ ও হরফ পর্যন্ত সংরক্ষণ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। বিশেষ করে সিহাহ্ সেত্তা কিতাবসমূহ। এর মধ্যে বোখারী ও মুসলিম শ্রেষ্ঠত্বের আসন পেয়েছে। এই দুখানি কিতাব আসমানের চন্দ্র সূর্য তুল্য। আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানগণের তরফ থেকে তাঁদেরকে কল্যাণের পুরস্কার প্রদান করুন। এ সকল কিতাব এই উম্মতের জন্য আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ। আবু হাতেম রাযী বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এমন কোনো উলামা ছিলেন না, যাঁরা আপন নবীগণের বাণীসমূহকে সংরক্ষণ করেছেন। এ কাজটি করেছে কেবল আমাদের নবীর উম্মতেরা। ইতিহাস ও বংশধারা পরিচিতির দিক দিয়েও এই উম্মতের বিশেষত্ব রয়েছে।

উলামা কেরাম বলেন, সাহাবা কেরামের মধ্যে হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নসব (বংশধারা) সম্পর্কিত এলেমে সর্বাধিক অগ্রণী ছিলেন। বর্ণিত আছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. সপ্তাহে একদিন কবিতা, ইতিহাস, বংশ ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা এবং আরবের বিভিন্ন কালের আলোচনায় ব্যয় করতেন।

সাইয়েদুনা হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আরব কবিগণের দেওয়ান (কাব্যগ্রন্থ) এবং আরবদের ভাষা রপ্ত করার জন্য ওসিয়ত করতেন, যাতে করে কোরআনুল করীমের তাফসীর ও যথাযথ বিবরণ সহজে বোধগম্য হয়। এই উম্মতের আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, তারা দ্বীনী কিতাবাদি রচনা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ সাহায্য লাভ করে থাকে। হাদীছ

শরীফে বলা হয়েছে, এই উম্মতের মধ্য থেকে একদল লোক কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদাই সত্যকে শক্তিশালী ও বিজয়ী করতে থাকবেন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতে থাকবেন। আর তার মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. এর সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবেন। করনে আউয়াল (সাহাবীগণের যুগ) এবং করনে ছানী (তাবেয়ীগণের যুগ) এর প্রারম্ভে ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন ও রচনার কার্যক্রম শুরু হয়নি। যদিও সে সময় এলমের বিষয় লিপিবদ্ধ করা এবং হাদীছ সংগ্রহ ও একত্রিত করার কাজ জারী ছিলো, তথাপিও এসব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা এবং বিধিবদ্ধভাবে তা তৈরী করার কাজ ছিলো না। ঠিক তদ্রূপ কোনো বিষয়ের আলোচনায় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, ব্যবহারিক ও পরিভাষাগত শব্দের ব্যবহার, বিভিন্ন এলেমের প্রকরণ বিন্যাস, বিষয়বস্তু নির্ধারণ এবং সুলুকের মাসআলার কোনো নিয়ম ছিলো না। পরবর্তী যুগে এ সকল বিষয়ে এতো অধিক চর্চা হয় ও গ্রন্থ রচনার কাজ চালু হয়, যা গণনা করে শেষ করা মুশকিল। এ বিষয়ে সঠিক পরিসংখ্যান কেবল আল্লামুল গুয়ুবের কাছেই রয়েছে। করন বা যুগের সময়সীমা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে তিরিশ বৎসরের সময় সীমাকে করন বলা হয়। কারও মতে বিশ বৎসর, কারও মতে আশি বৎসর, আবার কারও মতে এক শতাব্দীকে করন বলা হয়। তবে এক্ষেত্রে শেষোক্ত কথাটি অধিকতর বিশুদ্ধ, এর দলীল হচ্ছে, রসুলেপাক স. এক শিশুকে এই বলে দোয়া করেছিলেন, তুমি এক করন বেঁচে থেকো। শিশুটি বেঁচে ছিলো একশত বৎসর।

আউলিয়া কেরাম

উম্মতে মোহাম্মদীর আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, এই উম্মতের মধ্যে আকতাব, আওতাদ, নুজাবা এবং আবদাল পয়দা হবেন। সাইয়্যেদুনা হজরত আনাস রা. থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, পৃথিবীতে চল্লিশ জন আবদাল থাকবেন। এই চল্লিশ জন থেকে কোনো একজনের ইনতেকাল হলে আল্লাহ্‌তায়ালা সেস্থানে অন্য একজনকে আবদাল হিসেবে নিযুক্তি দেন। এই হাদীছটি ইবনে খেলাল 'কারামাতুল আউলিয়া' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিবরানী স্বীয় আউসাত নামক গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন এভাবে— পৃথিবী এধরনের চল্লিশ জন আবদাল থেকে কখনও শূন্য হবে না। তাঁরা হজরত ইব্রাহীম খলীল আ. এর বেলায়েতের ন্যায় বেলায়েতধারী হয়ে থাকেন। যমীন তাঁদের সঙ্গে কায়েম থাকে। তাঁদের বরকতে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা বৃষ্টিবর্ষণ করেন। তাঁদের কেউ ইনতেকাল করলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর স্থলে অন্য আবদাল নিয়োজিত করেন। বদল শব্দের বহুবচন আবদাল। একজনের বদলে আরেক জনকে যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা মনোনীত করেন, সেজন্য তাঁদেরকে আবদাল বলা হয়।

আবার কেউ কেউ এই বদল নামকরণ সম্পর্কে বলেন, তাঁরা মানুষের মন্দ স্বভাবসমূহকে প্রশংসনীয় গুণাবলীতে রূপান্তরিত করে দিতে পারেন। তাই তাদেরকে আবদাল আখ্যায়িত করা হয়। তাঁরা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের বাইরে চলে আসেন।

'আবদালগণ হজরত ইব্রাহীম আ. এর বেলায়েতের ন্যায় বেলায়েতধারী হন'— এ কথার অর্থ, হজরত ইব্রাহীম আ. যে সকল বিশেষ কামালিয়াত ও গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, সে সমস্ত থেকে যেকোনো একটি বিশেষ কামালিয়াত ও গুণের অধিকারী তাঁরা হয়ে যান। উক্ত বিশেষ গুণটির ক্ষেত্রে তাঁরা ইব্রাহীম আ. এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। "প্রত্যেক ওলী নবীর পদতলে" মাশায়েখগণের এই উক্তির তাৎপর্য এটাই। নবীর সমস্ত গুণাবলী কোনো ওলীর মধ্যে বিদ্যমান থাকা উদ্দেশ্য নয়। হজরত ইবনে আবী আদ্দী র. 'কামেল' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, চল্লিশজন আবদালের মধ্যে বাইশজন থাকবেন শাম দেশে। আর বাকী আঠারো জন থাকবেন ইরাকে। আল্লাহ্তায়ালার হুকুম যখন হবে, তখন তাঁরা সকলেই ইনতেকাল করবেন এবং তখনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। মসনদে আহমদ কিতাবেও এরকম বর্ণিত আছে। হজরত আবু নাঈম 'হুলিয়া' কিতাবে হজরত ইবনে ওমর থেকে মারফু সনদের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, খয়রি উম্মত বা শ্রেষ্ঠ উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সংখ্যা পাঁচশত। আর আবদালের সংখ্যা চল্লিশ। পাঁচশ' নয়। এই চল্লিশ সংখ্যা কখনও কম হয় না। আবার অধিকও হয় না। এই চল্লিশজনের মধ্য থেকে কারও মৃত্যু হলে তাঁর স্থলে অন্য আরেকজনকে নিযুক্ত করা হয়। তাঁরা সবাই পৃথিবীতেই থাকেন। 'হুলিয়া' কিতাবে আরও বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে চল্লিশ জন লোক এমন হয়ে থাকে যাদের অন্তর থাকে ইব্রাহীম আ. এর অন্তরের সঙ্গে সংযুক্ত। আল্লাহ্তায়ালা তাদের বরকতে সৃষ্টজীবকে বালা মুসিবত থেকে রক্ষা করেন। তাদেরকে আবদাল বলা হয়। এই আবদালগণ রোজা, নামাজ ও দান সদকা দ্বারা এহেন মর্যাদা লাভ করেন না। হজরত ইবনে মাসউদ রা. জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তাঁরা এ মর্যাদা কোন আমলের কারণে পেয়ে থাকেন? রসুলুল্লাহ স. বললেন, মুসলানদের জন্য শুভ কামনা এবং দানশীলতার কারণে তাঁরা এহেন মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। হাদীছের তাৎপর্য এই যে, রোজা, নামাজ, দান খয়রাতের দিক দিয়ে তো তাঁরা অন্যান্য মুসলমানের মতই। তবুও তাঁরা উপরোক্ত দু'টি বিশেষ গুণের অধিকারী। হজরত মারুফ কারখী র. থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি দৈনিক এই দোয়া পড়বে 'হে আল্লাহ্ উম্মতে মোহাম্মদীকে দয়া করো', আল্লাহ্তায়ালা তাকে আবদালগণের তালিকাভুক্ত করে নিবেন। হুলিয়া কিতাবে এই প্রসঙ্গে এই দোয়ার উল্লেখ রয়েছে,

‘হে আল্লাহ্ উম্মতে মোহাম্মদীকে সংশোধন করে দিন, হে আল্লাহ্ উম্মতে মোহাম্মদীকে প্রশস্ত করে দিন। হে আল্লাহ্! উম্মতে মোহাম্মদীর উপর রহম করুন।’ কথিত আছে, আবদালগণের আলামত হচ্ছে, তাঁদের সন্তান-সন্তুতি থাকবে না। তাঁরা কখনো কারো উপর লানত করবেন না। যায়েদ ইবনে হারুন থেকে বর্ণিত হয়েছে, আবদাল আহলে এলেম থেকে হয়ে থাকেন। ইমাম আহমদ র. বলেন, আবদাল মোহাদ্দিছগণের মধ্য থেকে না হলে আর কার মধ্য থেকে হবেন।

আল্লামা খতীব র. তারিখে বাগদাদে উল্লেখ করেছেন, পৃথিবীতে নুকাবা থাকবেন তিনশ’, নুজাবা সত্তর, আবদাল চল্লিশ, আখইয়ার সাত, আমাদ বা আওতাদ চার, গাউছ একজন। নুকাবা থাকেন পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশে, নুজাবার বাসস্থান সাধারণতঃ মিশরে, আবদালের বাসস্থান শামদেশে আর আখইয়ার থাকেন ভ্রাম্যমান। আমাদ বা আওতাদ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকবেন আর গাউছ এর বাসস্থান হয় মুকাররমায়। বিশৃংখলা ব্যাপক হলে তা দূর করার জন্য প্রথম দোয়া করেন নুকাবা। আর প্রয়োজন পূরণের জন্য তিনি অত্যন্ত আজেযী এনকেছারী ও বিনয়ের সাথে দোয়া করতে থাকেন। অতঃপর সে বিষয়ে দোয়া করেন নুজাবা, এরপর আবদাল, এরপর আখইয়ার, এরপর আমাদ বা আওতাদ। তাঁদের দোয়া যদি কুবল হয়ে যায়, তাহলে তো ভালোই, অন্যথায় এ ব্যাপারে দোয়ার জন্য হাত তোলেন গাউছ। তিনি অত্যন্ত আজেযী এনকেছারী ও বিনয়ের সাথে দোয়া করতে শুরু করেন। তিনি এতো বিনয়ের সাথে হাত তোলেন যে, তাঁর প্রার্থনা শেষ হওয়ার পূর্বেই কবুল হয়ে যায়।

কবর ও হাশরের ময়দানে উম্মতে মোহাম্মদীর বিশেষত্ব

এই উম্মতের জন্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা কবরের মধ্যে গোনাহ্ সহকারে প্রবেশ করবে আর বেগোনাহ্ হয়ে কবর থেকে বের হবে। মুসলমানদের এসতেগফারের উসিলায় তাদেরকে গোনাহ্ থেকে পাক সাফ করে দেয়া হবে। ইমাম তিবরানী হাদীছটি হজরত আনাস রা. এর মাধ্যমে আউসাত কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এই হাদীছ দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য বিশেষ ধরনের ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো কোনো আলেম বলেন, হাদীছখানা শায। কবরের আযাব এই উম্মতের জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ্তায়ালা কবরের আযাব দিয়ে তাদেরকে পাক সাফ করে আখেরাতের ময়দানে উপস্থিত করবেন, যাতে অন্য কোনো আযাব আর ভোগ করতে না হয়। এ উম্মতের আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, কিয়ামতের পর হাশরের ময়দানে উপস্থিতির প্রাক্কালে সর্বপ্রথম যমীন বিদীর্ণ করা হবে এই উম্মতের জন্য। এর অর্থ এই, অন্যান্য উম্মতের পূর্বে এ উম্মত কবর

থকে বের হয়ে আসবে। হাদীছ শরীফে এসেছে, সর্বপ্রথম আমার জন্য এবং আমার উম্মতের জন্য যমীন বিদীর্ণ হবে। এই উম্মতের আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, হাশরের ময়দানে তাদেরকে যখন ওঠানো হবে, তখন তাদের অজুর অঙ্গসমূহ গুররে মুহাজ্জাল হবে। গুররা ওই শুভ্রতাকে বলা হয়, যা ঘোড়ার কপালে পরিলক্ষিত হয়। আর ঘোড়ার পায়ে শাদা বর্ণ থাকাকে মুহাজ্জাল বলা হয়। অজুর কারণে উম্মতে মোহাম্মদীর কনুই পর্যন্ত হাত ও টাখনু পর্যন্ত পা খুব বেশী পরিমাণে ধোয়া হয়। তাই এই স্থানগুলো হাশরের দিন উজ্জ্বল শাদা বর্ণের হবে। একারণেই মুহাজ্জাল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর অজুর সময় মাথার অগ্রভাগ, গর্দান ও মুখমণ্ডল মাসেহ ও ধৌত করা হয় বিধায় এক্ষেত্রে গুররা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই উম্মতের আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, হাশরের ময়দানে তারা উঁচুস্থানে অবস্থান করবে।

হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, হাশরের ময়দানে আমি এবং আমার উম্মত উঁচুস্থানে অবস্থান করবো। এমন উন্নত স্থান কেউই পাবে না। অন্যেরা আমাদের দলভুক্ত হওয়ার অভিলাষী হবে। কিয়ামতের দিন সকল নবীর নাফরমান উম্মতেরা তাদের নবীগণের উপর মিথ্যা আরোপ করবে। কিন্তু সেইদিন আমরা তাদের নবীগণের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবো। এ উম্মতের বৈশিষ্ট্যের আরেকটি দিক এই যে, তাদের কপালে সেজদার নিদর্শন পরিলক্ষিত হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'তাদের চেহারায় অর্থাৎ কপালে সেজদার নিদর্শন থাকবে।' এই আয়াতে উক্ত আলামতটি কি দুনিয়ায় না আখেরাতে হবে সে সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে।

১. নিদর্শন দুনিয়াতে হবে অর্থাৎ চারিত্রিক সততা, সদাচরণ এবং বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। কেউ বলেছেন, রাত জেগে ইবাদত করার কারণে এ উম্মতের চেহারায় এক প্রকারের হলুদ বর্ণ প্রকাশ পায়, যা দেখে মানুষেরা রোগগ্রস্ত বলে মনে করে। অথচ লোকটি রোগগ্রস্ত নয়।

২. নিদর্শন প্রকাশ পাবে আখেরাতে। আখেরাতে অজুর স্থানগুলো উজ্জ্বল হবে, যা দেখে সহজেই অনুমিত হবে, লোকটি নামাজী ছিলো।

শাহর ইবনে হাউশাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, উম্মতে মোহাম্মদীর অযুর অঙ্গসমূহ পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো ঝকমক করতে থাকবে। আতা খুরাসানী র. বলেছেন, বর্ণিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে ওই উম্মত, যে পাঞ্জেগানা নামাজ আদায় করবে। এ উম্মতের বিশেষত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে, তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে। ইমাম আহমদ ও বাযযার র. হাদীছখানা বর্ণনা করেছেন। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবেও এরকম উল্লেখ করা হয়েছে। মেশকাত শরীফে ইমাম আহমদ

হজরত আবু দারদা রা. এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. এরশাদ করছেন, আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এভাবে চিনতে পারবো, তাদের অযুর অঙ্গসমূহ জ্বলজ্বল করতে থাকবে আর তাদের আমলনামাগুলো তাদের ডান হাতে থাকবে। আর আমি তাদেরকে এভাবেও চিনতে পারবো যে, তাদের আওলাদ তাদের সামনে দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে।

শায়েখ ইবনে হাজার হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের আমলনামা অন্যান্যদের পূর্বেই তাদের ডান হাতে দিয়ে দেয়া হবে। তাদের আওলাদ তাদের সামনে দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করবে– এটাও উম্মতে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য হওয়া সম্ভব। এই উম্মতের আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, হাশরের ময়দানে তাদের সম্মুখ এবং ডান দিক দিয়ে নূর দৌড়াদৌড়ি করবে। কোরআনুল করীমে এ রকম উক্ত হয়েছে। তাদের বৈশিষ্ট্যের আরেকটি দিক এই যে, তারা স্বয়ং যা আমল করবে তা তো তাদের জন্য কার্যকর হবেই, তাদের উত্তরসুরীরা তাদের জন্য যা করবে, তাও তাদের জন্য কার্যকর হবে। যেমন ইসালে সওয়াব, সদকায়ে জারীয়া এবং এসস্তেগফার ইত্যাদি। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতগণের বেলায় ওই আমলই কেবল তাদের জন্য কার্যকর হতো, তারা নিজেরা যা করতো।

উপর্যুক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইবনে ইকরামা আয়াতে কারীমা– 'মানুষ নিজেরা যে আমলে সচেষ্ট হবে, তাছাড়া অন্য কোনোকিছু তাদের উপকারে আসবে না।' এই আয়াতের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করেছেন। এই আয়াতে কারীমা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজেরা যা আমল করবে, তাছাড়া অন্য কিছু তার উপকারে আসবে না। উক্ত আয়াতের আলোকে উপস্থাপিত দ্বন্দ্বের সমাধানকল্পে উলামা কেরাম কয়েকটি জওয়াব প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, উপরোক্ত আয়াতে কারীমার বিধান 'যারা ইমানদার আর তাদের সন্তানেরা ইমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতাদের সাথে মিলিয়ে দেবো– এই আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে গিয়েছে।

ইসালে সওয়াবের প্রমাণ

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার দ্বারা প্রমাণিত হয়, সন্তান-সন্ততিকে পিতামাতার মীযানের পাল্লায় তোলা হবে। অর্থাৎ তাদের কৃত ছওয়াব রেছানী, এসতেগফার, সদকা ইত্যাদি পিতামাতার মীযানের পাল্লা ভারী করবে। এ সমস্ত আমলে পিতামাতা রূহানী জগতে থেকে আনন্দিত হন। আল্লাহ্তায়ালা পিতামাতার শাফায়াত সন্তান-সন্ততির জন্য এবং সন্তান-সন্ততির শাফায়াত পিতামাতার জন্য কবুল করে থাকেন। এর দলীল আল্লাহ্তায়ালার এই বাণী, 'তোমাদের পিতামাতা এবং সন্তান-সন্ততি– উপকার করার দিক দিয়ে কারা যে তোমাদের অধিকতর

নিকটবর্তী, এ ব্যাপারে তোমরা জানো না।' ইমাম কুরতুবী র. বলেন, বহু সংখ্যক হাদীছ– এ কথাটি প্রমাণ করে যে, মৃত মুমিন ব্যক্তির কাছে অন্যের আমলে সালেহার ছওয়াব পেঁছে থাকে। সহীহ্ নামক কিতাবে আছে, কোনো ব্যক্তির জিম্মায় যদি রোজা থেকে থাকে, তাহলে তার ওলী তার পক্ষ থেকে উক্ত রোজার কাযা আদায় করে দেবে। নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি অপরের পক্ষ থেকে বদলী হজ করার ইচ্ছা করে, তাহলে সে প্রথমে তার নিজের হজ আদায় করে নিবে। তারপর অন্যের বদলী হজ আদায় করবে।

সাইয়্যেদা হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আপন ভাই আবদুর রহমান রা. এর তরফ থেকে এতেকাফ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে গোলাম আযাদ করেছিলেন। হজরত সাআদ ইবনে উবাদা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদা তিনি নবী করীম স. এর কাছে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার মা তো ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি তাঁর তরফ থেকে সদকা দিতে পারি? নবী করীম স. বললেন, পারো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন সদকা সবচেয়ে উত্তম, নবী করীম স., এরশাদ করলেন, মানুষকে পানি দেয়া। এ কথা শুনে হজরত সাআদ ইবনে উবাদা রা. একটি কূপ খনন করে দিয়ে বলেছিলেন, এটা সাআদের মায়ের কূপ। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বকর রা. এর দাদী মান্নত করেছিলেন যে, তিনি খালি পায়ে মসজিদে কোবায় যাবেন। এরপর তাঁর ইনতেকাল হলো। মান্নত পুরো করতে পারলেন না। এতে হজরত ইবনে আব্বাস রা. ফতওয়া দিয়েছিলেন, তাঁর পুত্র তাঁর পবিবর্তে মসজিদে কোবা পর্যন্ত খালি পায়ে যাবেন।

কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, 'লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মাসাআ' এই আয়াতের মধ্যে আল ইনসান দ্বারা আবু জাহেলকে বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, উকবা ইবনে আবী মুঈত এবং ওলীদ ইবনে মুগীরাকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেন, এখানে আল ইনসান দ্বারা জীবিতদেরকে বুঝানো হয়েছে, মৃতদেরকে নয়। এ সম্পর্কে কারও কারও অভিমত এরকম– আমাদের শরীয়ত প্রমাণ করে যে, ইনসানের জন্য তার নিজের আমল এবং অপরের আমল দু'টোই উপকারী হতে পারে।

তাফসীরে কাশশাফ প্রণেতা যমখশরী মুতাযেলী বলেছেন, কোনো ব্যক্তির বেলায় অপরের আমল কোনো উপকার করতে পারে না। তবে হাঁ, তা যদি নিজের আমলের উপর ভিত্তি করে হয় এবং সে যদি নিজে মুমিন হয়, তাহলে অপরের আমল উপকারী হতে পারে, অন্যথায় নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে অপরের বিশেষ আমল নিজের আমলের তাবে বা অনুগামী হয়ে সেটা নিজের আমলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

আরেকটি কথা, অপরের আমল উপকারী হবে না যদি সে আমল তার নিজের জন্য করে। আর তা না করে সে আমল করার সময় যদি অন্যের নিয়তে করে, তাহলে সে আমল শরীয়তের বিধানানুসারে অন্যের আমলের প্রতিনিধি এবং ওকীল হবে। কোরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহে পৌঁছে কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। শাফেয়ী মাযহাবের কতিপয় মশহুর আলেম, মালেকী ও হানাফী মাযহাবের আলেমগণের একটি ক্ষুদ্র দল এই মত পোষণ করেন যে, তা মৃতদের নিকট পৌঁছে না। তবে শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, কোরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে। ইমাম আহমদ র.ও এই মতের পক্ষপাতী। ইমাম আহমদ র. তো এরকমও বলেছেন, মৃত ব্যক্তির নিকট সর্বপ্রকার আমলই পৌঁছে থাকে। সদকা, নামাজ, এতেকাফ, তেলাওয়াত, জিকির। তবে উলামা কেরাম বলে থাকেন, কবরের উপর কোরআন পাঠ করা বেদাআত।

শায়েখ শামসুদ্দীন কুসতুলানী র. বলেছেন, কোরআন করীমের ছওয়াব পৌঁছানো– শুদ্ধ। চাই তা নিকটাত্মীয়ের তরফ থেকে হোক বা অপরের তরফ থেকে, ওয়ারিশদের পক্ষ থেকে হোক বা ওয়ারিশ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে। সদকা, দোয়া ও এস্তেগফার মৃত ব্যক্তির উপকার করতে পারে বলে এজমা রয়েছে, এই ক্ষেত্রেও সেরকমই। ইমাম আবদুল্লাহ ইয়াফয়ী র. রউযুর রাইয়্যাহীন কিতাবে উল্লেখ করেছেন, লোকেরা শায়েখ আযীযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম র. কে স্বপ্নে দেখলো। তিনি বলছেন, আমি তো দুনিয়াতে থাকতে মানুষকে বলতাম, মাইয়্যেতের কাছে কোরআন পাঠের ছওয়াব পৌঁছে না। এখন জানতে পারলাম পৌঁছে। তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করো এবং তার ছওয়াব রেছানী করো। কাযী হুসাইন ফতওয়া দিয়েছেন, মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন তেলাওয়াত করে তার পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ। যেমন আযান দিয়ে এবং কোরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ। কোরআন পাঠের পর সব সময়ই মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা উচিত। কেনোনা তেলাওয়াতের পর যে দোয়াটা করা হয়, তা তেলাওয়াতের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। কোরআন পাঠ করার পর দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী এবং ওই দোয়া অধিক বরকতের কারণ হয়।

শায়েখ আবদুল করীম সালুমী র. বলেন, কোরআন পাঠক পাঠ করার সময় যদি নিয়ত করে এর ছওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহে রেছানী করবে, তাহলে তা মৃতের কাছে পৌঁছবে না। কেনোনা, কোরআন পাঠ শারীরিক ইবাদত, তাই অন্যের তরফ থেকে তা আদায় হবে না। কিন্তু প্রথমেই যদি মৃতব্যক্তির উপর ছওয়াব রেছানীর উদ্দেশ্যে করে এবং এরপর তেলাওয়াত করে এবং এর মাধ্যমে যা কিছু হাসিল হয় তা যদি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বখশিশ করে, তাহলে তার দোয়া এবং ছওয়াব রেছানী হবে। এ

ধরনের ইবাদতের ছওয়াব মৃত ব্যক্তির উপকারে আসে। উলামা কেরাম বলেন, কোরআন রাখার স্থান বরকতময় এবং সেখানে আল্লাহ্তায়ালার রহমত নাযিল হয়। মৃত ব্যক্তি ছওয়াব প্রাপ্তির দিক দিয়ে জীবিতের মতো। সুতরাং কোরআন পাঠক যখন মৃত ব্যক্তির রূহে ছওয়াব পৌঁছানোর নিয়ত করবে, তখন আল্লাহ্তায়ালার রহমত এবং বরকত নাযিলের আশা রাখবে।

গুদা নামক কিতাবের লেখক বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি পানির কূপ খনন করে, খাল কেটে দেয়, গাছ লাগায়, নিজের জীবদ্দশায় কোরআন মজীদ ওয়াকফ বা দান করে যায়, অথবা কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্য কেউ সে ব্যক্তির রূহে ছওয়াব রেছানীর উদ্দেশ্যে উপরোক্ত সদকায়ে জারিয়াগুলো সম্পৃক্ত করে তাহলে এরদ্বারা মৃত ব্যক্তির কাছে ছওয়াব পৌঁছে যায়। হাদীছ শরীফে এরকম বলা হয়েছে। দান বা ওয়াকফ শুধু কোরআন মজীদের বেলায় নির্দিষ্ট নয়। বরং সব ধরনের ওয়াকফই এর সাথে শামিল হবে। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানী করা জায়েয হওয়াটা এখান থেকেই অনুমান করা যায়। মৃত ব্যক্তির নামে কোরবানী করাও এক প্রকারের সদকা। তবে তাহযীব কিতাবে বলা হয়েছে, যেহেতু অপর ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার নামে কোরবানী করা জায়েয নেই, সেহেতু মৃত ব্যক্তির বেলায়ও তা প্রযোজ্য হবে। তবে হ্যাঁ, মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত করে গিয়ে থাকে, তাহলে জায়েয হবে। (মৃত ব্যক্তির রূহের উপর ছওয়াব রেছানীর উদ্দেশ্যে তার নামে কোরবানী করা জায়েয, এর উপরই ফতওয়া হয়েছে। আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদুনা হজরত আলী রা. নবী করীম স. এর ওফাতের পর তাঁর পক্ষ থেকে কোরবানী করতেন। সিরাজ নামক কিতাবে আবুল আব্বাস মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী রা. বলেছেন, আমি নবী করীম স. এর পক্ষ থেকে সত্তরটি প্রাণী কোরবানী করেছি। রসুলে খোদা স. এর প্রতি হাদিয়া বখশিশ করা যাবে না বলে হাদীছের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

ছোট্ট একটি দল এ ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। তবে সাহাবা কেরাম এরূপ আমল করেননি বলেও তারা কোনো বক্তব্য পেশ করেননি। অথচ উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, সাহাবা কেরাম এরূপ আমল করেছেন। মুতাআখখেরীন ফুকাহা এ আমলকে মোস্তাহাব সাব্যস্ত করেছেন। কিছু সংখ্যক লোক আবার এটাকে বেদাত বলে থাকেন। তাঁরা বলেন, নবী করীম স. তো উম্মতের ছওয়াবের মুখাপেক্ষী নন। তিনি স. এরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি কোনো সৎকর্ম জারী করলে তা দেখে অন্যেরা যদি আমল করে, তবে আমলকারীর ছওয়াবে কম না করে জারীকারীর আমলনামায় সমপরিমাণে ছওয়াব লেখা হবে। (সুতরাং উম্মতের আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব তো রসুলেপাক স. এমনিতেই পেয়ে যাবেন। তাঁর উদ্দেশ্যে পুনরায় আমল করার কোনো প্রয়োজন নেই।)।

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, উম্মতের সকল আমলের ভিত্তি রসুলেপাক স.। মুসলমানদের সমস্ত নেক আমল একত্রিত করলে যা হবে, রসুলেপাক স. এর আমলনামায় থাকবে তার চেয়ে বেশী ছওয়াব। আর সেই আধিক্যের পরিমাণ আল্লাহ্পাক ছাড়া আর কেউ জানে না।

হেদায়েতপ্রাপ্তদের আমলতো কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তেই থাকবে। আর তাঁদের কৃত আমলের ছওয়াবের সমপরিমাণ ছওয়াব তাদের শিক্ষাদাতা শায়েখ পেতে থাকবেন। ওস্তাদের ওস্তাদ দ্বিগুণ পাবেন, তাঁর ওস্তাদ চার গুণ পাবেন, আর তাঁর ওস্তাদ আটগুণ পাবেন। এভাবেই তাঁদের আমলনামায় ছওয়াব বেড়েই যাবে। এভাবে নবী করীম স. পর্যন্ত এর সিলসিলা পৌঁছবে। রসুলেপাক স. কে এক হাজার চব্বিশগুণ ছওয়াব প্রদান করা হবে। এরপর যখন দশ ব্যক্তি থেকে একাদশ ব্যক্তি হেদায়েত পাবেন, তখন রসুলেপাক স. এর আমলনামায় দুহাজার আটচল্লিশ গুণ ছওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। এভাবে যতই নীচের দিকে আমলকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, ততগুণ ছওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর এই সিলসিলা সর্বদাই জারী থাকবে।

একজন কোরআন পাঠক তার তেলাওয়াতের কারণে যে ছওয়াব পাবেন, তার সমপরিমাণ ছওয়াব পাবেন তাঁর ওস্তাদ। আবার এতদুভয়ের সমপরিমাণ ছওয়াব পাবেন তাঁর ওস্তাদ। এভাবে রসুলেপাক স. পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সকল তেলাওয়াতকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব তাঁর আমলনামায় দেয়া হবে। যুমরাহ কিতাবে 'হে আল্লাহ্ তুমি এই কাবা ঘরের সম্মান ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে দাও' এই দোয়ার বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কাবা ঘরের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারটিও বর্ণিত দৃষ্টিকোণ থেকে করতে হবে। এ কথাগুলো মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের প্রচলন করলে আমলকারীদের সমপরিমাণ ছওয়াব তাকে দেয়া হয়। এই হাদীছ দ্বারা নবী করীম স. এর সুন্নতের উপর আমল করার ব্যাপারে উম্মতকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তার সাথে সাথে রসুলেপাক স. এর জন্য সীমাহীন ছওয়াব প্রাপ্তির ব্যবস্থা সম্পর্কেও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

এই উম্মতের আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, তারা অন্যান্য উম্মতের পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। ইমাম তিবরানী আউসাত নামক কিতাবে সাইয়্যেদুনা হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, আমার বেহেশতে প্রবেশের আগে অন্য নবীগণের বেহেশতে প্রবেশ হারাম করা হয়েছে আর আমার উম্মতের বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে অন্য উম্মতদের জন্যও বেহেশত হারাম হয়েছে। এই উম্মতের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে

প্রবেশ করবে। এই হাদীছখানা ইমাম বোখারী এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ও তিবরানী বলেছেন, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আমার সঙ্গে এইমর্মে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি এর চেয়ে বেশী চেয়েছিলাম। আল্লাহ্তায়ালা তাও কবুল করেছেন। মোটকথা আল্লাহ্তায়ালা এই উম্মতের জন্য এমন কিছু দান করেছেন, যা অন্য কোনো উম্মতকে দেননি। নবী করীম স. যখনই আনুগত্যের জন্য আল্লাহ্তায়ালার কাছে দোয়া করেছেন, তখনই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সকল নবীর উপর এবং তাঁর উম্মতকে সকল উম্মতের উপর সম্মানিত করে দিয়েছেন।

মেরাজ শরীফের আলোচনা

বিশেষ থেকে বিশেষতর, উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর, পূর্ণ থেকে পূর্ণতর এবং বিস্ময়কর মোজেজা হচ্ছে মেরাজ। কোনো নবী বা রসুলকে এহেন মোজেজা দেয়া হয়নি। এই মেরাজ শরীফের মাধ্যমে নবী করীম স. কে মাকামে উলিয়া পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছে। সেখানে পৌঁছে তিনি যা অবলোকন করেছেন, তা অন্য কেউই দেখেননি। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'পবিত্রতা ওই মহান সত্তার যিনি তাঁর বিশেষ বান্দাকে রাতের একাংশে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করালেন। যে মসজিদে আকসার চতুষ্পার্শ্বে আমি বরকত দান করেছি।' এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি (আল্লাহ্) আমার কুদরতের নিদর্শন তাঁকে দেখাবো। নিশ্চয় সেই আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত শ্রবণকারী এবং প্রত্যক্ষকারী। এসরা শব্দের অর্থ নিয়ে যাওয়া, সায়ের বা ভ্রমণ করানো। আল্লাহ্তায়ালা রসুলে আকরম স. কে মক্কা মুকাররমা থেকে মসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন– এটুকুকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে। কেনোনা তা কিতাবুল্লাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। তারপর মসজিদে আকসা থেকে আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার নাম হচ্ছে মেরাজ। এটুকু মশহুর হাদীছসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। রসুলেপাক স. এর ভ্রমণের এ অংশটুকু যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে বেদাতী, ফাসেক এবং লাঞ্ছিত। এছাড়া আনুষংগিক ছোট খাট আশ্চর্যজনক এবং সূক্ষ্ম ঘটনাদি বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সেগুলো যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে মূর্খ এবং বঞ্চিত। মেরাজ সম্পর্কে বিশুদ্ধ মাযহাব এই যে, এসরা এবং মেরাজ উভয়টিই জাগ্রত অবস্থায় এবং সশরীরে সংঘটিত হয়েছিলো। সাহাবা, তাবেয়ীন এবং তাবে তাবেয়ীনগণের মশহুর আলেমগণ এবং তাঁদের পর মোহাদ্দেছ, ফকীহ্ এবং এলমে কালাম শাস্ত্রবিদগণের মাযহাব এইমতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ সম্পর্কে বহু সহীহ্ হাদীছ এবং সহীহ্ খবর মুতাওয়াতির হিসেবে

বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ আবার এরকম মত পোষণ করেছেন, পবিত্র মেরাজ স্বপ্নে এবং আত্মিকভাবে হয়েছিলো।

এই দু'ই মতের সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করা হয়েছে যে, রসুলে করীম স. এর মেরাজ বিভিন্ন সময়ে হয়েছিলো। তন্মধ্যে একবার সংঘটিত হয়েছিল জাগ্রত অবস্থায়। অন্যান্য সময় হয়েছিল স্বপ্নযোগে, আত্মিকভাবে। সেগুলোও আবার কিছু হয়েছিলো মক্কা মুকাররমায় এবং কিছু হয়েছিলো মদীনা মুনাওয়ারায়। আর স্বপ্নের মেরাজও ওহী। কেনোনা এ কথায় ঐকমত্য রয়েছে যে, আম্বিয়া কেরামের স্বপ্নও ওহী। সন্দেহের অবকাশ নেই। নিদ্রিত অবস্থায়ও তাঁদের অন্তর জাগ্রত থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় তাঁদের চোখ মুদ্রিত থাকতো, যেমন মোরাকাবার হালতে রসুলেপাক স. এর চোখ মোবারক মুদ্রিত থাকে। আর এই মুদ্রিত রাখার কারণ হচ্ছে, মোরাকাবার অনুভূতিতে জাগতিক প্রভাব যেনো অনুপ্রবেশ করতে না পারে। কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী র. বলেন, নবী করীম স. স্বপ্নযোগে যা কিছু লাভ করতেন, তা ছিলো তাউতিয়া এবং তায়সির হিসেবে। অর্থাৎ বিধান বা অবস্থাকে বুঝিয়ে দেয়া এবং সহজসাধ্য করে দেয়াই ছিলো তার উদ্দেশ্য। যেমন নবী করীম স. এর কাছে ওহী আগমনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি সুস্বপ্ন দর্শন করতেন, যাতে করে ওহীর কঠিন ভার হালকা অনুভূত হয় এবং মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ সাপেক্ষে উক্ত গুরুদায়িত্বটি সহজে বহন করতে পারেন।

নবী করীম স. এর মেরাজ প্রথমে কয়েকবার স্বপ্নযোগে সংঘটিত হয়েছিলো, যেহেতু জাগ্রত অবস্থায় মেরাজ সংঘটিত হবে। আল্লাহ্পাকের পরিকল্পনা ছিলো সেরকমই। মেরাজ স্বপ্নে হয়েছিলো– এ কথার প্রবক্তারা বলেছেন, স্বপ্নের মেরাজ নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে হয়েছিলো। কোনো কোনো আরেফীন বলেছেন, রসুলেপাক স. এর এসরা এবং মেরাজ বহুবার সংঘটিত হয়েছিলো। তাঁরা এ সংখ্যা চৌত্রিশ ছিলো বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হয়েছিলো সশরীরে, জাগ্রত অবস্থায়। আর বাকীগুলো হয়েছিলো স্বপ্নযোগে, আত্মিকভাবে। আবার একশ্রেণী এমন বলে থাকেন, এসরা– যা মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত হয়েছিলো তা ছিলো সশরীরে। আর সেখান থেকে আকাশে যে মেরাজ হয়েছিলে, তা স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মিক অবস্থায় হয়েছিলো। তারা উপরোক্ত আয়াতে কারীমার মাধ্যমে দলীল দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন, এসরার শেষ সীমায় মসজিদে আকসাকে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের কথা এই যে, সশরীরে এসরা যদি মসজিদে আকসার পরেও হয়ে থাকতো, তাহলে কোরআন মজীদে এর উল্লেখ করা হতো। এ কথা উল্লেখ করলে তো নবী করীম স. এর বুযুর্গী, সম্মান, প্রশংসা এবং আল্লাহ্তায়ালার কুদরত ও বিস্ময় আরও অধিক প্রতিভাত হতো। তাঁদের এহেন বক্তব্যের উত্তরে বলা হয়েছে, আয়াতে কারীমায় বিশেষ করে মসজিদে আকসাকে উল্লেখ করা

হয়েছে, এর কারণ হচ্ছে, উক্ত স্থানটিকে কেন্দ্র করে ঝগড়া ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিলো। তাই সেস্থানটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবী করীম স. যে বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন, মসজিদে আকসা দর্শন করেছেন একথা কুরায়েশরা অস্বীকার করেছিলো। শুধু তাই নয়, কাফেররা নবী করীম স. এর কাছে মসজিদে আকসার কী কী আলামত রয়েছে, এ সম্পর্কেও জানতে চেয়েছিলো এবং তার অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করে নবী করীম স. কে দস্তুরমত পরীক্ষা করেছিলো। আর সে কারণেই উক্ত স্থানটির উল্লেখ বিশেষভাবে করা হয়েছে। এটা এসরার শেষ সীমা বুঝানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়নি। এ সম্পর্কে কোরআনের আয়াতও রয়েছে। সুরা আন নাজ্‌মে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আন নাজ্‌মে যা বলা হয়েছে এবং যা ঘটেছে, সেগুলো সম্পর্কে কিছু কিছু চিন্তাবিদ মন্তব্য করে থাকেন যে, রসুলেপাক স. হজরত জিব্‌রাইল আ.কে দেখেছিলেন এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করেছিলেন– এটাই বুঝানো হয়েছে আন নাজ্‌ম এর বর্ণনায়। কিন্তু সুসাব্যস্ত ও সুপ্রমাণিত কথা এটাই যে, এর দ্বারা মেরাজের ঘটনাই বলা হয়েছে।

বান্দা মিসকীন (শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, আমার কুদরতের নিদর্শনসমূহ তাঁকে দেখাবো এ উদ্দেশ্যে আমি ভ্রমণ করিয়েছি– এ আয়াতখানা মেরাজের সাথে যুক্ত। কথাটির তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর হাবীব স.কে মসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন। তারপর সেখান থেকে আকাশে নিয়ে গেলেন। আকাশে নিয়ে নিদর্শন দর্শন করানোর কারণ এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ তো আকাশেই, আর চূড়ান্ত পর্যায়ের অলৌকিকতা ও মোজেজার বহিঃপ্রকাশ তো সেখান থেকেই হয়ে থাকে। তাই এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর হাবীব স. এর এই ঘটনা মসজিদে আকসা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেননি।

ঊর্ধ্বাকাশে যে মেরাজ হয়েছিল, তা শুরু হয়েছিলো মসজিদে আকসা থেকে। মসজিদে আকসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ওই প্রেক্ষিতেই। নবী করীম স. এর মেরাজ স্বপ্নযোগে সংঘটিত হলে কাফেরেরা একে অসম্ভব মনে করতো না। আর দুর্বল ইমানদাররা এর কারণে ফেতনায় পতিত হতো না। তাছাড়া স্বপ্নে দর্শিত ঘটনাবলী বাস্তবে সংঘটিত হওয়ার প্রচলন অপ্রসিদ্ধ। আসরা শব্দের ব্যবহারও স্বপ্নের ক্ষেত্রে হয় না। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হয় যে, এসরা যখন জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে, তখন তার পরবর্তী সংঘটিত মেরাজও বাস্তবেই হয়েছে। এরপরও বলতে হয়, মেরাজ স্বপ্নযোগে হয়েছে– এরকম প্রমাণও নেই। নবী করীম স. এর মেরাজ শরীফ স্বপ্নযোগে হয়েছে বলে যারা দাবি করেন তাঁদের সন্দেহের কারণ কয়েকটি।

১. 'যা আমি আপনাকে দেখিয়েছি ওই স্বপ্নকে আমি কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য বানিয়েছি।' এই আয়াতকে কোনো কোনো মুফাসসির মেরাজের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে থাকেন। কেনোনা রুইয়া নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে কিছু দেখাকে বলা হয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এখানে রুইয়া বা স্বপ্ন শব্দ উল্লেখ করে হুদাইবিয়া বা বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে নবী করীম স. যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকেই বুঝানো হয়েছে। আহলে এলেম রুইয়া শব্দকে চাক্ষুষ দর্শন অর্থেও প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন কবি মুতানাব্বি তার কবিতায় বলেছেন। কোনো কোনো আহলে এলেম বলেছেন, যেহেতু মেরাজ শরীফ রাত্রি বেলায় হয়েছে তাই এক্ষেত্রে রুইয়া শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২. হাদীছ শরীফে এসেছে, নবী করীম স. বলেছেন, 'অতঃপর আমি জাগ্রত হলাম'– এ কথায় প্রমাণ হয়, মেরাজ জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিলো। 'আমি জাগ্রত হলাম' এ কথার তাৎপর্য এই যে, ফেরেশতা আসার পূর্বে তিনি নিদ্রায় ছিলেন। সেই নিদ্রা থেকে তিনি জাগলেন এবং জিব্রাইল আ. তাঁকে বোরাকে সওয়ার করিয়ে নিলেন। অথবা এর অর্থ এও হতে পারে, মেরাজের যাবতীয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর তিনি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেন। যেমন হাদীছ শরীফে এসেছে— আমি জেগে উঠতেই দেখি মসজিদে হারামে শুয়ে আছি। অথবা এর অর্থ যখন সকাল হলো তখন আমি মসজিদে হারামে। অথবা জাগ্রত হওয়ার কথা সম্ভবতঃ নবী করীম স. অন্য কোনো নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া সম্পর্কে বলেছেন, যা বাইতুল হারামে আসার পর হয়েছিলো।

নবী করীম স. এর এসরা সারারাত্রি ব্যাপী ছিলো না, বরং রাতের কিয়দংশে হয়েছিলো। কোনো কোনো মুহাক্কেক বলেন, এসতেকাফ এর অর্থ এফাকা অর্থাৎ চেতনতা। উক্ত চেতনাবস্থা থেকে মেরাজের অবস্থায় উপনীত হওয়া। নবী করীম স. কে যখন আসমান ও যমীনের মালাকুতের বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো দেখানো হয়েছিলো, মালায়ে আ'লা এবং তথাকার আল্লাহ্তায়ালার বড় বড় নিদর্শনাবলী এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের ভেদের বস্তুসমূহ অবলোকন করানো হয়েছিলো, তখন তাঁর হাল অত্যন্ত কঠিন হয়ে গিয়েছিলো এবং তাঁর বাতেন বা অন্তর্জগত নিদ্রার অবস্থা সদৃশ হয়ে গিয়েছিলো। আহলে এলেমগণ বলেন, মালাকুত অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার কুদরতের জগত দর্শনকালে তিনি যদিও জাগ্রত ছিলেন, তথাপিও সে অবস্থাটা ছিলো একপ্রকারের অনুভূতির অনুপস্থিতি। আর সে অবস্থাটাকেই আহলে এলেম নিদ্রা ও জাগরণ এ দু'য়ের মধ্যবর্তী একটি অবস্থান বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা জাগ্রত অবস্থাই। কিন্তু অনুভূতির অনুপস্থিতিকে কেউ কেউ নিদ্রা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কোনো কোনো বর্ণনাতেও এরকম এসেছে, তিনি স. এরশাদ করেছেন, আমি তখন নিদ্রা ও জাগরণ দু'এর মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম। কেউ কেউ এই হাদীছের ব্যাখ্যা এরকম করেছেন যে, নাওম এর অর্থ হলো, তিনি নিদ্রিতদের মতো শায়িত ছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আমি তখন হাজারে আসওয়াদের নিকটে প্রায় শায়িত অবস্থায় ছিলাম। আবার কখনও এক পাশে শায়িত ছিলাম– এরকম বলা হয়েছে। হজরত আনাস রা. কিন্তু এরকম অবস্থা অবলোকন করেননি। তিনি রসুল স. থেকে বর্ণনা শুনেছেন। মেরাজের ঘটনা হিজরতের পূর্বে ঘটেছিলো। আর হজরত আনাস রা. তো হিজরতের পর নবী করীম স. এর সাহচর্যে গিয়েছিলেন। তদুপরি তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র সাত আট বৎসর। আলেমগণ এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর বর্ণিত হাদীছের অবস্থাও তদ্রূপ। তিনি বলেছেন, রসুলেপাক স. এর দেহ মোবারক সে রাত্রিতে বিছানা থেকে হারিয়ে যায়নি। আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর এই হাদীছটি ওই সম্প্রদায়ের দলীল, যাঁরা বলেন, নবী করীম স. এর মেরাজ সংঘটিত হয়েছিলো স্বপ্নযোগে।

একদল আলেম বলেন, নবী করীম স. এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির এক বা দেড় বৎসর পর ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মেরাজ সংঘটিত হয়েছিলো। তাঁদের উক্ত মতানুসারে তো হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর তখন ধারণা ও স্মরণশক্তিই ছিলো না। বরং এমনও হতে পারে যে, তখন তাঁর জন্মই হয়নি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মোট কথা হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর এই হাদীছ পূর্বোক্ত হাদীছদ্বয়ের তুলনায় অগ্রগণ্য নয়, যা দর্শনের ভিত্তিতে বিবৃত হয়েছে। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এর দেহ মোবারক আমা থেকে হারিয়ে যায়নি। এই হাদীছের মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে ভুল। পবিত্র কালামে উল্লেখ করা হয়েছে 'এবং চোখ যা দর্শন করেছে, অন্তর তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি।' এই আয়াতটি স্বপ্নদর্শনকে প্রমাণিত করে না। আয়াতখানার সুস্পষ্টভাব হচ্ছে, তিনি চোখে যা দেখেছেন, তাঁর হৃদয় তাকে অবাস্তব দর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করেনি। বরং তাঁর চোখের দর্শনকে অন্তর স্বীকৃতি দিয়েছে, অস্বীকার করেনি। তার দলীল হচ্ছে এই আয়াত, 'ওই সময় তাঁর চোখ বিচ্যুত হয়নি এবং অবাধ্য হয়নি।'

এখন আলোচনায় আসা যাক, দার্শনিকদের বাতেল এবং মনগড়া যুক্তি প্রসঙ্গে। তারা বলে থাকে, ভারী দেহ কখনও ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে পারে না। তাছাড়া আকাশের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হওয়া এবং তা মিলিত হয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এ জাতীয় কথাবার্তা ইসলামী তরিকায় পরিত্যাজ্য এবং অনর্থক। আরেকদল আছে, যারা মেরাজকে আত্মিক বলে ধারণা করে থাকে। তারা এ মেরাজের উপর

অনুমান করে হাশরকেও আত্মিক বলে আখ্যায়িত করে। তারা যে মেরাজকে আত্মিক বলে, তা এই অর্থে নয় যে, স্বপ্নযোগে আত্মার মেরাজ হয়েছিলো। বরং তারা আত্মার বিভিন্ন মাকাম ও অবস্থায় আরোহণ এবং পূর্ণতায় পৌঁছা– এরূপ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে থাকে। যেমন তারা বলে থাকে, জিব্‌রাইল এর অর্থ মোহাম্মদ স. এর আত্মা, বোরাকের অর্থ তাঁর নফস যা রূহের বাহন ছিলো, যার খাসলত হচ্ছে অবাধ্যতা। এটা কখনও বাধ্য হয় না, যতক্ষণ রূহানী শক্তি তার উপর প্রবল না হয়। তারা আকাশের অর্থ করে নৈকট্যের মাকাম, সিদরাতুল মুনতাহার অর্থ করে চূড়ান্ত মাকাম ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সম্প্রদায়টি তাদের এহেন মনগড়া ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে হজরত মুসা আ. এর ঘটনা প্রসঙ্গেও যেমন ফেরআউন, লাঠি, জুতা ও ওয়াদী ইত্যাদি সম্পর্কেও মনগড়া অর্থ করে থাকে। তারা শব্দ ও বাক্যের বাহ্যিক অর্থকে স্বীকার করলেও বলে, এলেম ও মারেফত বলে একটি বস্তু আছে এবং তারও আলাদা স্তর আছে। তাদের অনুমান অনুসারে হাশর, মেরাজ আত্মিক ও দৈহিক– এ দুয়ের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা। ইমাম গাজ্জালী র.ও বর্ণিত খেয়ালের আবর্তে অবস্থান করতেন। হাশরকে যদি আত্মিক মনে করা হয়, শাব্দিক অর্থের গুরুত্ব না দিলে এবং আকৃতিগতভাবে হাশর হবে বলে মনে না করলে, সুস্পষ্ট কুফুরী করা হবে ও সীমালংঘন হবে। এদের মাযহাব হলো বাতেনী।

বান্দা মিসকীন (শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) এর ইমানী উদ্দীপনা কথিত তরিকাকে সত্য থেকে দূরবর্তী মনে করে এবং তাকে অস্বীকার করতে চায়। বস্তুতঃ এরা আকৃতি জগতকে স্বাভাবিক দায়েরায়ে এমকান বা সম্ভাব্যের বৃত্ত থেকে দূরবর্তী মনে করে বলে ভাবার্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। প্রকৃতপক্ষে ইমান হচ্ছে শোনা এবং মানার নাম, যেমন মেরাজের ঘটনায় সাইয়্যেদুনা হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. করেছিলেন। আর সেদিন থেকেই তিনি সিদ্দীক নামে ভূষিত। আর এই ঘটনাকে অবিশ্বাস করে কোনো কোনো দুর্বল ইমানদার তো ইমানের বৃত্ত থেকে বেরিয়েও গিয়েছিলো। এলমুল একীন তো প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সে সম্পর্কে আপত্তি তোলা, উচ্চ বাচ্য করা, ভাবার্থের দিকে ঝুঁকে পড়া সম্ভাব্য অসম্ভাব্য নিয়ে যুক্তিবিদ্যার মাপকাঠিতে বিচার বিশ্লেষণ করা, বুদ্ধি এবং তার মাধ্যম দ্বারা তাকে বন্দী করা ইমান এবং বন্দেগী থেকে দূরে থাকার লক্ষণ।

আমাদের অর্থাৎ ইমানদারদের জন্য তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কথার চাইতে বড় দলীল আর কিছু হতে পারে না। আমরা তাঁর কাছ থেকে যা শুনবো তাইতো আমল করবো। যে সম্পদায় এই কাজটিকে তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ বলে থাকে, তারা জানে না আমরা কার তাকলীদ করে থাকি। আমাদের তাকলীদ বা অনুসরণ তো ওই মহান পয়গম্বরের তাকলীদ যাঁর পয়গম্বরী সাব্যস্ত হয়েছে মোজেজাসমূহের

মাধ্যমে। সুসাব্যস্ত জনের তাকলীদ করাই প্রকৃত তাকলীদ আর এটা কোনো গতানুগতিক তাকলীদ নয়। এটা সিরাতুল মুস্তাকীমের অনুসরণেরই নামান্তর। মুকাল্লেদ তো তোমরাই, যারা স্বীয় বুদ্ধিবাদিতার তাকলীদ করে থাকো এবং প্রবৃত্তির নির্দেশ মতো চলো, যার সত্যাসত্য সুসাব্যস্ত নয়। এ পথ দ্বিধা ও সন্দেহে ভরা। দার্শনিকেরাতো মূলতঃ আম্বিয়া কেরামের সিলসিলাকেই অস্বীকার করে থাকে। তাদের কথায় প্রয়োজন কী? তাদের নবীতো তাদের বুদ্ধি। যুক্তিবাদী ও তর্কবাগীশদের কী যে হলো। চলার পথ সহজ সরল হওয়া সত্ত্বেও তারা পথচ্যুত। রাস্তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা কথা বলে কেনো? সন্দেহের অবতারণা করে মতানৈক্যের সৃষ্টি করে কেনো? তর্কবাগীশদের নিয়ত যদিও দার্শনিকদের বিপরীত, তবু পথ চলার দিক দিয়ে তারাও স্বীয় প্রবৃত্তি এবং দার্শনিকদের দর্শনশাস্ত্রের অনুসরণ করে। এতে করে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে যাচ্ছে।

মেরাজ শরীফের প্রমাণ

একথা স্পষ্টভাবে জেনে রাখা উচিত যে, মেরাজ শরীফের বর্ণনায় সাহাবা কেরাম অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যেগুলোকে অর্থগত দিক দিয়ে মুতাওয়াতির হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যদিও কোনো কোনো বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গে বর্ণনার বিভিন্নতা রয়েছে। তন্মধ্যে মশহুর ওই দীর্ঘ হাদীছখানা, যা ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিম কিতাবদ্বয়ে হজরত কাতাদা, হজরত আনাস এবং হজরত মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীছ শরীফে নবী করীম স. এর পবিত্র কলব বিদীর্ণ করার কথা এবং তা স্বর্ণের তশতরীতে রেখে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। কলবে হেকমত ও ইমান পুরে দেয়া হয়েছে। তারপর তা পুনরায় স্বস্থানে সংস্থাপন করে সীনা মোবারককে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক করে দেয়া হয়েছে।

নবী করীম স. এর বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছে চারবার। সর্বপ্রথম হয়েছে বাল্যকালে, যখন তিনি হজরত হালীমা সাদীয়া রা. এর কাছে ছিলেন। দ্বিতীয়বার হয়েছিলো বালেগ হওয়ার প্রাক্কালে দশ বছর বয়সের সময়। তৃতীয়বার হয়েছিলো নবুওয়াতপ্রাপ্তির সময়। আর চতুর্থবার হয়েছিলো মেরাজ যাত্রার প্রাক্কালে। আর এটি হয়েছিলো এ কারণে, যাতে পূর্ণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ হয় এবং আলমে মালাকুতে পৌঁছার জন্য পরিপূর্ণভাবে তিনি প্রস্তুত হয়ে যান। নবী করীম স. এর এই মেরাজের বক্ষবিদীর্ণের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করার উপর ধারণা করে নামাজের পূর্বে অজু করার যৌক্তিকতা সাব্যস্ত হয়েছে। কেনোনা মুমিনের নামাজ মেরাজেরই নমুনা। পক্ষান্তরে, হজরত মুসা আ. যখন তুর পাহাড়ে

আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তখন আল্লাহ্পাকের সঙ্গে তিনি কালাম করলেন ঠিকই, কিন্তু পূর্বপ্রস্তুতিসম্ভূত পবিত্রতা অর্জিত না থাকায় দীদার লাভে বঞ্চিত হলেন।

এই মাকামের সৌন্দর্য লাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, যারা প্রকৃতিপূজারী। প্রাকৃতিক বিধানকে প্রাধান্য দিয়ে যারা বলে, বুক ফেঁড়ে কলব বের করলে মৃত্যু অবধারিত। একাজ করলে হায়াতের সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে না। আবার একদল জ্ঞানের পূজারী বলে, কলবকে ধৌত করার অর্থ হচ্ছে কলবের পবিত্রতা প্রদান, নশ্বর ও সম্ভাব্যের ময়লা থেকে রসুল স. কে বাতেনী পরিচ্ছন্নতা প্রদান করা। আর যারা আহলে ইমান, তাঁরা এগুলোর কোনো রূপ ভাবার্থ না করে, প্রকাশ্য অর্থ ঠিক রেখেই তার উপর ইমান এনে থাকেন এবং তা স্বীকারও করে নেন। তাঁরা এটাই মনে করেন যে, এ জাতীয় কাজ আল্লাহ্তায়ালার জন্য খুবই স্বাভাবিক। আল্লাহ্তায়ালার জন্য অসম্ভব কিছু নেই। স্বর্ণের তশতরীতে তাঁর কলবে আতহারকে ধৌত করার ব্যাপারে যদি কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে, স্বর্ণের ব্যবহার তো তাঁর শরীয়তে হারাম। এমন হারামকে মেনে নেয়া হলো কেমন করে? উত্তর হচ্ছে এই যে, এটা সম্মানার্থে বলা হয়েছে। স্বর্ণের ব্যবহার এ জগতে হারাম, কিন্তু আখেরাতে বেহেশতের বরতনসমূহ তো স্বর্ণেরই হবে।

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'হে রসুল! আপনি বলে দিন যে এটা (স্বর্ণ) ইমানদারদের জন্য এজগতে হারাম, কিন্তু কিয়ামতের দিনের জন্য নয়।' নবী করীম স. বলেছেন, স্বর্ণ এ জগতে কাফেরদের জন্য আর আখেরাতে আমাদের জন্য। মেরাজের ঘটনাটি তো আখেরাত সম্পর্কিত ঘটনা। দুনিয়াভিত্তিক ঘটনা নয়। উত্তর এও হতে পারে যে, এর ব্যবহার তো রসুলেপাক স. নিজে করেননি। করেছেন ফেরেশতা। আর ফেরেশতার জন্য শরীয়তের এই বিধান প্রযোজ্য নয়। আরেকটি বলিষ্ঠ উত্তর এও হতে পারে যে, পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছিলো মদীনা মুনাওয়ারায়, মেরাজের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর।

কোনো কোনো ভাববাদী জ্ঞানীজন স্বর্ণ এবং কলবে নবীর মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে সাধন করেছেন যে, স্বর্ণ হচ্ছে বেহেশতী পাত্র আর এটি খনিজ পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে ভারী মূল্যবান পদার্থ। মাটি একে নষ্ট করতে পারে না এবং তার মধ্যে জং-ও ধরে না। মানবজাতির কলবসমূহের মধ্যেও তেমনি কলবে নবী স. সবচেয়ে ভারী, মূল্যবান এবং সর্বাধিক সুসজ্জিত। তাঁর কলবে ওহীর ভার অর্পিত হয়েছে। অধঃজগতের মৃত্তিকা তাকে নষ্ট করতে পারে না এবং তাতে জড়জগতের কালিমার জং-ও লাগতে পারে না। যাহাব মানে স্বর্ণ আর তার আরেক অর্থ যাওয়া। সুতরাং এই শব্দটির ভাবগত অর্থ এও হতে পারে, আল্লাহ্তায়ালার দিকে যাওয়া।

আবার এর অর্থ এরকমও হতে পারে, নাপাকী দূর করা, পাক সাফ করা। তাছাড়া এর অর্থ চকচকে হওয়া, স্থায়ী থাকা, পরিষ্কার হওয়া ইত্যাদিও হতে পারে। তশতরীকে হেকমত ও ইমান দ্বারা ভরপুর করার অর্থ ইমান ও হেকমতের পূর্ণতার সারবস্তু নূরানী জওহরসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ করা। তশতরীতে রেখে কলবকে ধৌত করার ব্যাপারটি আধ্যাত্মিক দেহ সংক্রান্ত ব্যাপার হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন সুরা বাকারায় রয়েছে, কিয়ামতের দিন হবে বিল্লাহ্ অর্থাৎ ছায়াদার মৃত্যুটি হবে বকরীর আকৃতি এবং মানুষের নেক আমলসমূহ সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের মতো হয়ে উদ্ভাসিত হবে এবং তারপর তাকে মীযানের পাল্লায় তোলা হবে।

আহলে আরেফগণ বলেন, মেরাজের ঘটনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইমান ও হেকমত অনুভবযোগ্য, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এটা অনুমিত আত্মিক ব্যাপার নয় বা এটা কোনো আরয বা জড়বস্তুও নয়, যেমন তর্কবিদরা মনে করেন। নবী করীম স. বস্তুর হাকিকতের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত ও পরিচিত। প্রজ্ঞাপূজারীদের দৃষ্টি জাহেরের উপর। ইমান ও হেকমতকে তারা যখন জাওহার থেকে প্রকাশিত হতে দেখে তখন আরয বলে আখ্যায়িত করে, যা কায়েম বিল গায়েরের হুকুম রাখে। মেরাজের উপর বিশ্বাস রাখা নিঃসন্দেহে ইমানের অঙ্গ। আর এটা হেকমতেরও ব্যাপার। ঘটনাটির উপর জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী ইমানের পূর্ণতার ও বৃদ্ধির অন্তরায়। এ জাতীয় অভ্যাস ইমান ধ্বংসের ব্যাপারে শংকাহীনতার প্রমাণ। নবী করীম স. সর্বাবস্থায় এবং সকল মাকামে মহাবীর, সুদৃঢ় এবং সর্বাধিক শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কলবকে আবে যমযম দ্বারা ধৌত করার মধ্যে হেকমত আছে। আহলে এলেমগণ বলে থাকেন, আবে যমযম হৃদয়কে সুদৃঢ় করে থাকে। এ কারণেই তাঁর কলবকে আবে যমযম দ্বারা ধৌত করা হয়েছিলো, যাতে আলমে মালাকুত দর্শনের ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে যায়। এই ঘটনা থেকেই কোনো কোনো আহলে এলেম দলীল পেশ করেন যে, আবে যমযম আবে কাউছার থেকে উত্তম। তাই উত্তম পানি দ্বারাই পবিত্র কলবকে ধৌত করা হয়েছে। কারো কারো মত, আবে কাউছার অনেক দূরে ছিলো। যমযম ছিলো নিকটে বিধায় আবে যমযম দ্বারা ধৌত করা হয়েছিলো। এই বক্তব্যটি দুর্বল। এখানে নিকট এবং দূরের প্রশ্ন তোলা সঙ্গত নয়। কেনোনা আল্লাহ্তায়ালার কুদরতের কাছে উভয়টিই সমান। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বোরাক

যমযমের পানি দ্বারা কলব ধৌত করার পর হজরত জিব্রাইল আ. শাদা বর্ণের একটি চতুষ্পদ বাহন আনলেন, যার নাম বোরাক। বোরাক খচ্চরের চেয়ে নীচু আর গাধার চেয়ে কিঞ্চিত উঁচু। সে পদবিক্ষেপ করতে পারে দৃষ্টির শেষসীমানায়।

নবী করীম স. বলেছেন, আমাকে সওয়ার করানো হয়েছিলো এবং হজরত জিব্‌রাইল আ. আমাকে আকাশের উপর নিয়ে গিয়েছিলেন। হাদীছের বাহ্যিক অর্থ এরকম– তিনি আসমান পর্যন্ত বোরাকের উপর ছিলেন। আর বোরাকটি যমীনের উপর যেমন চলছিলো শূন্যমণ্ডলেও চলছিলো তেমনই। এটাও স্বাভাবিকতার ঊর্ধ্বে, কেনোনা কোনো মানুষ বা জন্তু হাওয়ার উপর ভর করে চলতে পারে না। কিন্তু এসব যে আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরত। আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরত তো স্বাভাবিকতার সীমায় সীমিত নয়। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, বোরাকের দুটি পাখা, যার মাধ্যমে সে আকাশে ওড়ে। আবার কেউ কেউ বলেন, আরোহী বোরাকের উপরে ছিলেন মসজিদে আকসা পর্যন্ত। এরপর একখানা মেরাজ অর্থাৎ সোপান লাগানো হয়েছিলো, যার মাধ্যমে নবী করীম স.কে উপরের দিকে ওঠানো হয়েছিলো। দু'টি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এরূপে হতে পারে, কোনো কোনো বর্ণনাকারী মেরাজের ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা করেননি, কেউ কেউ করেছেন। প্রথম বর্ণনাকারীরা মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণের বর্ণনা করেছেন স্পষ্টভাবে। কিন্তু এরপর আসমানে ভ্রমণের আলোচনা করেননি। আবার দ্বিতীয় বর্ণনাকারীগণ আসমানে আরোহণের বর্ণনা করেছেন। এখানে এরকমও হতে পারে যে, তখনকার ভ্রমণটি বেসওয়ারী অবস্থায় ছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

নবী করীম স. কে বহন করার জন্য বোরাক প্রেরণের মধ্যে হেকমত হচ্ছে, সাইয়্যেদ মাহবুবে রব্বুল আলামীন স. এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। যেমন কোনো বন্ধু তার বন্ধুকে বহন করে আনার জন্য ঘোড়া প্রেরণ করে থাকে। আবার এমনও দেখা যায়, বিশেষ ব্যক্তিকে আনার জন্য পাইক পেয়াদাও পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাত্রিবেলায় মেরাজ সংঘটিত হওয়ার মধ্যেও হেকমত রয়েছে। রাতের মুহূর্তগুলো হচ্ছে একান্ত অভিসারের মুহূর্ত। অন্যান্যের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রেখে প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে একান্ত নিভৃতে নিয়ে আসবে, এটাই তো প্রকৃত প্রেমের নিয়ম। 'আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ উপমা।' খচ্চরের চেয়ে নীচু আর গাধার চেয়ে উঁচু ঘোড়ার আকৃতিবিশিষ্ট বোরাক পাঠানোর মধ্যে হেকমত এই যে, এই নিয়মের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার ইঙ্গিত আছে। হুবহু ঘোড়া পাঠানো হয়নি। কেনোনা ঘোড়া যুদ্ধবিগ্রহ ও ভীতিশংকুলতার প্রতীক। বোরাক ঘোড়ার আকৃতিতে ছিলো, কিন্তু ঘোড়ার মতো স্বাভাবিক গতিসম্পন্ন ছিলো না। তার গতি ছিলো অস্বাভাবিক, যা মোজেজা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই তাকে দেয়া হয়েছিলো। শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী বলেন, এর নাম ঘোড়াও নয়, খচ্চরও নয়। বোরাক আরবী শব্দ বারকুন থেকে এসেছে, যার অর্থ বিদ্যুৎ। তাই তার গতিও ছিলো বিদ্যুৎসম। কাযী আয়ায র. বলেন, তার নাম বোরাক হওয়ার যৌক্তিকতা হচ্ছে. বোরাকের গায়ে দু'টি রঙ ছিলো, যাকে বলা হয় শাতে বারকা অর্থাৎ চমকদার বকরী। এ শাতে বারকা ওই ধরনের বকরীকে বলা হয়, যার গায়ের

পশম শাদা এবং কাল বর্ণের। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকারের মত, বোরাক শব্দটি বারকুন বা বারীকুন শব্দ থেকে উৎপন্ন নাও হতে পারে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম স. যখন বোরাকের পাদানীতে কদম মোবারক রাখতে উদ্যত হলেন, তখন সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগলো। হজরত জিব্‌রাইল আ. বললেন, হে বোরাক! তোমার কি হয়েছে? তুমি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছো কেনো? সরকারে দোআলম স. এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ তো ইতোপূর্বে তোমার পিঠে চড়েননি। একথা শুনে বোরাক আগ্রহ প্রকাশ করলো এবং যমীনের উপর নতজানু হয়ে গেলো। রসুলে আকরম স. তার পিঠে চড়লেন। এই বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আম্বিয়া কেরামের জন্যই বোরাক তৈরী হয়েছে। কেউ কেউ এরকমও বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্যই আপন আপন মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন বোরাক ছিলো। বর্ণনা পাওয়া যায়, হজরত ইব্রাহীম আ. স্বীয় পুত্র হজরত ইসমাঈল আ. এর সঙ্গে মুলাকাত করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে মক্কা মুকাররমায় এসেছিলেন বোরাকের পিঠে সওয়ার হয়ে।

নবী করীম স. যে বোরাকের পিঠে সওয়ার হয়েছিলেন, তার পিঠে ইতোপূর্বে আর কেউ সওয়ার হননি বিধায় সে বুঝতে না পেরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলো। কেউ কেউ আবার বোরাকের এহেন আচরণকে ঔদ্ধত্য বলেন না। তারা বলেন, বোরাক তখন আনন্দে নাচানাচি শুরু করে দিয়েছিলো, যেমন পাহাড় কম্পনকালে নবী করীম স. পাহাড়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, হে পাহাড়! থামো। তোমার উপর নিশ্চয়ই নবী, সিদ্দীক এবং দু'জন শহীদ রয়েছেন।

বর্ণিত আছে, বোরাকের পাদানী ছিলো হজরত জিব্‌রাইল আ. এর হাতে। আর লাগাম ছিলে হজরত মিকাইল আ. এর হাতে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, ভ্রমণের সময় জিব্‌রাইল নবী করীম স. এর পিছনে বসা ছিলেন। বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে হতে পারে যে, প্রথমে হয়তো জিব্‌রাইল পাদানী ধারণ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে পথিমধ্যে রসুলেপাক স. মহব্বতের আতিশয্যে তাঁকে নিজের পিছনে বসিয়ে নিয়েছিলেন। সমাধান এরূপেও হতে পারে, প্রথমে তিনি নবী করীম স. এর পিছনে বসা ছিলেন, পরে তাঁর সম্মান প্রদর্শনার্থে নেমে গিয়ে পাদানী ধরেছিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

যাত্রাপথে বাহন যখন খেজুর বাগানসমৃদ্ধ এলাকায় পৌঁছলো, তখন জিব্‌রাইল নবী করীম স. কে বললেন, এখানে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে নিন। জায়গাটির নাম ইয়াছ্‌রিব। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হবে মদীনা মুনাওয়ারা। ভ্রমণপথে মাদায়েন এবং হজরত ঈসার জন্মস্থানে পৌঁছলে জিব্‌রাইল তাঁকে দু' রাকাত নামাজ আদায় করার কথা জানালেন। এরপর রসুলেপাক স. দেখতে পেলেন, এক পাশে এক বৃদ্ধা রমণী দাঁড়িয়ে আছে। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, সে

কে? বললেন, সামনে অগ্রসর হোন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে রসুল স. দেখতে পেলেন, একটি লোক তাঁকে ডাকছে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ও কে? বললেন, সামনে চলুন। এরপর পথিমধ্যে একটি জামাত দেখতে পেলেন, যারা রসুলেপাক স. কে সালাম প্রদান করছিলো। তাদের সালামের বাক্যগুলো ছিলো এইরূপ— আসসালামু আলাইকুম ইয়া আউয়াল, আসসালামু আলাইকা ইয়া আখের, আসসালামু আলাইকা ইয়া হাশের। জিব্‌রাইল বললেন, সালামের জবাব প্রদান করে তাদেরকে ধন্য করুন। রসুলেপাক স. তাদের সালামের জবাব দিলেন। এবার হজরত জিব্‌রাইল নবী করীম স. এর প্রশ্নসমূহের জবাব দিলেন। বললেন, ওই বৃদ্ধা রমণীটি দুনিয়া। তার আয়ু বেশী দিন নেই। যেমন বৃদ্ধা রমণীর আয়ু যৎসামান্যই বাকী থাকে। যে লোকটি ডাক দিয়েছিলো, সে ইবলীস। তিনি যদি তার ডাকে সাড়া দিতেন, তাহলে তাঁর উম্মত দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিতো এবং শয়তান তাদেরকে গোনাহ্‌গার করে ফেলতো। আর ওই জামাত যাঁরা নবী করীম স. কে সালাম প্রদান করেছিলেন, তাঁরা হলেন ইব্রাহীম, মুসা এবং ঈসা। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, নবী করীম স. যখন নবী মুসার কবর শরীফের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি কবরের ভিতর নামাজ পড়ছিলেন। নবী করীম স. এর আগমন বার্তা পেয়ে তিনি বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্‌র রসুল।

আম্বিয়া কেরাম যেহেতু বরযখী জীবনে জীবন্ত, তাই তাঁরা সেখানে ইবাদতে রত থাকেন। যেমন বেহেশতী বান্দারা বেহেশতে প্রবেশের পরও ইবাদত করবেন। কিন্তু ইবাদতের নির্দেশ তাদের উপর থাকবে না। তারপর রসুলেপাক স. নেক ও বদ লোকদের কাওম অতিক্রম করে গেলেন, যারা বরযখী ও মেছালী জগতে আপন আপন কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করছিলো। রসুলেপাক স. তাদেরকে আযাববেষ্টিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

এরপর রসুলেপাক স. বাইতুল মুকাদ্দাছে পৌঁছলেন এবং মসজিদের দরজার বেষ্টনীতে বোরাককে বাঁধলেন। পরে ওই দরজার নাম রাখা হয়েছে বাবে মোহাম্মদ স.। অতঃপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। দু'রাকাত নামাজ ছিলো তাহিয়াতুল মসজিদ। এখানে ফেরেশতাবৃন্দ একত্রিত হয়েছিলেন এবং হজরত আদম আ. থেকে হজরত ঈসা আ. পর্যন্ত রূহসমূহ আকৃতিসম্পন্ন হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা আল্লাহ্‌তায়ালার হামদ ও ছানা পেশ করলেন এবং রসুলেপাক স. এরও সালাত ও সালাম পেশ করলেন। সকলেই রসুলেপাক স. এর শ্রেষ্ঠত্বেও স্বীকৃতি দিলেন। এরপর আযান হলো। একামতও হলো। সকলেই ইমামতীর জন্য রসুলেপাক স. কে সামনে এগিয়ে দিলেন। রসুলেপাক স. ইমামতী করলেন, আর আম্বিয়া কেরাম সকলেই তাঁর

মুকতাদী হলেন। এই নামাজটি ফরজ না নফল, এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। ফরজ যদি হয়ে থাকে, তাহলে এটা কি এশার নামাজ ছিলো? নাকি ফজরের নামাজ ছিলো– এ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। হাদীছের পূর্বাপর ভাবধারায় প্রতীয়মান হয়, বাইতুল মুকাদ্দাছে তশরীফ নেয়ায় হয়েছিলো আসমানে আরোহণ করার পূর্বে। তাহলে বুঝা যায়, এটা এশার নামাজ। আর যারা বলেন, বাইতুল মুকাদ্দাছের ওই নামাজের জামাত হয়েছিলো মেরাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁদের বর্ণনানুসারে বুঝা যায় যে, ওই নামাজ ছিলো ফজরের নামাজ। কেউ কেউ আবার দ্বিতীয় বিবরণটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের মতে নবী করীম স. যখন পূর্ণ কামালাত ও ফযীলত নিয়ে মেরাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আম্বিয়া কেরামের মধ্যে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে উক্ত নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

বান্দা মিসকীন (শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, আমার খেয়াল হয়েছিলো, বাইতুল মুকাদ্দাছে নামাজ আদায়কারীরা তো মেরাজে যাওয়া এবং প্রত্যাবর্তন করা, উভয় কালেই একত্রিত হতে পারেন। কিন্তু এলেমে হাদীছের আলেমগণের আলোচনা ছাড়া এ ব্যাপারে কলমধারণ করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সাহস পাচ্ছিলাম না। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে যখন বিভিন্ন বর্ণনা আমার দৃষ্টিগোচর হলো, তখন এলমে হাদীছ ও তাফসীরের বিশেষ পণ্ডিত শায়খে কাবীর ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীরের একটি অভিমত আমার দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি উল্লেখ করেছেন, রসুলেপাক স. মেরাজে যাওয়ার পথে এবং ফেরার পথে উভয় অবস্থাতেই আম্বিয়া কেরামকে নিয়ে নামাজ আদায় করেছেন। তিনি বলেছেন, উভয় অবস্থাতেই যে নামাজ আদায় করেছেন, তার প্রতি হাদীছের ইঙ্গিত রয়েছে। বিপরীত ইঙ্গিত নেই। ওয়ালহামদুলিল্লাহ্।

শায়েখ ইবনে কাছীর র. আরও বলেছেন, কেউ কেউ এরূপ বলে থাকেন, রসুলেপাক স. আকাশে নামাজ কায়েম করেছিলেন। অথচ স্পষ্ট ও বহুবিদিত হাদীছসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, তিনি বাইতুল মুকাদ্দাছে নামাজ কায়েম করেছিলেন এবং তা ফেরার পথে করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি এরূপ বলেননি যে, তিনি দু'খানেই বা উভয় অবস্থাতেই নামাজ কায়েম করেছিলেন। আর এটা যদি স্পষ্ট রেওয়ায়েত ও দেরায়েত দ্বারা প্রমাণিতই হয়ে থাকতো, তাহলে তিনি তা থেকে কেনোইবা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লীম।

নামাজান্তে রসুলেপাক স. যখন মসজিদের বাইরে এলেন, তখন হজরত জিব্রাইল আ. তাঁর সামনে এক পেয়ালা দুধ এবং এক পেয়ালা শরাব পেশ করলেন। বললেন, দুটির মধ্যে যেটি আপনার পছন্দ হয়, গ্রহণ করুন। রসুলেপাক স.

দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করলেন। হজরত জিব্‌রাইল আ. বললেন, আপনি ফিতরত বা স্বাভাবিকতাকেই পছন্দ করলেন। এখানে ফিতরত অর্থ হচ্ছে ইসলাম এবং তার উপর দৃঢ়তা।

মর্মার্থ এই যে, নবী করীম স. ইসলামের শেআর ও তার দৃঢ়তাকেই পছন্দ করে নিলেন। দুধ ইসলামের আলামত এই জন্য যে, এটা পানকারীর জন্য সহজ ও সুপেয়। উন্নতমানের পানীয় দুধকে দ্বীন ও এলেমের প্রতীক মনে করা হয়। স্বপ্নে দুধ পান করার অর্থ হবে, এলেম ও দ্বীন দ্বারা ধন্য হওয়া। আলহামদুলিল্লাহ্! এই কিতাবের গ্রন্থকারও স্বপ্নে বিভিন্ন সময়ে দেখেছিলেন, তাঁর সামনে একটি নতুন পেয়ালা আনা হয়েছে, তা শাদা ও মিষ্টি দুধে পরিপূর্ণ। তিনি উক্ত পেয়ালা থেকে দুধ পান করেছেন।

শরাবের অবস্থা এর বিপরীত। এটি উম্মুল খাবায়েছ অর্থাৎ যাবতীয় খবিছীপনার মূল। এটি মানুষের মধ্যে অন্যায় ও ফাসাদ সৃষ্টি করে। কেউ আবার বলেছেন, ফিতরতের অর্থ খিলকত বা গঠন। আর দেহ গঠনের মূল বস্তু হচ্ছে দুধ ও মাংশ। অস্থিমজ্জা ইত্যাদি বৃদ্ধির মূলও দুধ। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবজাতক সন্তানের পেটে প্রবেশ করে দুধ। দুধ পেটে প্রবেশ করার পর পেটের নাড়ী ভূড়িকে প্রশস্ত করে। আর একথা সুপ্রসিদ্ধ যে, রসুলেপাক স. এর নিকট দুধ খুবই প্রিয় ছিলো। আর শরাবের প্রতি তাঁর ছিলো ঘৃণা, যদিও সে সময় শরাব পান করা বৈধ ছিলো। মেরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো মক্কা মুকাররমায়। আর শরাবের নিষিদ্ধতার বিধান নাযিল হয়েছিলো মদীনা মুনাওয়ারায়। যেহেতু পরিশেষে এটা এক সময় হারাম হবেই, যা আল্লাহ্‌পাকের এলেমে নির্দিষ্ট, তাই তার প্রতি রসুল স. এর মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। জিব্‌রাইল আ. তখন বললেন, আপনি ফিতরতকে পেয়েছেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, আপনি সঠিক রাস্তা গ্রহণ করেছেন। আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ্‌তায়ালা এই সঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন। এক বর্ণনায় এরকম এসেছে, জিব্‌রাইল আ. তখন বলেছিলেন, আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেতো। ব্যাপকভাবে শরাব পানে অভ্যস্ত হতো। পরিণাম হতো বিবাদ আর বিসম্বাদ।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীছে আছে, নবী করীম স. এর নিকট দুধ ও মধুর দু'টি পেয়ালা আনা হয়েছিলো। এক বর্ণনায় আছে, তিনটি পেয়ালা আনা হয়েছিলো। একটি দুধের, একটি পানির, আরেকটি শরাবের। এই বর্ণনায় মধুর উল্লেখ নেই। মোটকথা, নবী করীম স. দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করেছিলেন। আর অন্যান্য পেয়ালার কথা যে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো পেশ করা হয়েছিলো সিদরাতুল মুন্তাহার কাছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন হাফেজ ইবনে কাছির র.।

বর্ণিত আছে, ঐ সময় আম্বিয়া কেরাম আল্লাহ্তায়ালার হামদ ছানা পাঠ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হজরত ইব্রাহীম আ., হজরত মুসা আ., হজরত দাউদ আ., হজরত সুলায়মান আ. এবং হজরত ঈসা আ.ও ছিলেন। তাঁদের প্রশংসা এবং খোতবা ওই সমস্ত ফযীলত, কারামাত ও মোজেজাসমূহের বর্ণনাসম্বলিত ছিলো, যার মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা তাঁদেরকে ধন্য করেছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা শুকুর গুজারীর জন্য তাঁদের যবান মোবারক খুলে দিয়েছিলেন। এরপর সাইয়্যেদে আলম খাতেমুন্নাবিয়্যীন স. তাঁর যবান মোবারক খুললেন। বললেন, আপনারা সকলেই আল্লাহ্ রব্বুল ইযযতের হামদ ছানা পেশ করেছেন। এখন আমিও তাঁর হামদ ছানা পাঠ করছি। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্তায়ালার জন্য যিনি আমাকে সমগ্র আলমের রহমত স্বরূপ, সকল মানুষের জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার উপর কোরআন নাযিল করেছেন, যার মধ্যে সবকিছুর স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আমার উম্মতকে তিনি মধ্যম উম্মত বানিয়েছেন। মর্যাদার দিক দিয়ে তারাই প্রথম উম্মত আর আগমনের দিক দিয়ে সর্বশেষ। তিনি আমার বক্ষকে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন এবং আমার দায়িত্বের বোঝাকে সহনীয় করে দিয়েছেন। আমার নামের আলোচনা উন্নত করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে নবুওয়াতের সিলসিলার উদ্বোধনকারী এবং সমাপ্তকারী বানিয়েছেন।

নবী করীম স. এর প্রশংসাবাণী শোনার পর হজরত ইব্রাহীম আ. আন্যান্য আম্বিয়া কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হলো যে, মোহাম্মদ আপনাদের সকলের চেয়ে উত্তম। এরপর জান্নাতুল ফেরদাউস থেকে একখানা সিঁড়ি আনা হলো, যার ডানে বামে ফেরেশতাবৃন্দ ছিলো। তিনি তার মাধ্যমে আকাশে আরোহণ করলেন। আকাশে পৌঁছে তিনি ওই নবীগণকে দেখতে পেলেন, যাঁদেরকে নিয়োজিত করা হয়েছিলো তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য। বাইতুল মুকাদ্দাছে তাঁদেরকে প্রতিকৃতি স্বরূপ দেখানো হয়েছিলো এবং এখানেও সেরকমই করা হলো। তাঁরা এখানেও তাঁকে সালাম প্রদান করলেন।

হাদীছ শরীফের বর্ণনায় যে সব বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম হাল ও হেকায়েত এসেছে, তা এই– যখন রসুলেপাক স. ষষ্ঠ আকাশে পৌঁছে হজরত মুসা আ.কে দেখতে পেলেন। সেখান থেকে যখন তাঁকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করা হলো, তখন হজরত মুসা আ. কাঁদতে লাগলেন। ক্রন্দনরত অবস্থায় বলতে লাগলেন, এমন পয়গম্বর যাঁকে আমার পর দুনিয়াতে পাঠানো হলো, অথচ তাঁর উম্মত আমার উম্মতের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

উলামা কেরাম বলেন, হজরত মুসা আ. এর এহেন উক্তি প্রতিহিংসাজনিত ছিলো না। কেনোনা ওই জগতে তো কোনো মুমিনের অন্তঃকরণে হিংসার লেশমাত্র থাকবে না। আর একজন পয়গম্বরের বেলায় তো এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আর তিনিও ছিলেন একজন উলুল আযম পয়গম্বর। আল্লাহ্পাক তাঁকে স্বীয় কালাম দ্বারা

সম্মানিত করেছেন। বরং উক্ত উচ্চ মর্তবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে আফসোস করে তিনি উক্তরূপ বক্তব্য রেখেছেন।

আফসোস করার আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে এতোবেশী মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা হয়েছিলো, যা তাঁর পুণ্যে স্বল্পতা এনেছিলো। কেনোনা, নবীর উম্মতেরা যে পরিমাণে নেক আমল করে, ঠিক সমপরিমাণ নেকী আল্লাহ্তায়ালা সেই নবীর আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেন। সেই হিসেবে তিনি নেকীর স্বল্পতাদৃষ্টে উক্তরূপ খেদোক্তি করেছেন। আবার নবী করীম স. এর অনুসরণকারী হবে অসংখ্য, হজরত মুসা আ. এর অনুসারী তার তুলনায় অনেক কম। শায়েখ ইবনে হাজার র. ফতহুল বারী কিতাবে এরকমই আলোচনা করেছেন।

ইবনে আবী জমরা র. যিনি মালেকী মাযহাবের একজন আরেফ ছিলেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক নবীর অন্তরেই রহমত ও মেহেরবানি দান করেছেন। আর এই রহমত সৃষ্টি ও স্বভাবগত হিসেবেই তাদের মধ্যে থাকে। তাই কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের নবী স. কেও ক্রন্দন করতে দেখা গেছে। তা দেখে তাঁকে প্রশ্ন করা হতো, আপনি ক্রন্দন করেন কেনো? তিনি বলতেন, ক্রন্দন করা একটি রহমত। আর আল্লাহ্তায়ালা এই রহমতকারীর উপর রহমত নাযিল করে থাকেন। আম্বিয়া কেরাম আল্লাহ্তায়ালার দেয়া রহমতের পুরা অংশ লাভ করেছেন। তাই তাঁদের হৃদয়ের রহমত বা দয়ার্দ্রতা অন্যান্য লোকের দয়ার্দ্রতা থেকে অধিকতর পূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে হজরত মুসা আ. আপন উম্মতের প্রতি রহমত ও স্নেহপরায়ণতার জন্য ক্রন্দন করেছিলেন। নবী করীম স. এর মেরাজে আগমনের সময় আল্লাহ্তায়ালার দেয়া সাধারণ ফযীলত ও মেহেরবানির সময়। কেনোনা এ সময় আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব স.কে গ্রহণ করবেন। তাঁর সাথে মিলন হবে। এ সময় তিনি আশাবাদী হয়েছিলেন যে, হয়তোবা আল্লাহ্তায়ালা এই বিশেষ মুহূর্তের খাতিরে তাঁর উম্মতের উপর দয়া করবেন। হজরত মুসা আ. নবী করীম স. এর শানে গোলাম শব্দ ব্যবহার করেছেন। গোলাম মানে অপেক্ষাকৃত কম বয়স এই অর্থে তিনি এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। যেহেতু নবী করীম স. এর দুনিয়ার বয়স অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের তুলনায় অল্প ছিলো। পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক যুবকতুল্য শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী ব্যক্তিকে গোলাম বলা হয়।

ফতহুল বারী কিতাবে আছে, হজরত মুসা আ. গোলাম শব্দ বলে ইঙ্গিত করেছেন, রব্বুল ইয্যতের ফজল, করম এবং নেয়ামত যে নবী করীম স. এর প্রতি স্থায়ী শক্তিমত্তা সৃষ্টি করেছে সেদিকে। এই শক্তিমত্তা পরবর্তী জীবনেও পরিদৃষ্ট হয়েছে। তিনি পরিপূর্ণ বার্ধক্যে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও শক্তির খর্বতা, দুর্বলতা, অলসতা, কোনো কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। ঘটনা এমনও ঘটেছে যে,

হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারার লোকেরা তাঁকে নওজোয়ান বলতো। অথচ হজরত আবুবকর সিদ্দীক রা. কে বলতো শায়েখ বা বৃদ্ধ। বস্তুত রসুলেপাক স. এর বয়স আবু বকর সিদ্দীক রা. এর চেয়ে বেশী ছিলো। বান্দা মিসকীন (শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, নবী করীম স. এর পবিত্র মস্তকের কয়েকখানা চুল শাদা হওয়া ছাড়া তাঁর দেহ মোবারকে বার্ধক্যের কোনো আলামতই প্রকাশ পায়নি। কারণ, কেউ যেনো তাঁকে দুর্বল এবং বৃদ্ধ ভাবতে না পারে।

নবী করীম স. এর প্রতি হজরত মুসা আ. এর কোনো প্রতিহিংসা যে ছিলো না তার প্রমাণ হচ্ছে, তাঁর উম্মতের প্রতি হজরত মুসা আ. এর দয়া ও স্নেহমমতা। তাঁর ওসীলায় উম্মতে মোহাম্মদীর প্রতি নামাজের হুকুম পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে পাঁচ ওয়াক্তে নেমে আসে। উলামা কেরাম বলেন, এ উম্মতের প্রতি তাঁর স্নেহপরায়ণ হওয়ার কারণ এই যে, তাওরাত কিতাবে তিনি এই উম্মতের মর্যাদা সম্পর্কে বিস্ত ারিত বর্ণনা পাঠ করেছিলেন এবং এতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা যেনো এই উম্মতকে তাঁর উম্মত বানিয়ে দেন। আল্লাহ্তায়ালা জানিয়ে দিয়েছিলেন, এই উম্মত তো তাঁর হাবীব স. এর জন্য নির্ধারিত। তিনি যেনো এাই আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন। তখন হজরত মুসা নিবেদন করেছিলেন, হে আল্লাহ্তায়ালা! তাহলে তুমি আমাকে সেই নবীর উম্মত বানিয়ে দাও।

সিদরাতুল মুনতাহা

নবী করীম স. কে সিদরাতুল মুনতাহার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। এটি হচ্ছে সৃষ্টজীবের কর্মতৎপরতা এবং এলেমের সমাপ্তিস্থল। আল্লাহ্তায়ালার হুকুম এখানেই নাযিল হয়। এখান থেকে যাবতীয় আহকাম গ্রহণ করার জন্য ফেরেশতারা অপেক্ষমান থাকে। এস্থান অতিক্রম করার অধিকার ও ক্ষমতা কারো নেই। সবকিছু এখানে এসে শেষ হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ নিম্নজগত থেকে ঊর্ধ্বজগতে যা কিছু নিয়ে যান এবং ঊর্ধ্বজগত থেকে হুকুম ও বিধান সংক্রান্ত যা কিছু নিয়ে নিম্নজগতে অবতরণ করেন, এ সবের সংযোগস্থল হচ্ছে সিদরাতুল মুন্তাহা। মাখলুকের দিক থেকে কেউই এস্থান অতিক্রম করতে পারেনি। কেবল রসুলেপাক স. এর ব্যতিক্রম। এ স্থানে আসার পর হজরত জিব্রাইল থেমে গেলেন এবং নবী করীম স. থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। রসুলেপাক স. জিব্রাইলকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন জায়গা এবং পৃথক হওয়ার কারণ কী? তিনি আরও বললেন, এমন স্থানে তো কোনো বন্ধু বন্ধুকে একা ফেলে যেতে পারে না। হজরত জিব্রাইল বললেন, আমি যদি আর এক আঙ্গুলও সামনে অগ্রসর হই, তাহলে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবো।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. জিব্‌রাইল আ. কে বললেন, কোনো নিবেদন থাকলে বলুন। আমি তা জনাবে বারী তায়ালার কাছে পেশ করবো। জিব্‌রাইল বললেন, আমার নিবেদন এটাই, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তায়ালা যেনো আমার বাহুকে আরও প্রশস্ত করে দেন, যাতে আপনার উম্মতকে আমার বাহুতে বহন করে পুলসিরাত পার করে দিতে পারি।

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সিদরাতুল মুনতাহা ষষ্ঠ আসমানে অবস্থিত। আবার অন্য বর্ণনায় এসেছে, পুলসিরাত সপ্তম আসমানে অবস্থিত। পরস্পরবিরোধী দুই বর্ণনার দ্বন্দ্ব সমাধান হতে পারে এভাবে, সিদরাতুল মুনতাহার মূল হয়তো ষষ্ঠ আকাশে। আর তার শাখাসমূহ সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। সিদরাহ্ শব্দের অর্থ বরই গাছ। এটির নাম সিদরাতুল মুনতাহা রাখার স্বার্থকতা সম্পর্কে নবী করীম স.ই ভালো জানেন। গাছটির তিনটি বিশেষত্ব রয়েছে। ১. এর ছায়া সুদীর্ঘ। ২. এর ফল অত্যন্ত সুস্বাদু। ৩. এর ঘ্রাণ অত্যন্ত মনমুগ্ধকর। ইসলামের সাথে এ গাছটির সাদৃশ্য রয়েছে, যা অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং কাজের বাস্ত বায়নের সমন্বয়ে গঠিত হয়। মাটিতে গাছ যেমন লাগানো হয়, আকাশে সম্ভবতঃ সেই গাছটি ঐভাবেই লাগানো আছে। মাটিতে গাছ যেমন প্রতিপালিত হয়, সেরকম বাতাসেও গাছ প্রতিপালিত হতে পারে। এটা আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরতের বাইরে নয়। যেমন রসুলেপাক স. শূন্যমণ্ডলে, হাওয়ায় ভ্রমণ করেছিলেন। আবার এমনও হতে পারে যে, গাছটি জান্নাতের মাটিতে পুঁতে দেয়া হয়েছে। যেমন বেহেশতী বৃক্ষরাজি বেহেশতের মাটিতে প্রোথিত আছে। আবার এমনও হতে পারে, বৃক্ষটি কোথাও পুঁতে দেয়া হয়নি। নিছক আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরতের মধ্যে তার স্থিতি। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্‌পাকই ভালো জানেন।

সিদরাতুল মুনতাহা থেকে প্রবাহিত হয়েছে চারটি নহর। দু'টি জাহেরী আর দু'টি বাতেনী। বাতেনী নহরগুলো জান্নাতে চলে গিয়েছে। আর জাহেরী নহর দুটো এই পৃথিবীর নীল ও ফোরাত। হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদীছ থেকে বুঝা যায়, চারটি নহরই জান্নাতের। সেগুলো হচ্ছে নীল, ফোরাত, সীহান ও জীহান। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নহরসমূহ জান্নাতের— একথার মানে জান্নাতের কল্যাণ ও পরিণাম, যা চিরস্থায়ী হবে। কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাতের নহর মানে জান্নাতের অস্তিত্ব থেকে নির্গত নহর। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

নহরে নীলের অবস্থা বেহেশতী বস্তুর অবস্থার মতই রহস্যময় ও সূক্ষ্ম, যা বুঝতে বুদ্ধি ক্লান্ত হয়ে যায়। এছাড়াও বেহেশতে পানি, দুধ, মধু ও শরাবের নহর প্রবহমান। কোরআন মজীদে এরকম উল্লেখ করা হয়েছে। আবু হাতেম হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. সপ্তম আকাশ পেরিয়ে একটি নহর দেখতে পেলেন। ইয়াকুত ও যমরুদ পাথরের উপর দিয়ে

বয়ে চলেছে নহরটি। তার পাশে পড়ে থাকা পেয়ালাগুলো স্বর্ণ, চাঁদি, ইয়াকুত, মোতি এবং যবরযদের। তার পানি দুধের চেয়ে শাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। এতদৃষ্টে নবী করীম স. বললেন, ভ্রাতা জিব্রাইল! এটা কী? তিনি উত্তর দিলেন, এটা হাউযে কাওছার, আল্লাহ্তায়ালা এটা আপনাকে দান করেছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতে একটি নহর রয়েছে। নাম সালসাবিল। তা থেকে দু'টি ধারা নেমে এসেছে। একটির নাম কাউছার আর অপরটির নাম রহমত। গোনাহ্গার বান্দা দোযখে জ্বলে পুড়ে যখন কালো হয়ে যাবে এবং নবী করীম স. এর শাফায়াতে তারা যখন দোযখ থেকে বের হবে, তখন এই নহরের পানি দিয়ে তাদেরকে গোছল করানো হবে। তারপর তারা পুনরায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

সিদরাতুল মুনতাহা পাখি এবং পতঙ্গের ন্যায় নূর দ্বারা বেষ্টিত। তার প্রত্যেকটি পাতায় একজন ফেরেশতা বসে আছে। এটি এমন এক স্থান যার সংজ্ঞা নির্ণয় ও বর্ণনা প্রদান জ্ঞান ও অনুমানের আয়ত্তাতীত। এখানে আসার পরও নবী করীম স. এর সামনে শরাব, দুধ ও মধুর পেয়ালা পেশ করা হলো। এবারও তিনি দুধই পছন্দ করলেন। এরপর নবী করীম স. এর নিকট বাইতুল মামুর পরিদৃষ্ট হলো। পর্দা সরিয়ে দেয়া হলো। এ সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বর্ণনা এসেছে, অতঃপর আমার সামনে বাইতুল মামুর উপস্থিত করা হলো। এই হাদীছের ব্যাখ্যায় এরকম বলা হয়েছে যে, নবী করীম স. এবং বাইতুল মামুরের মধ্যে হয়তোবা আরও অনেক আলম বিদ্যমান। ওই সকল আলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার মতো শক্তি তাঁর ছিলো না। তাই এ সকল থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়া হলো এবং সবকিছুই তিনি স. ভালোভাবে দেখে নিলেন।

বাইতুল মামুর ওই মসজিদ, যা খানায়ে কাবার ঠিক বরাবর উপরে অবস্থিত। বাইতুল মামুর যদি পৃথিবীতে পতিত হতো তবে কাবা গৃহের উপরেই পড়তো। আদম আ. পৃথিবীতে আসার পর তাঁর জন্যই এই বাইতুল মামুরকে ঊর্ধ্বজগত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা হয়েছিলো। তাঁর ইনতেকালের পর তাকে আবার ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পৃথিবীতে খানায়ে কাবার যা মর্যাদা, আকাশে বাইতুল মামুরের মর্যাদাও সেইরূপ। ফেরেশতাগণ ঊর্ধ্বাকাশে এই ঘরকে তওয়াফ করে এবং তার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করে, যেমন দুনিয়াতে কাবা গৃহের তওয়াফ এবং তার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করে থাকে আদম সন্তানেরা।

দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা বাইতুল মামুর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসে থাকে। জিয়ারত শেষে ফিরে গেলে আর কোনেদিন যিয়ারতের সৌভাগ্য তাদের হয় না। এভাবেই দৈনিক তাদের গমনাগমন হচ্ছে। বাইতুল মামুর সৃষ্টির সময়

থেকেই এই নিয়ম জারী আছে। এটা আল্লাহ্তায়ালার বৃহত্তর কুদরতের নিদর্শন। আল্লাহ্তায়ালা এতো অধিক সংখ্যক ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, যা কল্পনায় ধারণ করা অসম্ভব। হাদীছ শরীফে এসেছে, আসমান যমীনের এমন এক বিঘত জায়গাও বাকী নেই, যেখানে ফেরেশতারা সেজদা করেনি। আর সাগরবক্ষে এমন এক বিন্দু পানিও নেই, যার উপর আল্লাহ্তায়ালা কোনো না কোনো ফেরেশতা নিয়োজিত রাখেননি। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আসমানে একটি নহর আছে, যার নাম 'নহরুল হায়াত'।

জিব্রাইল আ. দৈনিক ওই নহরে গোসল করে থাকেন। গোসল শেষে বাইরে এসে পাখাগুলো ঝাড়া দেন। তখন তাঁর পাখা থেকে সত্তর হাজার পানির ফোটা ঝরে পড়ে এবং আল্লাহ্তায়ালা প্রতি ফোঁটা থেকে একজন করে ফেরেশতা সৃষ্টি করেন।

এই ফেরেশতারাই দৈনিক বাইতুল মামুরে জিয়ারতের জন্য উপস্থিত হন এবং সেখানে নামাজ আদায় করেন। পুনরায় আর কখনো এখানে আসার সুযোগ পান না। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে 'তোমরা যা জানো না এমন জিনিস আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টি করেন'– এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, আতা, মুকাতিল এবং যেহাক প্রমুখ এলমে তাফসীরের ইমামগণ হজরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আরশের ডান দিকে নূরের একটি নহর রয়েছে, যা সাত আসমান, সাত যমীন এবং সাত আলমের সমতুল্য। হজরত জিব্রাইল আ. দৈনিক সেখানে গোসল করেন এবং তাঁর নিজস্ব নূরকে এবং সৌন্দর্যকে আরও বর্ধিত করেন। গোসল সমাপনান্তে তিনি যখন পাখাগুলো ঝাড়া দেন, তখন আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেকটি ফোঁটা থেকে কয়েক হাজার ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। এ সৃষ্টিধারা কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।

এক বিবৃতিতে আছে, সেখানে যতগুলো ফেরেশতা আল্লাহ্তায়ালার তসবীহ পাঠ করেন, আল্লাহ্তায়ালা তার প্রত্যেক তসবীহ থেকে একেকজন ফেরেশতা সৃষ্টি করে দেন। বান্দা মিসকীন (শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, আকাশে ফেরেশতাগণের তসবীহ থেকে যদি আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতা সৃষ্টি করেন, তাহলে পৃথিবীতে আল্লাহ্পাকের দরবারের খাস সালেহ বান্দাগণের তসবীহ তাহলীলের দ্বারাও আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারেন। এটা বিচিত্র কিছু নয়। আল্লাহ্তায়ালা সবকিছুর উপর পূর্ণক্ষমতাবান।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার বলেন, হজরত জিব্রাইল আ. এর পাখার পানির ফোঁটা থেকে যে সকল ফেরেশতা সৃষ্টি হয়, তারা নিম্নোক্ত ফেরেশতাবৃন্দের বহির্ভূতঃ

১. যারা সর্বাক্ষণিক আল্লাহ্তায়ালার ইবাদতে রত। ২. যারা উদ্ভিদ এবং রিযিক সৃষ্টি এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত। ৩. যারা বনী আদমের দেহের আকৃতি বানানোর কাজে নিয়োজিত। ৪. যারা বৃষ্টিবর্ষণের সাথে জড়িত। ৫. যারা জুমার দিন মুসল্লিগণের তালিকা প্রস্তুত করেন। ৬। যারা জান্নাতের প্রহরী। ৭. যারা দিন এবং রাতে বান্দাগণের আমলনামা প্রস্তুত করার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন। ৮. ওই সত্তর হাজার ফেরেশতা যারা সব সময় রসুলেপাক স. এর রওজা শরীফে হাজির থাকেন এবং সেখানকার আমল লিপিবদ্ধ করেন। ৯. ওই সকল ফেরেশতা যারা নামাজী ব্যক্তির সুরা ফাতেহা শেষ হলে আমীন বলেন এবং সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ শেষ হলে রাব্বানা লাকাল হামদ বলেন। ১০. ওই সকল ফেরেশতা যারা নামাজের জন্য অপেক্ষাকারীদের জন্য আল্লাহ্পাকের কাছে দোয়া করতে থাকেন। ১১. স্বামীর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও যে সকল স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে নিশি যাপন করা থেকে দূরে থাকে তাদের উপর লানত বর্ষণ করার জন্য যারা নিয়োজিত। ১২. প্রত্যেক আসমানে আপন আপন দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাবৃন্দ।

হাদীছ শরীফে এসেছে, যে সকল ফেরেশতা আরশবহনকারী, তাদের প্রত্যেকের চেহারা এবং শরীর ভিন্ন ভিন্ন ধরনের– একের সঙ্গে অপরের সাদৃশ্য নেই এবং তারা এত বিশাল আকৃতির যে, তাদের ডানার একটি পালক দ্বারা সমস্ত পৃথিবী আচ্ছাদিত হতে পারে। আরশ বহনকারী ফেরেশতা আটজন। তাদের দেহ এতো বিশালকায় যে, এক কানের লতি থেকে আরেক কানের লতি পর্যন্ত দু'শ বছরের দূরত্ব। আরেক বর্ণনায় আছে, সাত'শ বছরের দূরত্ব। আবুশশায়খ স্বীয় কিতাব 'আলউযমা'য় অনেক বিস্ময়কর বস্তুর বর্ণনা দিয়েছেন। এ সকল বিস্ময়কর সৃষ্টি থেকে খালেক মালেক বারী তায়ালার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা উচিত। তাঁর শক্তি ও শান কতো ব্যাপক কতো বিশাল!

হাদীছ শরীফে এসেছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আমি যখন সপ্তম আকাশে আরোহণ করলাম, তখন ইব্রাহীম খলীলকে বাইতুল মামুরে হেলান দেয়া অবস্থায় দেখতে পেলাম। তার সাথে এক বিরাট জামাত উপবিষ্ট। আমি তাঁকে সালাম প্রদান করলাম। তিনিও প্রত্যুত্তর দিলেন। সেখানে আমি দেখলাম আমার উম্মত দু'ধরনের। একদল শাদা পোশাক পরিহিত। তাদের পোশাকগুলো কাগজের মতো মিহি। অপর জামাতটি ময়লা পোশাক পরিহিত। শাদা পোশাক পরিহিত লোকগুলো বাইতুল মামুরের নিকটে আমার সঙ্গে মিলিত হলো। আর ময়লাকাপড় পরিহিত লোকেরা রইলো পিছনে। আমি শাদা পোশাক পরিহিত লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে বাইতুল মামুরে নামাজ আদায় করলাম। পোশাকের পরিচ্ছন্নতা ও শুভ্রতা সুন্দর আমলের ইঙ্গিতবহ। যেমন 'আপনার লেবাসকে পবিত্র

করুন’ আয়াতে কারীমার তাফসীরে বলা হয়েছে। হাদীছ শরীফে এসেছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আমি ইব্রাহীমের কাছে এমন একদল লোক দেখতে পেলাম, যারা কাগজের মতো সুন্দর এবং শুভ্র। সেখানে আরেক দল লোক ছিলো যাদের দেহবর্ণ অন্ধকার ও কৃষ্ণ। অতঃপর তারা একটি নহরের কাছে এলো এবং সেখানে গোসল করলো। তাতে তাদের কালিমা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেলো। এরপর তারা আরেকটি নহরের কাছে এলো এবং পুনরায় সেখানে গোসল করলো। তাতে তাদের দেহমন পরিপূর্ণভাবে শুভ্র সুন্দর লোকদের মতো হয়ে গেলো। রসুলেপাক স. শাদা বর্ণের লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? আর কালো বর্ণের লোকগুলোই বা কারা? আর হেলান দিয়ে বসে আছেন যিনি, তিনি কে? নহর দু’টিই বা কিসের, যার পানিতে ওরা গোসল করলো?

জিব্রাইল জবাব দিলেন, যিনি হেলান দিয়ে বসে আছেন, তিনি আপনার পিতা ইব্রাহীম। শাদা বর্ণের পোশাক পরিহিত লোকগুলো আপন ইমানকে অন্যায়ের কালিমা দ্বারা কলংকিত করেননি। কৃষ্ণবর্ণের লোকগুলো তাদের সৎকর্মকে অসৎকর্মের সঙ্গে মিশ্রিত করে ফেলেছিলো। কিন্তু পরে তারা তওবা করাতে আল্লাহ্তায়ালা তাদের উপর রহমত করেছেন। আর নহরগুলো হচ্ছে– প্রথমটি নহরে রহমত, দ্বিতীয়টি নহরে নেয়ামত। আরেকটি নহর হচ্ছে, শরাবান তহুরার নহর। কোরআন পাকে এ কথা বলা হয়েছে।

রসুলেপাক স. এর সওয়ারী আরও উপরে উঠলো। এতো উপরে উঠলো যে, সেখানে কলমের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো। কলমের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত তকদীর লিপিবদ্ধ করছিলেন। তকদীরে এলাহী চিরন্তন, কিন্তু তার লিখন ক্রিয়াটি অ-শাশ্বত। আর লওহে মাহফুজে সৃষ্টিজগত সম্পর্কে লেখা হয়েছে আসমান যমীন সৃষ্টিরও আগে। হাদীছ শরীফে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে যা হবে, কলম তা লিপিবদ্ধ করে শুকিয়ে গেছে। এই হাদীছখানা লওহে মাহফুজের লেখা সম্পর্কিত। নবী করীম স. শুনতে পেয়েছিলেন, সেই লেখার আওয়াজ ফেরেশতাগণ মূল লিপি থেকে অনুলিপি করছিলেন। যেমন শবে বরাত ইত্যাদি রজনীতে ভাগ্য লেখা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে বদল ও বাতিলের অবকাশ থাকে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন– ‘আল্লাহ্তায়ালা যা ইচ্ছে করেন মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছে করেন ঠিক রেখে দেন।’ ফেরেশতাবৃন্দের লিপিতে লিপিবদ্ধ করার ব্যাখ্যা এরকমই এসেছে হাদীছ শরীফে। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবের প্রণেতা ইবনে কাইয়্যুম থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এরকম–

তিনি বলেছেন, কলম সর্বমোট বারোটি। মর্যাদার দিক দিয়ে সেগুলো একেকটি একেকরকম। তন্মধ্যে সবচেয়ে উঁচুমানের এবং সম্মানিত কলম হচ্ছে কলমে

কুদরত, যদ্দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টজীবের তকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন। এ মর্মে সুনানে আবু দাউদ কিতাবে হজরত উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রসুলে করীম স. কে এরকম এরশাদ করতে শুনেছি, আল্লাহ্তায়ালা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন কলম। তিনি কলমকে হুকুম করলেন 'লিখ'। কলম নিবেদন করলো 'সৃষ্টির পর কী লেখবো?' আল্লাহ্তায়ালা হুকুম করলেন, কিয়ামত পর্যন্ত যতো মাখলুক সৃষ্টি হবে তুমি তাদের তকদীর লিপিবদ্ধ করো। এটিই সর্বপ্রথম কলম এবং সবচেয়ে সম্মানিত কলম। অনেক মুফাসসির এই কলমের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, এটা ওই কলম, যার কসম করেছেন আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোরআনে মজীদে।

দ্বিতীয় কলম হচ্ছে ওহী লিপিবদ্ধ করবার কলম। তৃতীয় কলম সীলমোহরের কলম, যার মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা নবী রসুলগণকে চিহ্নিত করেন। চতুর্থ কলম তলবে আবদান অর্থাৎ মাখলুকের দেহের সুস্থতার হেফাজত করার কাজে যে কলম ব্যবহৃত হয়। পঞ্চম কলমও সীলমোহরের কলম, যার দ্বারা আল্লাহ্ নওয়াব বাদশাহ্দেরকে নওয়াবী ও বাদশাহীর জন্য চিহ্নিত করে থাকেন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের শাসন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সংশোধন সাধন করা হয়। ষষ্ঠ কলম হিসাব নিকাশের কলম। এ কলম দ্বারা ওই সমস্ত সম্পদের হিসাব নিকাশ করা হয়, যা প্রকাশ করা হয় এবং মাখলুকের জন্য খরচ করা হয় এই কলমকে কলমে আরযাক বা রিযিকের কলমও বলা হয়। সপ্তম কলম হচ্ছে কলমে হুকুম বা হুকুমের কলম, যার মাধ্যমে হুকুমের বাস্তবায়ন করা হয় এবং সৃষ্টজীবের হক ও অধিকার বিদ্যমান রাখা হয়। অষ্টম কলম কলমে শাহাদত যার দ্বারা সৃষ্টিজীবের হক বা অধিকার সংরক্ষণ করা হয়। নবম কলম কলমে তাবীর– এটি ওহী ও সত্য স্বপ্নের কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। দশম কলম কলমে তাওয়ারীখ। পৃথিবীর ঘটনা এবং ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই কলম ব্যবহার করা হয়। একাদশ কলম হচ্ছে লুগাত বা সৃষ্টজীবের ভাষা এবং তার বিস্তারিত অবস্থা লিপিবদ্ধকারী। দ্বাদশ কলম কলমে জামে, যা বাতেলপন্থীদের ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন এবং ধর্মে তাহরীফ বা রূপান্তরকারীদের সন্দেহ দূর করার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। – এ সমূহ কলমই সৃষ্ট জগতের মুসলেহাত বা কল্যাণের কাজের আয়োজন করে থাকে। এই কলমের মর্যাদা ও বুযুর্গী সম্পর্কে বলতে গেলে কোরআনে করীমের কসমই যথেষ্ট। যেমন কোরআনে করীমে উল্লেখ হয়েছে, নূন, ওয়াল কালামে ওমা ইয়াসতুরুন। এক্ষেত্রে একটা কথা স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে। এই কলমের হাকীকত আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল ছাড়া আর কেউ জানে না। দুনিয়ার কলমের মাধ্যমে এলেমের বিষয় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। কলম সম্পর্কে উপরে যা বর্ণনা করা হলো এসবই মালুমাত (জানিত বিষয়) এর অন্তর্ভূত, যা এলেমেরই গণ্ডিভুক্ত।

উপরে যা বলা হলো সেগুলো তার মধ্যে সত্যিই সীমাবদ্ধ থেকে থাকে, তাহলে তো ভালোই। আর যদি প্রকৃত অবস্থা অন্যরকম হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, যা বলা হয়েছে তা সবই মিছালী বা উদাহরণগত বর্ণনা।

এরপর রসুলেপাক স. এর দৃষ্টিতে জান্নাত ও জাহান্নাম উপস্থাপন করা হলো ওই সমূহ রূপ ও সৌন্দর্যাবলীর সঙ্গে যার বর্ণনা কোরআন ও হাদীছে প্রদান করা হয়েছে। তিনি জান্নাতকে দেখতে পেলেন আল্লাহ্তায়ালার রহমতের প্রকাশস্থল রূপে আর দোযখকে দেখলেন আযাব ও গযবের জায়গা হিসেবে। জান্নাত উন্মুক্ত ছিলো। জাহান্নাম ছিলো বন্ধ। রসুলেপাক স. সালসাবীল নামক নহরে গোসল করলেন, তাতে তাঁর জাহের ও বাতেন হুদুদ বা সীমানার মলিনতা থেকে পাক সাফ হয়ে গেলো এবং তাঁকে পূর্বাপর সমস্ত ত্রুটি ক্ষমার তাজ দান করা হলো।

কোনো কোনো বর্ণনায় এরকম এসেছে, অতঃপর নবী করীম স. কে জান্নাতের সুন্দর ও পবিত্রতম একটি বৃক্ষের উপর আরোহণ করানো হলো এবং সেই বৃক্ষের ফল খাওয়ানো হলো। তাঁর পৃষ্ঠদেশ নুৎফায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো। এরপর তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করলেন এবং উম্মুলমুমেনীন হজরত খাদীজাতুল কুবরা রা. এর সঙ্গে নিশিযাপন করলেন। তার ফলে জন্মলাভ করলেন খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতেমাতুয যাহরা রা.। এই বর্ণনা থেকে একটি দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। হজরত ফাতেমা রা. এর জন্ম হয়েছিলো নবুওয়াতের সাত বৎসর বা তারও আগে। অথচ মেরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর। তবে কি নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বেও কোনো মেরাজ সংঘটিত হয়েছিলো? যদি হয় তবে বুঝতে হবে, সেটা হয়েছিলো স্বপ্নযোগে। সশরীরে নয়। এই ঘটনা সম্ভবত স্বপ্নের ঘটনা। সশরীরে মেরাজের ক্ষেত্রে এই আলোচনা আসে না।

দীদারে এলাহী

সাইয়্যেদে আলম স. যখন আল্লাহ্তায়ালার কুদরতের বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখা শেষ করলেন, তখন তাঁর জন্য নৈকট্য, বিশেষত্ব ও হুজুরীর মুহূর্ত উপস্থিত হলো। শেষ সীমা পর্যন্ত উপনীত হতে হতে যাবতীয় বিচ্ছিন্নতার পরিসমাপ্তি ঘটলো। এখানে এসে তিনি হলেন সম্পূর্ণ একা। ফেরেশতা বা মানুষ কেউ তাঁর সাথে রইলো না। কিন্তু তখনও বিদ্যমান ছিলো সত্তর হাজার নূরানী পর্দা। পর্দাগুলো একে অপরের অনুরূপ নয়।

বর্ণনায় এসেছে, একেক পর্দার পুরুত্ব ছিলো পাঁচশ বছরের রাস্তা। তখনও সেই বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করা বাকী। আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যে তিনি সেই পর্দাগুলোও অতিক্রম করলেন। এই মাকামে উপনীত হওয়ার পর এক বিশেষ ধরনের হয়রানী ও স্থবিরতা তাঁকে গ্রাস করলো। তিনি আল্লাহ্তায়ালার জালালাত

ও আযমতই শুধু অনুভব করলেন। আওয়াজ হলো, 'হে মোহাম্মদ থামো, তোমার প্রভুপালক এখন সালাত প্রেরণ করছেন।' শব্দ শুনে তিনি অনুমান করলেন, এটা তো আবু বকরের কণ্ঠস্বরের মত মনে হচ্ছে। চিন্তা করলেন, আবু বকরের কণ্ঠ কোত্থেকে এলো। পরিচিত কণ্ঠধ্বনি শুনে তিনি এক প্রকারের স্বস্তি অনুভব করলেন। এতে ভীতিপ্রদ অবস্থাটা চলে গেলো। এরপর আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর পক্ষ থেকে বলা হলো, 'হে সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ! হে আহমদ! হে মোহাম্মদ! নিকটবর্তী হও।' নবী করীম স. বলেন, অতঃপর আমার প্রভু আমাকে এতো কাছে নিয়ে নিলেন এবং আমি আমার প্রভুর এতো নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যেমন আল্লাহ্তায়ালা এ ব্যাপারে এরশাদ করেছেন, 'অতঃপর তিনি আল্লাহ্তায়ালার নিকটবর্তী হলেন এবং এতো কাছে চলে এলেন যে, ধনুকের দু মাথা বরাবর দূরত্ব অথবা এর চেয়েও কম।' অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা আমাকে কিছু প্রশ্ন করলেন। কিন্তু আমার এরকম চেতনা ছিলো না যে জবাব দেই।

এরপর আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কুদরতী দু'খানা হাত আমার দু'কাঁধের মাঝামাঝি সংস্থাপন করলেন। তাঁর হাতের কোনো রূপ ও আকার ছিলো না। আমি আল্লাহ্তায়ালার কুদরতী হাতের শীতলতা আমার বুকে স্পষ্ট অনুভব করলাম। এরপর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সবকিছুর জ্ঞান আমাতে স্থিত হলো। নবী করীম স. বলেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে বিভিন্ন ধরনের এলেম শিক্ষা দিলেন। এক ধরনের এলেম এমন, যা কারও কাছে প্রকাশ করা যাবে না। এ ব্যাপারে আমার প্রতিশ্রুতিও নেয়া হয়েছিলো। কেনোনা এটি এমন একটি বিষয় যা কোনো সৃষ্টিই সহ্য করতে পারবে না। আরেক প্রকারের এলেম এমন ছিলো, যা মানুষের কাছে প্রকাশ করা না করার ব্যাপারে আমাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিলো। আর এক প্রকারের এলেম উম্মতের প্রত্যেকটি খাস ও আম ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে। এরপর রসুলেপাক স. নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভু! তোমার সকাশে উপস্থিত হওয়ার মুহূর্তে আমার মধ্যে অস্থিরতা এসে গিয়েছিলো। হঠাৎ 'আপনার প্রভুপালক সালাত প্রেরণ করছেন' একথা শুনতে পেলাম, যা আবু বকরের কণ্ঠস্বরের মতো মনে হয়েছে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এখানে আবু বকর কেমন করে এলো। আর আমার প্রভুপালক সালাত আদায় করবেন কেনো? তিনি তো কারো মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে ঘোষণা এলো, অন্যের জন্য সালাত আদায় করা থেকে আমি অমুখাপেক্ষী। আমি আরও ঘোষণা দিচ্ছি যে 'আমার পবিত্রতা, আমার রহমত আমার গযবের উপর অগ্রগামী। হে মোহাম্মদ! এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করো 'আল্লাহ্তায়ালা হচ্ছেন ওই সত্তা, যিনি আপনার উপর দরূদ পাঠ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাবৃন্দও, বিশ্বাসীদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে

ফিরিয়ে নেয়ার জন্য। আর তিনি মুমিনদের ব্যাপারে বড়ই দয়ালু।' এখানে সালাত বা দরূদ যা আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীবের উপর প্রেরণ করেন, তার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হয়।

তারপর হজরত আবু বকরের আওয়াজ শ্রবণ প্রসঙ্গের জওয়াব হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালা মেহেরবানি করে তাঁর হাবীবকে তাঁর প্রিয় সঙ্গী আবু বকরের কণ্ঠস্বরের অনুরূপ কণ্ঠস্বর শুনিয়ে দিলেন, যাতে প্রিয় পরিচিতজনের গলার আওয়াজ শুনে অপরিচিত স্থানের বিস্ময় ও বিহবলতা কাটিয়ে তিনি স্বস্তি লাভ করতে পারেন এবং সন্তাস্থিত হন। ওই সময় আল্লাহ্তায়ালা নবী করীম স. কে লক্ষ্য করে এরশাদ করলেন, হে মোহাম্মদ! আমি যখন তোমার ভাই মুসার সঙ্গে কালাম করতে চাইলাম, তখন তার মধ্যে সাংঘাতিক ভীতিসংকুলতা বিরাজ করছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে মুসা, তোমার ডান হাতে ওটা কী? তখন মুসা তার নিজস্ব পরিচিত জিনিসটির কথা শুনে স্বস্থ হলো। তোমার ব্যাপারেও আমি চাইলাম যে, পরিচিতজনের কণ্ঠস্বর শুনে তুমি যেনো নিজের মধ্যে ফিরে আসো।

তোমাকে মেরাজে আনবো এবং অপরিচিত স্থানে এসে তুমি বিহ্বল হবে, আমি জানতাম। তাই আগে থেকেই তোমার সঙ্গী আবু বকরের আকৃতি দিয়ে একজন ফেরেশতা বানিয়ে রেখেছি। আর সেই ফেরেশতাই কথা বলেছে। আমার অভিপ্রায় নয় যে, ভয়ভীতির কারণে তোমাকে প্রদত্ত জ্ঞান গ্রহণ করতে তুমি কুণ্ঠিত হও। নবী করীম স. বলেন, অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, জিব্রাইল যে কথা আমার কাছে বলতে বলেছিলো, সেটি কী? আমি বললাম, হে বারী তায়ালা! তুমি তো সবই জানো। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, আমি তার ফরিয়াদ মঞ্জুর করলাম। তার বাহুর শক্তি আরও বৃদ্ধি করে দেবো, যাতে করে সে তোমার উম্মতকে পুলসিরাত পার করে দিতে পারে। তবে শর্ত হলো, এটা তোমার ওই উম্মতের জন্য, যারা তোমাকে চায়, ভালবাসে এবং তোমার সংসর্গে থাকে। নবী করীম স. এরশাদ করেন, এরপর আমার জন্য সবুজ বর্ণের রফরফ (গালিচা) বিছিয়ে দেয়া হলো, যার নূর সূর্যের আলোর চেয়ে প্রখর। সে নূরের ঝলকে আমার চোখে নূর চমকাতে লাগলো। আমাকে সেই রফরফে বসানো হলো। রফরফ রওয়ানা হলো। এক পর্যায়ে আমি আরশে আযীমে পৌঁছে গেলাম।

এরপর এমন এক বিশাল ব্যাপার আমার দৃষ্টিগোচর হলো, যার বর্ণনা দিতে রসনা অক্ষম। তারপর আরশ থেকে একফোঁটা পানি আমার নিকটবর্তী হলো এবং তা আমার মুখে পতিত হলো। আমি তার স্বাদ নিলাম। মনে হলো, এর চেয়ে মিষ্টি কিছু কেউ কোনোদিন আস্বাদন করেনি। এতে করে পূর্বাপর যাবতীয় খবর আমার জানা হয়ে গেলো এবং আমার কলব উজ্জ্বলতর হলো। আরশের নূর আমার

চোখকে আচ্ছাদিত করলো। তখন সমস্তকিছুই অন্তরের চোখ দিয়ে দেখলাম। আর আমার পিছন দিকেও ওরকম দেখতে লাগলাম, যেমন সামনে দেখি।

এখানে একটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, উপরের বর্ণনাগুলোর মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত উঁচু স্তরের আলোচনা। এখানে পর্দা ছিলো মাখলুকের দিক থেকে। খালেক আল্লাহ্তায়ালার দিক থেকে নয়। কেনোনা আল্লাহ্তায়ালা তো পর্দাচ্ছাদিত হওয়া থেকে পবিত্র। এমন কোনো বস্তু নেই, যা আল্লাহ্তায়ালাকে ঢেকে ফেলতে পারে। পঞ্চ ইন্দ্রীয় দ্বারা ধারণ করা যায়, এমন জিনিসে পর্দা বেষ্টিত হওয়া সম্ভব। আল্লাহ্তায়ালা পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারেন না। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর আপন নাম, বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত।

প্রত্যেক মাখলুকের জন্যই নূর ও যুলমাতের মাকাম রয়েছে। অনুভূতির এবং মারেফতের এক নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক মুকাররবীন ফেরেশতা, যারা আল্লাহ্তায়ালার আরশের আশপাশে অবস্থান করেন, তারা সকলেই আল্লাহ্তায়ালার কিবরিয়া, জালালত, আযমত ও হায়বতের নূর দ্বারা আচ্ছাদিত। আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীই হেজাব বা পর্দা। আর ফেরেশতাগণ মাহজুব বা আচ্ছাদিত। এসকল ফেরেশতার মর্যাদাও ভিন্ন ভিন্ন। তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট মাকাম ও পদমর্যাদা রয়েছে। এভাবে সমস্ত সৃষ্টিই স্রষ্টা থেকে মাহজুব বা আচ্ছাদিত। কোনো সৃষ্টি নেয়ামত দানকারীর নেয়ামত দর্শন দ্বারা আচ্ছাদিত। হালপ্রাপ্ত লোক বিভিন্ন হালের দর্শন দ্বারা আচ্ছাদিত। সরঞ্জাম গ্রহণকারী সরঞ্জাম দর্শনের দ্বারা আচ্ছাদিত। এভাবেই কেউ এলেম দ্বারা, কেউ বাসনা দ্বারা, কেউ আবার বুদ্ধি দ্বারা আচ্ছাদিত। কেউ আচ্ছাদিত বৈধ কামনা দ্বারা, কেউবা অবৈধ কামনা দ্বারা, কেউ কেউ আচ্ছাদিত গোনাহ্ ও অসুন্দরের পর্দা দ্বারা। কেউ আচ্ছাদিত সম্পদ, সন্তান অথবা অন্যান্য পার্থিব সরঞ্জাম দ্বারা। হে আল্লাহ্! তোমা থেকে আমাদেরকে আচ্ছাদিত কোরো না। দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না।

মানুষেরা আচ্ছাদিত থাকবে– এই ব্যাপারটি সম্পর্কে কোনো কোনো আরেফ বলেছেন– জেনে রাখতে হবে যে 'তিনি নিকটবর্তী হলেন, অতঃপর আরও কাছে গেলেন' এই আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে 'ধনুকের দু'মাথা বা তার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী হলেন' আয়াতখানা। মেরাজের হাদীছসমূহে এরকম ব্যাখ্যা রয়েছে। আর সুরা আন্ নজমে যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রসঙ্গ ভিন্ন। ওখানে নিকটবর্তী হওয়ার সম্পর্কটা হজরত জিব্রাইল আ. এর দিকে করা হয়েছে। সুরা আন্ নজমের আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা সেটাই প্রমাণিত হয়।

কোনো কোনো তাফসীরকার অবশ্য উক্ত আয়াতকেই রসুলেপাক স. এর নৈকট্যের ব্যাপারে প্রমাণ হিসাবে গণ্য করেন, যেমন বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। রবুবিয়াতের দরবারে আবদিয়াতের নেগাবানী হচ্ছে চূড়ান্ত সীমার

আদব ও বুযুর্গী। কলবের প্রশান্তি, বাতেনী এতমিনান, সর্বোচ্চ সাহসিকতা– এসবই দৃষ্টি ও দর্শনের অনুকূলে। এ সবকিছুই রসুলেপাক স. এর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য নিদর্শনাবলী তাঁর সামনে প্রকাশিত হলো। তিনি কিন্তু কোনোকিছুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেননি। কোনো প্রকারের আকর্ষণও ব্যক্ত করেননি। এ মর্মে হক তায়ালা এরশাদ ফরমান, তাঁর দৃষ্টি বিচ্যুত হয়নি এবং অবাধ্যও হয়নি। বাদশাহের দরবারে কোনো বিশেষ ব্যক্তি যেমন, আল্লাহ্পাকের দরবারে তাঁর উপস্থিতি ছিলো তেমনই। সাইয়্যেদে বাশার স. ছাড়া অন্য কারও ভাগ্যে এই অনুগ্রহ জোটেনি।

মানুষের স্বভাব এই যে, উঁচু মর্যাদায় অবস্থান করলে সে মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং আরও অধিক মর্যাদার অভিলাষী হয়। তাই দেখা যায়, হজরত মুসা আ. যখন আল্লাহ্পাকের দরবারে কথোপকথনের মর্যাদা লাভ করলেন, তখন দীদারে এলাহীর বাসনা প্রকাশ করলেন। এটা এক প্রকারের আনন্দ, যাতে মানুষ আপ্লুত হয়ে যায়। কেনোনা নৈকট্যের মাকামে আদবের প্রতি লক্ষ্য কমই থাকে। কিন্তু আমাদের নবী সাইয়্যেদে আলম স. যখন নৈকট্যের মাকামে পূর্ণ কৃতকার্য হলেন, তখন তার যাবতীয় হক পূর্ণভাবে আদায়ও করলেন। যে মাকামে তিনি উন্নীত হয়েছেন, সেখানেই শান্ত থেকেছেন। অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তাই তিনি স্বাভাবিকভাবে একে একে মর্যাদার সকল মনযিলগুলো অতিক্রম করেছেন।

এই অভিযাত্রার সবচেয়ে উঁচু মর্তবা হচ্ছে, দীদারে বারী তায়ালা। এই মাকামে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব স.কে অধিষ্ঠিত করিয়েছেন। তাঁকে সুস্থির রেখেছেন। এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ ফরমান 'তিনি যা দর্শন করলেন, তাঁর অন্তর সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি।' দেখা এবং উপলব্ধি একটি অপরটির সহায়ক হয়েছে। দর্শন যা পেয়েছে চোখের দৃষ্টি তাকে ধারণ করেছে, আর চোখ যা দর্শন করেছে অন্তর তাকে অনুভব করেছে, বিশ্বাস করেছে। সবকিছুই সঠিকরূপে গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে রসুলেপাক স. পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের উপর অগ্রাধিকার লাভ করেছেন। সেজন্যে সকল নবী তাঁর উপর গেবতা (সৌন্দর্যমণ্ডিত ঈর্ষা) করতে লাগলেন। তিনি দুনিয়া এবং আখেরাতে সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন।

তাঁর এহেন প্রতিষ্ঠা লাভের ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোরআন মজীদে কসম করে বললেন 'হে সাইয়্যেদে আলম। প্রজ্ঞাপূর্ণ কোরআনের শপথ, নিশ্চয় তুমি পয়গম্বরগণের মধ্যে একজন, যে সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর রয়েছেন।' 'এটা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ্তায়ালা শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহশীল।' এর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ ফরমান, 'অতঃপর তিনি তাঁর হাবীবের কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, ওহী শব্দটি ব্যাপক

অর্থবোধক শব্দ। যতো প্রকারের এলেম, মারেফত, হাকীকত, সুসংবাদ, ইশারা, সংবাদ, নিদর্শন, কারামাত এবং কামালত আছে সব এই 'ওহী' শব্দটির গণ্ডিতে আবদ্ধ।

উপরোল্লিখিত সকল বিষয়ের আধিক্য এবং বিশালতা সবই এর ভিতরে রয়েছে। কেনোনা এখানে 'ওহী' বলে সেগুলোকে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়নি। কারণ এই যে, এর অন্তর্নিহিতভাব আল্লাহ্তায়ালা এবং তাঁর রসুল ছাড়া অন্য কেউ ধারণ করতে পারে না। অন্যেরা ততটুকুই জানতে পারে, যতটুকু রসুলেপাক স. বর্ণনা করেছেন। কেউ আবার তাঁর পবিত্র রূহের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ হয়ে বাতেনী এলকা হাসিল করতে সমর্থ হয়েছেন। আউলিয়া কেরাম যারা রসুলেপাক স. এর পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগ্যতাকে ও আভিজাত্যকে অধিকার করে নিয়েছেন, কেবল তাঁরাই এই ধরনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ নিগুঢ়তা অর্জনে সফল হয়েছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

অতঃপর রসুলেপাক স. যখন আরশে আযীমে পৌঁছলেন, আরশ তখন তার জালালী বিস্তারকে সংকুচিত করে নিবেদন করলো, আপনিই তো সেই মোহাম্মদ, যাঁকে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর আহাদিয়াতের জালাল দর্শন করিয়েছেন এবং তার সামাদিয়াতের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানিয়েছেন।

আল্লাহ্তায়ালা আমাকে (আকারের দিক থেকে) সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক বানানোর পরও আমি চিন্তাক্লিষ্ট ছিলাম যে, কোন পথে কিভাবে আমি আপনার কাজে লাগতে পারি। মোহাম্মদ আমার সকাশে এলে আমি তাঁর সাথে কী আচরণ করবো, তাই ভেবে হয়রান পেরেশান ছিলাম। পরওয়ারদিগার আমাকে যখন সৃষ্টি করলেন, তখন আমি তাঁর হজরত ও জালালিয়াতের প্রভাবে কম্পমান ছিলাম। এরপর আমার পায়ায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লিখে দেয়া হলে তাঁর ভয়ে আমি আরও কাঁপতে লাগলাম। পরে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ লেখা হলে আমার কম্পন থেমে গেলো। অস্থিরতা দূর হলো। আপনার পবিত্র নামের বরকত আমাতে উদ্ভাসিত হলো। এখন আমার উপর পতিত হলো আপনার শুভদৃষ্টি। কত বরকতের অধিকারীই না হলাম আমি। আপনি তো রসুল, সারা আলমের জন্য রহমত। আপনার রহমতের অংশ আমার জন্যও আছে। হে আল্লাহ্র হাবীব! আমার অংশটুকু এই যে, আপনি আমার সম্পর্কে নিরাপরাধের সাক্ষী ওই সকল মিথ্যা অপবাদকারীদের অপবাদ থেকে, যারা আমার সম্পর্কে বলে হক তায়ালাকে ধারণ করার মতো প্রশস্ততা আমার রয়েছে। তাঁর তো মেছাল (উদাহরণ) নেই। আমি তাঁকে কিভাবে বেষ্টন করতে পারি?

হে মোহাম্মদ! যে জাত পাকের কোনো আকার এবং ধরন নেই, যাঁর সিফত অসংখ্য ও অগণিত, তিনি কেমন করে আমার মুখাপেক্ষী হন? তিনি কিভাবে আমার উপর আরোহণ করতে পারেন। যেহেতু রহমান তাঁর নাম এবং এস্তেওয়া তাঁর সিফাত। তাঁর সিফত তো তাঁর জাতের সঙ্গে মিলিত। সুতরাং আমার সাথে তাঁর মিলিত হওয়া বা পৃথক হওয়া– দু'টির একটিও তো হওয়া সম্ভব নয়। হে মোহাম্মদ! সেই জাত পাকের ইয্যত ও জালালের কসম, আমি মিলনের দিক দিয়ে তাঁর নিকটে, আর বিচ্ছেদের দিক দিয়ে তাঁর থেকে দূরে নই। তাঁকে বহন করার যোগ্যতা আমার নেই। তাঁকে ধারণ করার ক্ষমতাও আমার নেই। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে স্বীয় অনুগ্রহে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাকে তাঁর আদল ইনসাফের দ্বারা যদি নিশ্চিহ্ন করে দেন, তাহলে আমি তো সেক্ষেত্রে নিছক তাঁর কুদরতের মাহমুল এবং মামুল মাত্র।

এতদশ্রবণে নবী করীম স. আরশকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি সরে যাও। আমি তোমা থেকে নির্লিপ্ত এবং অমুখাপেক্ষী। আমার পবিত্র মুহূর্তকে কলুষিত কোরো না। একাকীত্বকে দূষিত করো না। এরপর তিনি আরশের দিকে দৃষ্টি দিলেন। কিন্তু তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন না। আরশের মধ্যে যা কিছু লিপিবদ্ধ ছিলো, তিনি তা পাঠ করলেন। তাঁর দিকে যা ওহী করলেন— এর অন্যতম নিগুঢ়তা এই যে, তাঁর চক্ষু বিচ্যুত হয়নি এবং বিরুদ্ধাচরণও করেনি।

কাবা কাউসাইনে আও আদনা মাকামে উপস্থিত হয়ে নবী করিম স. তাঁর উম্মতের অবস্থা আল্লাহ্তায়ারার কাছে পেশ করলেন। নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভু! আপনি তো অনেক উম্মতকে আযাব দিয়েছেন। কাউকে পাথর বর্ষণ করেছেন, কাউকে মাটিতে প্রোথিত করেছেন, কারও চেহারা বিকৃত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, আমি তোমার উম্মতকে রহমত করবো, তাদের গোনাহ্কে নেকীতে রূপান্তরিত করে দেবো। যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে 'লাব্বাইক' বলবো। যে প্রার্থনা করবে তাকে দান করবো। আমার উপর যে নির্ভর করবে, আমি তাকে অভাবহীন করে দেবো। দুনিয়াতে আমি তাদের গোনাহসমূহ গোপন রাখবো, আর আখেরাতে তোমাকে তাদের শাফায়াতকারী নিযুক্ত করবো।

মেরাজ থেকে প্রত্যাবর্তন

প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে নবী করীম স. আল্লাহ্পাকের দরবারে নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! প্রত্যেক মুসাফিরের জন্য একটা বিদায়ী উপহার থাকে। সফর শেষে বাড়ি ফেরার সময় প্রত্যেকেই আপনজনদের জন্য কিছু না কিছু উপঢৌকন নিয়ে যায়। আমার উম্মতের জন্য এই সফরের উপহার কী?

আল্লাহ্তায়ালা বললেন, তাদের জীবদ্দশায় আমি তাদের জন্য, মৃত্যুর পরেও তাদের জন্য। কবরের মধ্যে এবং হাশরের ময়দানেও আমি তাদের কাছে থাকবো। সর্বাবস্থায় আমি তোমার উম্মতের সাহায্যকারী হবো।

অবশেষে নবী করীম স. পৃথিবীতে ফিরে এলেন। তখন সকাল হয়েছে। তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কিন্তু দুর্বল ইমানের অধিকারী কিছু লোক তাঁর কথায় অবিশ্বাস করে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলো। কিছু মুশরিক দৌড়ে যেয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর কাছে বললো, তোমার বন্ধুর খবর কিছু শুনেছো? সে কী সব কথা বলছে জানো? বলছে, 'আজ রাতে আমাকে বাইতুলমুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো।' হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বললেন, সত্যিই কি তিনি এরকম বলেছেন? মুশরিকেরা বললো, হ্যাঁ। আবু বকর সিদ্দীক রা. বললেন, তিনি যা বলেন, তাতো ঠিকই বলেন, আমি তাঁর কথায় বিশ্বাস রাখি। মুশরিকেরা বললো, সে যে বলছে, আজ রাতে আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো এবং সকালে আমি সেখান থেকে ফিরে এসেছি।–একথাও কি বিশ্বাস করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তিনি এরকমও বলেন যে, আমাকে রাতের বেলায় আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো এবং সেখান থেকে আমি ফিরে এসেছি– তাওতো আমি বিশ্বাস করবো। বাইতুল মুকাদ্দাসের কথা আর এমন কী? সেদিন থেকেই হজরত আবু বকর রা. 'সিদ্দীক' উপাধিতে খ্যাত হয়ে গেলেন।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নবী করীম স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি এদের নিকট বাইতুল মুকাদ্দাসের আলামত বর্ণনা করবেন কি? তিনি বললেন, করবো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, তাহলে দয়া করে বলুন। আমি সেখানে গিয়েছি এবং বাইতুল মুকাদ্দাস স্বচক্ষে দেখেছি। নবী করীম স. বাইতুল মুকাদ্দাসের আলামতসমূহ বর্ণনা করলেন। সবকিছু শুনে হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচিছ, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রসুল। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের আবেদন দ্বন্দ্ব-সন্দেহ বা অবিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ছিলো না। তিনি তো কাফেরদের মুখ থেকে মেরাজের ঘটনা শোনা মাত্রই বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন নবী করীম স. এর এহেন ঘটনার সত্যতাকে আরও অধিক প্রকাশ করে দিতো।

মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. বলেন, ওই সময় বাইতুল মুকাদ্দাসের বিস্তৃত আকার-আকৃতি আমার স্মৃতিপটে ছিলো না। তাই চিন্তিত ছিলাম। ইতোপূর্বে কখনও এরকম চিন্তায় পড়িনি। কিন্তু আল্লাহ্পাক বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে দিলেন। তারা প্রশ্ন করেছিলো। আমি নির্দ্বিধায় উত্তর দিচ্ছিলাম। রসুলেপাক স. এর সামনে বাইতুল মুকাদ্দাস

উপস্থিত হওয়ার তাৎপর্য দু'রকম হতে পারে। হয় বাইতুল মুকাদ্দাসকে সরাসরি যমীন থেকে উঠিয়ে তাঁর সামনে নিয়ে আসা হয়েছিলো। যেমন বিলকিসের সিংহাসনেকে চোখের পলকের পূর্বেই হজরত সুলায়মান আ. এর সামনে নিয়ে আসা হয়েছিলো অথবা রসুলেপাক স. এর সামনে তার প্রতিকৃতি উপস্থিত করা হয়েছিলো। যেমন নামাজের মধ্যে বেহেশত ও দোযখের দৃশ্য বান্দাকে দেখানো হয়ে থাকে। উলামা কেরাম এরকম ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাছাড়া আরেকটি ব্যাখ্যা এরকমও হতে পারে যে, নবী করীম স. এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যবর্তী যাবতীয় পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো। ফলে তাঁর দৃষ্টির সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসই উপস্থিত ছিলো। এ সম্পর্কে একটি বর্ণনা আছে, হজরত আকীল রা. এর ঘরের পাশে বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার চোখের সামনে এনে দেয়া হয়েছিলো। আমি দেখছিলাম আর তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম। হজরত উম্মেহানী রা. এর হাদীছে এসেছে, নবী করীম স. বলেছেন, লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিলো, বাইতুল মুকাদ্দাসের কয়টি দরজা, আমি তো তা গুণে দেখিনি। কিন্তু ওই মুহূর্তে আমার সামনে যা উদ্ভাসিত হয়েছিলো, তাই দেখে আমি তাদেরকে জবাব দিয়েছিলাম।

একটি ঘটনায় বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. মেরাজের সফর থেকে ফেরার সময় কুরাইশদের একটি বণিকদলকে পথিমধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। দলটি তাদের ব্যবসায়ের মাল নিয়ে আসছিলো। তাদের কাফেলায় একটি শাদা এবং একটি কালো বর্ণের উট ছিলো। তারা মাল নিয়ে উটের কাছে এলে একটি উট পালিয়ে গেলো। পরে উটটিকে ধরে নিয়ে আসা হলো। রসুলেপাক স. বললেন, আমি তাদেরকে দেখে সালাম দিয়েছিলাম। তারা বলছিলো, মোহাম্মদের কণ্ঠস্বর মনে হচ্ছে। নবী করীম স. প্রভাতের পূর্বেই ফিরে এলেন এবং এই ঘটনা কাওমের লোকদের কাছে বর্ণনা করলেন। বললেন, আমি তাদেরকে অমুক স্থানে দেখেছি। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিলো, যাকে পরে অমুক ব্যক্তি ঘেরাও করে ধরে নিয়ে এসেছিলো। কাফেলার সামনে শাদা এবং কালো বর্ণের দু'টি উট ছিলো। তাদের পিঠের পালান ছিলো কালো রঙের। সেই কাফেলাটি অমুক দিন এখানে পৌঁছে যাবে।

লোকেরা নির্ধারিত দিনের অপেক্ষায় রইলো। অর্ধদিবস পর্যন্ত নানা ধরনের কথাবার্তা চলতে লাগলো। দিনের শেষদিকে কাফেলা এসে পড়লে রসুলেপাক স. যা যা বলেছিলেন, তার হুবহু প্রমাণ মিললো। মেরাজ অস্বীকারকারী দুশমনদের মুখে তখন কথা নেই। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছিলেন, কাফেলা বুধবারে এসে উপস্থিত হবে। সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু অবস্থা। কাফেলা এলো না। তখন রসুলেপাক স. দোয়া করলেন। দোয়ার বরকতে সূর্যাস্ত বিলম্বিত হলো। এমন সময় কাফেলা এসে উপস্থিত হলো।

আল্লাহ্তায়ালার দীদার সম্পর্কে সলফে সালেহীনের মতানৈক্য

সাহাবা কেরাম, তাবেঈন ও পরবর্তী সলফে সালেহীনের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্তায়ালার দীদার সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন। এমর্মে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. সহ কিছু সাহাবী ও সলফে সালেহীনের একদল না সূচক মত পোষণ করেছেন। ইমাম বোখারী র. হজরত মাসরুক রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে মাতা! রসুলেপাক স. কি আল্লাহ্তায়ালার দর্শন লাভ করেছিলেন?

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেছিলেন, তোমার কথা শুনে আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে গিয়েছে। কেউ যদি বলে, রসুলেপাক স. আল্লাহ্তায়ালাকে দেখেছেন, তাহলে নিশ্চয়ই সে মিথ্যা বলেছে। এরপর তিনি এই আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করেছিলেন, 'কোনো চক্ষু তাকে ধারণ করতে পারে না। তিনিই চক্ষুসমূহকে ধারণ করেন, তিনি সূক্ষ্ম'। খবরদার! মুসলিম শরীফের বিবরণে আছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেছেন, কেউ যদি বলে, মোহাম্মদ তাঁর রবকে দেখেছেন, তাহলে সে খুব জঘন্য কথা বলেছে।

ইমাম নববী ও ইবনে খুযায়মা র. বলেন, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা যে হাদীছ দ্বারা দীদারকে অস্বীকার করেছেন, তা কোনো মারফু হাদীছ নয়। হাদীছ যদি মারফু হতো তবে তিনি তা বলে দিতেন। তদুপরি তিনি উপরোক্ত আয়াত দ্বারা দলীল দিয়েছেন এবং তার উপর নির্ভর করেছেন। অবশ্য কোনো কোনো সাহাবী তাঁর এই অভিমতের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। নিয়ম হচ্ছে কোনো সাহাবী যদি কোনো ব্যাপারে মত পেশ করেন এবং অন্য কোনো সাহাবী তার বিরোধিতা করেন, তাহলে ওই মতটি সর্বসম্মতিক্রমে দলীল হিসেবে গৃহীত হয় না। আর যে আয়াতে কারীমা পেশ করা হয়েছে তার কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

এদরাক– এটি রুইয়াত থেকে খাস, বিশেষতর। এদরাকের অস্বীকৃতি দ্বারা স্বপ্নদর্শনের অস্বীকৃতি বুঝায় না। এদরাক হচ্ছে হাকীকতের মারেফত। আর এটা অবশ্য নেতিবাচক। যেমন চন্দ্রকে কেউ দেখতে পারে, কিন্তু তাই বলে তার হাকীকত ও রহস্য তো লাভ করতে পারে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এদরাকের অর্থ এহাতা বা বেষ্টন। বেষ্টন না করা দর্শন না করাকে বুঝায় না। যেমন কোনো জিনিসের এলেমকে কেউ বেষ্টন করতে না পারলে এটা বুঝায় না যে, তার এলেম নেই। যেমন হাদীছ শরীফে এসেছে, নবী করীম স. বলেছেন, হে আল্লাহ্! আমা থেকে তোমার এমন প্রশংসা হতে পারে না, যেমন তুমি তোমার প্রশংসা করেছো। এদ্বারা এটা বুঝায় না যে, নবী করীম স. আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা করেননি।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. এবং তাবেয়ীগণ আল্লাহ্তায়ালার দর্শনকে প্রমাণ করেছেন। হজরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এক সময় কোনো একজনকে হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর নিকট একথা জানতে চেয়ে প্রেরণ করেছিলেন যে, রসুলুল্লাহ স. কি আল্লাহ্তায়ালাকে দেখেছেন? হজরত ইবনে আব্বাস রা. উত্তরে বলেছিলেন, হ্যাঁ। তিনি আরও বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহীম আ. কে খলীল নির্ধারণ করে, হজরত মুসা আ.কে কলীম বানিয়ে এবং আমাদের পয়গম্বর স. কে রুইয়াত বা দর্শন দিয়ে ধন্য করেছেন।

হজরত হাসান বসরী র. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি কসমের সাথে বলতেন, রসুলে করীম স. আল্লাহ্তায়ালার দর্শন লাভ করেছিলেন। হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রসুলেপাক স. আল্লাহ্তায়ালাকে দেখেছেন। ইবনে খুযায়মা হজরত ওরওয়া ইবনে যুবায়র রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রুইয়াতে বারী তায়ালার মাসআলা হজরত কাআব, হজরত যুহরী, হজরত মুসাম্মার রা. এবং আরও অনেক সাহাবী দৃঢ়তার সাথে প্রমাণ করেছেন। আশআরীর মতও তাই।

ইমাম মুসলিম হজরত আবু যর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রসুলেপাক স.কে আল্লাহ্তায়ালার দর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'তিনি তো নূর, আমি কিভাবে তাঁকে দর্শন করবো?' এই হাদীছখানা ওই হাদীছের বিপরীত যেখানে বলা হয়েছে, 'আমি নূর দেখেছি।' ইমাম আহমদ র. থেকে দর্শনের পক্ষে মত রয়েছে। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতো, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর উক্তিকে আমরা কিসের মাধ্যমে খণ্ডন করবো? তিনি বলেছিলেন, নবী করীম স. এর বাণী দ্বারা, তিনি বলেছেন, 'আমি আমার প্রভুকে দেখেছি।' নবী করীম স. এর বাণী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর উক্তি থেকে উচ্চে।

নাক্কশ ইমাম আহমদ র. থেকে বর্ণনা করেন, লোকেরা যখন ইমাম আহমদ র. কে কথিত প্রশ্ন করেছিলো, তখন তিনি বলেছিলেন, আমি হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীছ দ্বারা জওয়াব দেবো। হজরত ইবনে আব্বাস রা. শেষ নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া পর্যন্ত বলে গিয়েছেন, তিনি তাঁকে দেখেছেন। একদা কিছু লোক হজরত আবু হুরায়রা রা. কে জিজ্ঞেস করলো, রসুলেপাক স. কি আল্লাহ্তায়ালাকে দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ ব্যাপারে সলফে সালেহীনের একটি জামাত মৌনতা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, হ্যাঁ বা না কোনোটাই আমরা জোর দিয়ে বলবো না। কুরতুবীও এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কোনো পক্ষেরই সর্ববাদীসম্মত দলীল নেই। তাঁদের দলীলগুলো পরস্পরবিরোধী। সমন্বয় করার মতো নয়। ব্যাপারটি কোনো আমল সংক্রান্তও নয় যে, দলীলে যন্নীকে যথেষ্ট বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। মাসআলাটি আকীদা বিষয়ক। এক্ষেত্রে অকাট্য দলীলের উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

এ ব্যাপারে একটি সম্প্রদায়ের মত এই— আল্লাহ্‌র দীদার অন্তরের চোখে হয়েছে। চর্মচোখে নয়। অন্তরচোখের দর্শন বলতে ‘কেবল উপলব্ধি বা অনুভবজাত জ্ঞান’ মনে করা যাবে না। কেনোনা এরকম জ্ঞান তো তাঁর সর্বদাই ছিলো। বরং কথাটির তাৎপর্য এই যে, হক তায়ালা রুইয়াত বা দর্শনকে নবী করীম স. এর অন্তরে সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন চোখে সৃষ্টি করেছেন দৃষ্টি। কাজেই অন্তরের জানা এক জিনিস, আর দেখা আরেক জিনিস। এ সম্প্রদায়টি হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. ও হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বিপরীত বিবরণদ্বয়ের এমনভাবে সমাধান টেনেছেন যে, মতানৈক্য আর থাকে না।

বান্দা মিসকীন (শায়েখ মুহাক্কেক আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, দালায়েল, আখবার ও আছারসমূহে দৃষ্টিপাত করার পরে উলামা কেরামের উপরে বর্ণিত মতটিই সাব্যস্ত হয়েছে। একটি সন্দেহ তবু থেকেই যায় যে, মেরাজ যা নবী করীম স. এর সবচেয়ে পরিপূর্ণ মাকাম ও চূড়ান্ত কামালাত, যাতে অন্য কোনো নবী অংশীদার নন। আর এ মাকামের অংশ পাওয়ার সুযোগও কারো নেই। মানুষের জন্যও নেই, ফেরেশতার জন্যও নেই। তাজ্জবের ব্যাপার, হাবীব পাক স.কে নির্জনে নিয়ে যাওয়া হলো, নিকটে নেয়া হলো। কিন্তু মূল ব্যাপার হচ্ছে দীদার, আর সেই দীদার দিয়ে তাঁকে ধন্য করা হবে না, অথবা রসুলেপাক স. দীদার না পেয়ে সন্তুষ্ট হবেন, এ কেমন কথা? যদিও বন্দেগীর পূর্ণতা এবং আল্লাহ্‌তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার পরিপ্রেক্ষিতে যাচ্ঞা না করাই আদব। আলাপনের আস্বাদে মত্ত হয়ে উল্লাস প্রকাশ করা এবং দীদারের বাসনা করা, যেমন মুসা আ. করেছিলেন। কিন্তু কামালে মহব্বত ও মাহবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কী এমন বাধা থাকা সম্ভব যে, মধ্যখানে যবনিকা অবস্থান করবেই? এ দৌলত তো প্রয়াসসাধ্য নয়। এটা মহব্বতের দৌলত। উলামা কেরাম বলেন, হজরত মুসা আ. এর প্রচেষ্টা ও প্রার্থনাই দীদারে এলাহীর অন্তরায় ছিলো। কেনোনা এমনও হয়, কখনও না চাইলেও দেয়া হয়। আবার চাইলেও দেয়া হয় না। এ ব্যাপারে একটি অদ্ভূত কথা এই যে, হজরত মুসা আ. আল্লাহ্‌তায়ালার দীদার চেয়েও পাননি। তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়েছিলেন। আর সেই সময় তিনি তাজাল্লী দেখেছেন যা দেখা সম্ভব ছিলো না। এই দান তিনি তাড়াহুড়া ও অস্থিরতার কারণেই পেয়েছিলেন। হজরত মুসা আ. এর এ দীদার না পাওয়ার প্রকৃত কারণ ছিলো এই যে, তখনও সাইয়েদুল মাহবুবীন স. দীদার পাননি।

উলামা কেরামের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র দীদার সম্ভব নয়। কিন্তু মেরাজ প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের অন্তর্ভূত। দুনিয়ার নয়। আখেরাতে নবী করীম স. যা দর্শন করবেন এবং পাবেন তা আগেই দেখে নিলেন এবং দীদার লাভ করলেন। আর প্রত্যক্ষ দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উম্মতদেরকে আহ্বান করবেন, এটাই সমীচীন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবুওয়াতের এবং রেসালতের বিশুদ্ধতা ও সত্যতার প্রমাণ সংক্রান্ত মোজেজা

অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কাজকেই মোজেজা বলা হয় যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নবুয়তে। মোজেজার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরুদ্ধবাদীকে চ্যালেঞ্জ করা। চ্যালেঞ্জ বলা হয় এমন কাজকে, যাতে উভয়পক্ষ সমান শক্তি সম্পন্ন হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে যে কোনো একপক্ষ বিজয়ী হয়। তবে এটাই সুসাব্যস্ত যে, মোজেজার মধ্যে তাহাদ্দী বা চ্যালেঞ্জ থাকা শর্ত নয়। রসুলে করীম স. এর মাধ্যমে এমন অনেক মোজেজা প্রকাশিত হয়েছে যেগুলোতে চ্যালেঞ্জ ছিলো না। তবে উলামা কেরাম বলেন, বাহ্যত মোজেজার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ দেখা না গেলেও তার মহিমা কিন্তু চ্যালেঞ্জবিহীন নয়। মোজেজা নবুওয়াতের দাবী পেশ করার মাধ্যমে প্রকাশ হতে হবে। একথা সর্বজনবিদিত যে, নবীগণের মাধ্যমে যে অলৌকিকতা সংঘটিত হয়, তাই মোজেজা। আর অলৌকিক কার্যাবলী যদি নবী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায়, যিনি ইমান, তাকওয়া, মারেফত ও দৃঢ়তার অধিকারী, যাকে বলা হয় ওলী, এমন লোকের মাধ্যমে প্রকাশিত অলৌকিক কাজকে বলা হয় কারামত। মুমিন এবং নেককার লোকের প্রকাশিত অলৌকিকত্বকে মাউনত বলা হয়। আর ফাসেক বা কাফেরদের দ্বারা যা প্রকাশ পায়, তাকে বলে এস্তেদরাজ। মোজেজা সম্পর্কে এলমে কালামে বহুবিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এখানে যেটুকু আলোচনা করা অপরিহার্য, তাই শুধু বলা হলো।

আম্বিয়া মুরসালীন সকলেই মোজেজার অধিকারী ছিলেন। মোজেজাবিহীন কোনো নবী ছিলেন না। তন্মধ্যে আমাদের নবী সাইয়্যেদে আলম স. এর মোজেজাসমূহ অন্যান্য নবী থেকে বেশী, পূর্ণ, শক্তিশালী, উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাবসম্পন্ন। পবিত্র কালামে মজীদে নবী করীম স. এর মোজেজা সংক্রান্ত বহু আয়াত ও দলীল বিদ্যমান। তাছাড়া নবী করীম স. এর নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে তওরাত, ইঞ্জীল ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে অনেক কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে নবী করীম স. এর কথা প্রসঙ্গে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যার কিছু অংশ আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া তাঁর জন্ম এবং নবুওয়াতপ্রাপ্তির দিনে যেসব অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছিলো,

তারও আলোচনা করা হয়েছে। যেমন কুফুরীর জগত নিশ্চিহ্ন হওয়া, মুশরিকদের জনপদ পর্যুদস্ত হওয়া। এছাড়াও রয়েছে আরববাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের নানান আলোচনা। এর বিস্তারিত বিবরণ পরে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ্। আসহাবে ফীলের ঘটনা, পারস্যের হাজার বৎসরের অগ্নি-নির্বাপিত হওয়া, কেসরার রাজপ্রাসাদের পাথর পড়ে যাওয়া, সাতয়া সাগরের পানি শুকিয়ে যাওয়া, গণকদের স্বপ্নদর্শন, গায়েবী ঘোষণা হওয়া, গায়েবী আওয়াজ শুনতে পাওয়া ইত্যাদি সবই তাঁর নবুওয়াতের আলামত। জন্মগ্রহণের সময় দুধপান করার সময় থেকে নবুওয়াতপ্রাপ্তি পর্যন্ত এবং নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতার প্রাবল্যের কারণে যেসকল অভূতপূর্ব ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি সংঘটিত হয়েছে তার সবকিছুই বহুবিদিত হাদীছসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অবস্থা ছিলো এই যে, রসুলেপাক স. এর এমন কোনো সম্পদ ছিলো না, যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেন, বা তাঁর সম্পদের লোভে পড়ে মানুষ তাঁর অনুগত হয়ে যেতে পারে। আবার শারীরিক শক্তিও এমন কিছু ছিলো না যে, তাঁর ভয়ে মানুষ ভীত হয়ে তাঁর অনুগত হয়েছিলো। যেদিন তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন এবং দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে মানুষের কাছে গেলেন, তখন তাঁর সৈন্যসামন্তও ছিলো না, ধনসম্পদও ছিলো না। সেসময় মানুষ ভেসে যাচ্ছিলো মূর্তিপূজা আর মূর্খতামণ্ডিত আচার সংস্কারের নির্বাধ প্রবাহে। কুসংস্কার, হিংসাবিদ্বেষ এবং হত্যালীলা ছিলো নিয়মিত ব্যাপার। এ সমস্ত অপকর্ম সম্পাদনের পরিণতি সম্পর্কে তারা চিন্তাই করতো না। আযাব বা শাস্তির ভয় ছিলো না তাদের। নিন্দা তিরস্কারের আশংকাও তারা করতো না। এ ধরনের জঘন্য অবস্থা ও কাজ নবী করীম স.ই সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তাদের অন্তঃকরণে বইয়ে দিয়েছিলেন প্রেম ভালোবাসার সুকুমার স্রোত। এক কলেমার নীচে সমবেত করেছিলেন সকলকে। তাদের অবস্থা এরূপ হয়ে গিয়েছিলো যে, অভিমতসমূহ একিভূত এবং অন্তররাজি সমন্বিত হয়ে গিয়েছিলো। সকলেই তাঁর অনুগত হয়েছিলেন। সত্যের সাহায্যের ব্যাপারে বিভিন্ন লোকের হৃদয় একই হৃদয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁরা নবী করীম স. এর রূপসৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ভালোবাসায় জন্মভূমি শহর, বাড়িঘর বিসর্জন দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। আপন কাওম ও আপনজন থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য জীবন, সম্পদ উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হননি। রসুল করীম স. এর সম্মানার্থে জীবনকে তলোয়ারের নীচে স্থাপন করতে দ্বিধা করতেন না। অথচ নবী করীম স. এর এমন কোনো বিত্তবৈভব ছিলো না যে, সেগুলোর লালসা তাঁদের পেয়ে বসতে পারে। বরং নবী করীম স. কে দেখা গেছে ধনীকে দরিদ্র বানিয়ে দিয়েছেন, আবার শরীফ ব্যক্তির সাথে বিনয় প্রদর্শন করেছেন। এই সমস্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য কি কোনো এক ব্যক্তির মধ্যে

সন্নিবেশিত হতে পারে? চিন্তা ফিকিরের এবং চেষ্টার মাধ্যমে এগুলো অর্জন করা কি সম্ভব? তিনি ছিলেন এতীম। ছিলো না ধনসম্পদ, সাহায্য উপকরণ, যশপ্রতিপত্তি। তেমন সাহায্যকারীও ছিলো না। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে এমন সম্মান, শক্তি, ক্ষমতা, সাহায্য, সহযোগিতা, মানমর্যাদা প্রদান করেছিলেন যে, তিনি হয়েছিলেন সকলের মধ্যমনি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের চরম দৃঢ়তা তাঁকে দান করা হয়েছিলো। তাঁর কসমের বাণী "লাওয়াল্লাহে" (আল্লাহ্র কসম) সকলকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিলো। এ সমস্ত বিষয় নিয়ে কোনো বুদ্ধিমান যদি চিন্তা করে, তাহলে তার সন্দেহ করার ক্ষমতা আর থাকবে না। তার পূর্ণ বিশ্বাস হবে, এ সব কিছুই আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ ও আসমানী শক্তিমত্তার নিদর্শন। মানবীয় শক্তিতে এ পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়।

উম্মী হওয়া

রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতের একটি অন্যতম দলীল এই যে, তিনি উম্মী বা অক্ষরের অমুখাপেক্ষী ছিলেন। তিনি লিখতে জানতেন না। তাঁর জন্ম হয়েছিলো এমন সম্প্রদায়ে যারা সকলেই ছিলেন নিরক্ষর। তাঁর প্রতিপালন হয়েছিলো এমন এক শহরে যেখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকারী কেউ ছিলো না। তিনি এমন কোনো শহরে কখনও সফরও করেননি, যেখানে ছিলো জ্ঞানী ব্যক্তিদের বসবাস। তাহলে তাঁর লেখাপড়া শিখে নেয়া সম্পর্কে ধারণা করা যেতো। তাহলে হয়তোবা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব তওরাত-ইঞ্জিলের জ্ঞান লাভ করতে পারতেন এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের খবর ও তাদের অবস্থা জেনে যেতেন। তখন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের বড় বড় আলেমও ছিলেন, যাঁরা আপন আপন স্থলে ছিলেন খ্যাতিমান। তৎসত্ত্বেও রসুলেপাক স. ওই সকল জাতির প্রত্যেক শাখার অনাচার সম্পর্কে এমন এমন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, যা ওই আলেমেরা সমন্বিত চেষ্টাতেও পারতেন না। এটাই এ কথার সর্বপ্রথম দলীল যে, রসুলেপাক স. এর কাছে ছিলো আল্লাহ্তায়ালারই রক্ষিত আমানত। একথাটি ভালোভাবে চিন্তা করা উচিত যে, শিক্ষাগ্রহণ এবং জ্ঞানার্জন ছাড়াই তিনি এলেম ও মারেফতের যে মাকামে উপনীত হয়েছিলেন, সেখানে উপনীত হওয়া পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এও চিন্তা করা উচিত, আরবের যে লোকগুলো মূর্খতা, অজ্ঞতা এবং অসততার দিক দিয়ে নিম্নতম স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো, তাঁরই স. শিক্ষা ও পরিচর্যায় সততার কতইনা উচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো তারা। এসব ছিলো আল্লাহ্তায়ালার দান। কেউ যদি নবী করীম স. এর চরিত্র, গুণাবলী, পূর্ণত্ব, বিনয় ও শিষ্টাচার সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখে তবে প্রথমেই তার মনে হবে, তাঁর মতো মানুষ পৃথিবীতে আসেননি।

শ্রেষ্ঠ মোজেজাঃ কোরআন মজীদ

নবী করীম স. এর মোজেজাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, উজ্জ্বল, বহুবিদিত এবং সদাবিদ্যমান মোজেজা হচ্ছে কোরআন মজীদ। এ মোজেজাখানা কিয়ামত পর্যন্ত মোজেজা থাকবে। আল্লাহ্তায়ালার বাণী, 'ইন্না আ'ত্বইনা কাল কাউছার'- এর পরিপ্রেক্ষিতে এ মোজেজাখানা সংখ্যাধিক্যের প্রতিনিধিত্ব করে। এই সুরা কোরআন মজীদের সবচেয়ে ছোট্ট সুরা। এর মধ্যে সন্নিবেশিত মোজেজা গণনা করে শেষ করা যায় না। এ সুরা দিয়ে পরীক্ষা করলে গোটা কোরআন মজীদে ও অন্যান্য মোজেজার পরিমাণ নির্ধারণ করা কী করে সম্ভব?

কোরআন মজীদ মোজেজা হওয়ার দিকসমূহ

মোজেজা হওয়ার দিক ও দৃষ্টিকোণ কোরআন মজীদে অনেক রয়েছে। কোরআন মজীদ মোজেজা হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করাটা নির্ভর করবে তার মোজেজার দিক ও দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার উপর। সাধারণতঃ তার এজাজের দিকটি হচ্ছে, রসুল স. এই কোরআনের মাধ্যমে বিশ্বমানবতার কাছে চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হলেন। কেউ যদি পারে তাহলে যেনো এই কোরআনের মতো একটি সুরা প্রস্তুত করে আনে।

যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আমি যা আমার রসুলের নিকট নাযিল করেছি সে ব্যাপারে তোমরা যদি সন্দিহান হও, তাহলে এর মতো আর একখানা সুরা নিয়ে এসো।' এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা কেউ করতে পারেনি। এই কালাম মৃতদের জীবিত হয়ে যাওয়া, অন্ধদের চক্ষুষ্মান হওয়া এবং বধিরদের কণ্ঠ ও শ্রবণেন্দ্রিয় খুলে যাওয়া ইত্যাদির দিক দিয়ে বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী ছিলো।

আরবের ফাসাহাত বালাগাতের পণ্ডিতবর্গ এবং শীর্ষস্থানীয় ভাষাবিদেরা যে কালাম পেশ করেছিলো, সেগুলো ভাব, তাৎপর্য, শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে আরবদের আপন আপন জাতীয়তার গন্ধমিশ্রিত ছিলো। তাই তাদের পেশকৃত কালাম কোরআনের কাছে অক্ষম হতে বাধ্য হয়েছিলো। আর তাদের এহেন অক্ষমতা হজরত ঈসার মৃতকে জীবিত করা, অন্ধকে চক্ষুষ্মান করা এবং কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করে দেয়ার চেয়েও বিস্ময়কর ছিলো। কেনোনা হজরত ঈসা আ. এর এসব মোজেজা যারা দেখেছে তাদের জন্য এগুলো ঈসা আ. এর পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ছিলো না যে, সে চ্যালেঞ্জের কাছে তারা পরাজিত হয়েছে। আর হজরত ঈসা আ. মোজেজা প্রদর্শন করে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু কোরআনের ব্যাপারে তো তাদেরকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। আর তারা পরাজিতও হয়েছে। আর হজরত ঈসা আ. এর মোজেজা যারা দেখেছে, তাদের তো এ বিদ্যায় পারদর্শিতা

ছিলোই না। কিন্তু নবী করীম স. যাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন, তারা ছিলো ভাষায় পারদর্শী। ফাসাহাত, বালাগাত ও সম্ভাষণযোগ্যতা ছিলো তাদের অসাধারণ। চর্চা ছিলো শাণিত। এহেন অবস্থায় তাদের অক্ষম হওয়া নবী করীম স. এর রেসালাতের বিশুদ্ধতার সহায়ক এবং অকাট্য দলীল।

আবু সুলায়মান খাত্তাবী র. প্রসিদ্ধ হাদীছ বিশারদ ও ব্যাখ্যাকারগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, সাইয়্যেদে আলম স. অক্ষরজ্ঞানহীন হলেও সবচেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক বিদ্যান এক্ষেত্রে তাঁর আনীত কোরআনের মতো কালাম তারা মোকাবেলা করতে পারবে না— এটাই স্বাভাবিক। তিনি এরকম মহাজ্ঞানী না হলেও তাদের পক্ষে কোরআনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিলো না। তখনও তারা জ্ঞান, বুদ্ধি ও শিক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ের ওই পর্যন্ত পৌঁছতে পারতো না। তাদের জন্য 'তোমরা কক্ষণও পারবে না' এই চ্যালেঞ্জ থেকেই যেতো। মোটকথা, রসুলেপাক স. তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন এবং তারা এর মোকাবেলা করতে চরমভাবে অক্ষম হলো। খণ্ডনের চেষ্টার সময় বালাগাত বা ভাষালংকারে তারা ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হলো। তারপর তাদেরকে সমন্বিতভাবে চেষ্টা করতে বলা হলো। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কোনো ভাষাবিদ, অলংকারবিদকে পাওয়া গেলো না যে, মোকাবেলার ময়দানে দণ্ডায়মান হয়। তাদের এহেন অবস্থা দেখে আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে বলে দেয়া হলো, সমস্ত মানুষ ও জ্বীন মিলেও এই কোরআনের অনুরূপ কিছু প্রস্তুত করতে পারবে না— একে অপরের সাহায্যকারী হলেও।

হাদীছ শরীফে এসেছে, একদা নবী করীম স. মসজিদে হারামের এক প্রান্তে একাকী বসেছিলেন। কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি উৎবা ইবনে রবীআ কুরাইশদের মজলিশে বলতে লাগলো, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি এ মুহূর্তে ওই লোকটির (মোহাম্মদ স.) কাছে কিছু প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছি। আশা করি এর মধ্যে কিছু প্রস্তাব তিনি কবুল করবেন, ধর্মপ্রচারের কাজ থেকে বিরত হবেন এবং আমাদের পিছু নেয়া ছেড়ে দিবেন। লোকেরা বললো, ঠিক আছে আবুল ওলীদ তুমি যাও। এরপর উৎবা রসুল স. এর কাছে গিয়ে বসে পড়লো এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিলো।

রসুল স. কে সে ধনদৌলতের লোভ দেখিয়ে বললো, আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন। রসুলেপাক স. বললেন, হে আবুল ওলীদ, তোমার কথা কি শেষ হয়েছে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এখন আমার কথা শোনো। সে বললো, বলুন। আর আপনার মনে যা চায় তাই বলুন। রসুলেপাক স. তখন এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করলেন 'পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে অবতারিত এ কিতাবের আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে আরবী কোরআন

রূপে ওই সম্প্রদায়ের জন্য যাদের বিবেক আছে। নাযিল করা হয়েছে সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে।'

উৎবা চুপচাপ মনযোগ দিয়ে শুনছিলো। তার হাত দু'টি পিঠের পিছন দিকে নিয়ে তার উপর হেলান দিয়ে বসেছিলো সে। রসুলেপাক স. তেলাওয়াত করতে করতে সিজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলে সেজদা করলেন। এরপর বললেন, হে আবুল ওলীদ! শুনেছো। সে বললো, শুনেছি। আপনি আপনার কাজে মশগুল থাকুন, আর কারো ব্যাপারে কোনো আশংকা করবেন না।

উৎবা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলো। তাকে দেখে লোকেরা বলতে লাগলো, আল্লাহ্‌র কসম! উৎবা বিষণ্নমুখে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে এসেছে। উৎবা বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আজ আমি এমন কালাম শুনেছি যা ইতোপূর্বে কখনও শুনিনি। আল্লাহ্‌র কসম! এ বাণী কোনো কাব্য নয়, যাদুও নয়। গণকের কথাও নয়। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা তাঁকে তাঁর কালামের মধ্যেই থাকতে দাও, কেনোনা তিনি সত্য পথেই আছেন। এই কালামের ব্যাপারে আমি কসম করে বলবো যে, এই কালাম বড়ই মর্যাদামণ্ডিত। আল্লাহ্‌র কসম! এটা খুবই বিস্ময়কর জিনিস। তোমরা ভালো করেই জানো যে, তিনি যা বলেন, তা কখনও মিথ্যা হয় না। আর তিনি দোয়া করলে অগ্রাহ্য হয় না। আমি ভয় করছি, না জানি আযাব নাযিল হয়ে যায়। –বায়হাকী প্রমুখ ইমামগণ এই রেওয়ায়েত করেছেন।

নিম্নোক্ত হাদীছখানার মধ্যে হজরত আবু যর রা. জড়িত রয়েছেন। তিনি তখনো নবী করীম স. এর নিকট উপস্থিত হননি। একদিন তিনি তাঁর ভাই উনাইসকে রসুলেপাক স. এর নিকট প্রেরণ করলেন তাঁর অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে এবং তাঁকে নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে। হজরত আবু যর রা. বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার ভাই উনাইসের চেয়ে বড় কবি আমি দেখিনি বা তার চেয়ে বড় কবি কেউ আছেন বলেও শুনিনি। জাহেলী যুগে বারোজন কবিকে সে পরাজিত করেছিলো। আর সে বারোজনের মধ্যে স্বয়ং আমিও একজন ছিলাম। সে একদিন মক্কা মুকাররমায় গিয়ে ফিরে এসে আমার কাছে রসুল করীম স. এর কথা বললো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সাধারণ মানুষ তাঁর সম্পর্কে কী মন্তব্য করে? সে বললো, কোনো কোনো মানুষ তাঁকে কবি বলে, আবার কেউ বলে গণক। আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিজেও একজন কবি। আর গণকদের কথাও আমি শুনেছি। তিনি কবি কিছুতেই নন। গণকেরা যেরকম কথা বলে, তাঁকে সে রকমও মনে হয়নি আমার। তিনি সত্যবাদী, আর ওই মানুষগুলোই মিথ্যাবাদী।

ওলীদ ইবনে মুগীরা কুরাইশ বংশের মধ্যে সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলো। সে একবার কোরআন করীম শ্রবণ করে বলেছিলো, আল্লাহ্‌র

কসম! নিশ্চয়ই এই কোরআন মিষ্টিমধুর এবং শ্রুতি সুখকর। এই কালামের মধ্যে এমন ঔজ্জ্বল্য এবং সজীবতা রয়েছে, যা অন্য কিছুতে নেই। নিশ্চয়ই এর উপরের অংশ ফলদার আর এর নিচের অংশে সুশীতল ধারা প্রবহমান। আর এটি মানুষের কথা নয়। নিশ্চয়ই এ কোরআন বিজয়ী হবে, তাকে বিকৃত করা যাবে না।

ইবনে ওলীদ তার কাওমের লোকদের কাছে আরও বলতো, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের কবিতা সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল কেউ নেই। আর জান্নাতের কবিতা জাননেওয়ালাও কেউ নেই। আল্লাহ্‌র কসম! মোহাম্মদ স. যা বলে থাকেন তার চেয়ে উত্তম কালাম হতেই পারে না।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, এক বৎসর হজের সময় কুরাইশদের সমস্ত মানুষ একত্রিত হলো। সে সময় ওলীদ ইবনে মুগীরা বললো, এ সময় আরবের সমগ্র দল এসে উপস্থিত হয়েছে। এ মুহূর্তে আশা করা যায় যে, সকলেই একটি মতের উপর ঐকমত্য স্থাপন করবে। একে অপরকে হয়তো মিথ্যা সাব্যস্ত করবে না এবং পারস্পরিক মতপার্থক্য দূর হয়ে যাবে। এ কথা শুনে সকলেই বলে উঠলো, আমরা সলেই একমত হয়ে ঘোষণা দিলাম– ওই লোকটি (মোহাম্মদ স.) একজন গণক। ওলীদ বললো, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কোনো গণক নন এবং গণকদের মতো তাঁর কথার মধ্যে গুণগুণ ধরনের কোনো শব্দও নেই। তখন লোকেরা বললো, তাহলে আমরা তাকে উন্মাদ বলবো। সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম তিনি পাগলও নন। মানুষের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে জ্ঞানবান। লোকেরা বলতে লাগলো, তাহলে আমরা তাঁকে কবি বলবো। সে বললো, তিনি কবিও নন। আমি কবিতা এবং তার প্রকারভেদ সম্পর্কে জানি। রেজেয, হেজেয, মারসুত ও মাকবুথ– কবিতার এ সমস্ত প্রকারভেদ আমার খুব ভালো করে জানা আছে। তখন লোকেরা বললো, তাহলে আমরা বলবো, সে যাদুকর। ওলীদ বললো, তিনি যাদুকরও নন। তাঁর কাছে কোনো ঝাড়-ফুঁক, তাবীয তুমার নেই। তোমরা তাঁর সম্পর্কে যা কিছুই বলো না কেনো, আমি বলবো, তিনি মিথ্যাচারী নন। এই হাদীছখানা ইবনে ইসহাক এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো বিদ্বান এরকম মন্তব্য করেছেন, এই কোরআন মজীদ যদি কোনো অরণ্যে অথবা মরুভূমিতে গ্রন্থাকারে পাওয়া যেতো এবং কেউ যদি নাও জানতো যে, এই গ্রন্থ কে রেখে গেছে, তবুও সমস্ত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা ও সুদৃঢ় চেতনা একথাই সাক্ষ্য দিতো যে, এই কিতাব আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ থেকেই অবতারিত। কোনো মানুষ এরকম গ্রন্থ রচনা করতে পারেনা। কোনো বুদ্ধিমান, সত্যবাদী এবং মুত্তাকী লোকের হাতে এই কোরআন এলে তিনি বলতে বাধ্য হবেন যে, এ কিতাব আল্লাহ্‌তায়ালার কালাম। এর মধ্যে মানুষকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, তারা যেনো এর মতো একখানা সুরা রচনা করে নিয়ে আসে। কিন্তু সবাই ব্যর্থ হয়েছে। তারপরেও সংশয় সন্দেহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ কেমন করে থাকতে পারে? কোরআন মজীদ যে মোজেজা তা জানবার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি এটাই। আর কোরআনকে মোজেজা হিসেবে বুঝবার সবচেয়ে সহজ পথ এই যে, এই

কোরআন সাব্যস্ত হয়েছে নবী করীম স. এর বাণীর মাধ্যমে। আর নবী করীম স. যে আল্লাহ্‌র নবী, তা সাব্যস্ত হয়েছে তার মোজেজাসমূহের মাধ্যমে।

কোরআন মজীদকে মোজেজা হিসেবে বুঝবার বিস্তারিত তরিকা হচ্ছে, এর ফাসাহাত, বালাগাত, বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম বর্ণনাভঙ্গি, গায়েবী সংবাদ প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা। অবশ্য এই তরিকাটি তাঁদের জন্য সহজবোধ্য হবে, যাঁরা আলেম। তাঁরাই ফাসাহাত বালাগাতের অর্থ ভালো জানেন। তবে সাধারণের জন্য এই তরিকা চিনবার আরও ভিন্ন ভিন্ন উপায় রয়েছে। যেমন এজাজ অর্থাৎ আলফাজ। সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক এবং তা অলংকারময়। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী 'তোমাদের জন্য কেসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন।' এখানে 'আলক্বিসাসু হায়াত' দু'টি শব্দের মধ্যে অক্ষরের সংখ্যা মাত্র দশটি কিন্তু এর মধ্যে অনেক রকম অর্থ প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

হজরত আবু ওবায়দা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে— এক বেদুইন কোনো একজনকে 'ফাসাদা বিমা তু'মার' আয়াতখানা পাঠ করতে শুনলো। তৎক্ষণাৎ সে সেজদায় পড়ে বলতে লাগলো, আমি এই কালামের ফাসাহাতকে সেজদা করছি। আরেক বেদুইন এক ব্যক্তিকে এই আয়াতটি পাঠ করতে শোনার পর বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এই কালামের অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা কারো নেই। বর্ণিত আছে, হজরত ওমর ফারুক রা. একদিন মসজিদে নিদ্রাভিভূত ছিলেন। অকস্মাৎ রোমের বাদশাহ্‌র তরফ থেকে এক দূত এসে তাঁর শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে গেলো। দূতটি তাঁকে দেখামাত্র সত্যের সাক্ষ্য দিতে লাগলো। দূতটির আরবী ভাষার উপর ভালো দখল ছিলো। সে বললো, আমি মুসলমান বন্দীদের মধ্যে একজন বন্দীকে তোমাদের কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করতে শুনেছি। তারপর আমি উক্ত আয়াতখানার ব্যাপারে খুব চিন্তা করতে শুরু করলাম। তারপর দেখতে পেলাম, হজরত ঈসা ইবনে মরিয়মের উপর দুনিয়া এবং আখেরাত সংক্রান্ত যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছিলো, তার সাথে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। তদুপরি আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ওই আয়াতে ওই সমস্ত কথাই অত্যন্ত সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেই আয়াতখানা হচ্ছে– 'যারা আল্লাহ্ ও তার রসুলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং তাকওয়া গ্রহণ করবে, তারা কৃতকার্য হবে।'

আসমায়ী র. থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি একটি মেয়েকে অত্যন্ত ফাসাহাতপূর্ণ কথা বলতে শুনলেন। তার ফাসাহাতের উপর এরূপ দক্ষতা দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তখন মেয়েটি বললো, আপনি কি আমাকে কালামে এলাহীর চেয়ে অধিক ফাসাহাতবিদ মনে করে নিলেন? স্মরণ করুন আল্লাহ্‌তায়ালার ওই উদ্ধৃতিটি— (আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন) 'আমি মুসার মায়ের নিকট সংবাদ পাঠালাম, তাকে দুধ পান করানোর জন্য। অতঃপর তুমি তার ব্যাপারে যদি কোনোরূপ আশংকা করো তাহলে তাকে দরিয়ার ঢেউয়ের মধ্যে ছুঁড়ে

দাও। তার জীবনের জন্য ভয় কোরো না। চিন্তাও কোরো না। আমি তাকে তোমার নিকট পুনরায় ফিরিয়ে দেবো এবং আমি তাকে পয়গম্বরগণের অন্তর্ভূত করবো।'– এই ছোট্ট আয়াতখানার মধ্যে দু'টি আদেশ, দু'টি নিষেধ, দু'টি বিজ্ঞপ্তি এবং দু'টি সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ্তায়ালার এই বাণীটিও শুনুন– 'তুমি তার কথার উত্তর তার চেয়ে ভালো কথা দ্বারা প্রদান করো। তখন অকস্মাৎ দেখবে, তোমার এবং তার মধ্যে যে দুশমনী রয়েছে, তা দূর হয়ে এমন হয়ে যাবে, সে হবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।' এরকম আরো আয়াতে করীমা রয়েছে। যেমন 'হে যমীন! তুমি তোমার পানি শোষণ করে নাও। আর হে আকাশ! তুমি ফেটে যাও।' এ জাতীয় বহু আয়াত রয়েছে যার মধ্যে শব্দ সংক্ষেপণ সত্ত্বেও অর্থের আধিক্য, ভাবের বিশালতা, সুন্দর শব্দবিন্যাস ইত্যাদির সমাহার ঘটেছে। তাছাড়া দীর্ঘ ঘটনার বর্ণনা এবং পূর্ববর্তীদের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বর্ণনার অবস্থাও তদ্রূপ। যেমন কোরআনে করীমে হজরত ইউসুফ আ. এর যে সুদীর্ঘ ইতিবৃত্ত আনা হয়েছে, তাতে কী সুন্দরভাবে শব্দের পারস্পরিক যোগসূত্রতা স্থাপিত হয়েছে এবং সেই ভাষ্যের মধ্যে রয়েছে কী অপূর্ব প্রাঞ্জলতা। এতে তথ্যপ্রমাণের যে প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে, তা অবশ্যই একজন চিন্তাশীল ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তির জন্য শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ। এ ধরনের এজাজের ব্যাপারে জানার স্পৃহা কেবল আরবদের ভাষারীতি এবং তাদের ভাষাতত্ত্বের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যেই জাগা স্বাভাবিক। আর তা বোধগম্য হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, তাদেরই মতো আরবী ভাষায় বিচক্ষণ হতে হবে। অবশ্য অনারবদের মধ্যে যাঁরা আরবী ভাষায় বিজ্ঞ ও পারদর্শী, তাঁরা এই বিষয়টির উপর গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও আরবদের সাধারণ লোক, যারা মূর্খ, সে দেশের সাধারণ নারী সমাজ, এমনকি গোলামদের মধ্যে এ ভাষার ব্যাপারে যে বিশেষ অনুরাগ অনুভূতি পরিদৃষ্ট হয়, তা কিন্তু অনারব পণ্ডিত ও বুযুর্গানে মিল্লাতগণের মধ্যে পাওয়া যায় না।

কোরআন মজীদ মোজেজ হওয়ার অন্যান্য দিক হচ্ছে বিস্ময়কর নযম, সূক্ষ্ম পদ্ধতি ও ধরন যা পরস্পর বিচ্ছিন্নতার পরিপন্থী। এ বিশেষত্বটি অনারবদের ভাষায় নেই। আরবী ভাষার গদ্য, পদ্য, ভাষণ, গীতিকাব্য, ছন্দ, ছড়া ইত্যাদির রীতিগুলো সবই তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক রীতির অন্তর্ভূত। উপরোক্ত বিষয়াদির পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন মজীদের একটি অতিরিক্ত বিশেষ গুণ রয়েছে, যা আরবদের ভাষা থেকেও স্বতন্ত্র। আরবদের ভাষার সঙ্গে কোরআন মজীদ সংমিশ্রিত নয় এবং তার সদৃশও নয়, যদিও কোরআনের শব্দ এবং অক্ষর তাদের ভাষারই স্বশ্রেণীভুক্ত, যা তারা আপন গদ্য ও পদ্যে ব্যবহার করে থাকে। এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে তাদের পণ্ডিত সমাজ বিস্মিত এবং তাদের ভাষ্যকার ও ভাষা অলংকারবিদরা বিস্ময়ে অবনত। তারা বহু চেষ্টা করেছে তাদের নিজেদের কালামে এ ধরনের সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালার

কালামে যে অকাট্য দলীল ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার মোকাবেলা করার মতো তাদের কোনো শক্তিই নেই।

ওলীদ ইবনে মুগীরা রসুলেপাক স. থেকে কোরআন মজীদ শুনে বিগলিত হয়ে গেলো এবং তাকে এ কোরআনের সত্যতাকে স্বীকার করতেই হলো। আবু জাহেল এসে তাকে নরম গরম, অনেক কিছু বুঝাতে চেষ্টা করলো। তারপরও সে কোরআনের সত্যতাকে অস্বীকার করতে পারলো না। কুরাইশ বংশের সকল হতভাগ্যদের অবস্থা এরূপই ছিলো। তারা আরবী ভাষার বালাগাত ও ফাসাহাতের কায়দা কানুনে যথেষ্ট পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও কোরআন মজীদের বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপন পদ্ধতি দেখে হয়রান হয়ে এর সত্যতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তারপরও কিছুসংখ্যক অহংকারী ও নির্বোধ মোকাবেলা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলো। কিন্তু তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছে। যেমন ইয়াহইয়া ইবনে পারায়ী নিঃসন্দেহে সেই সময়ের একজন তুলনাবিহীন বালাগাত ও ফাসাহাতবিদ ছিলো। সে ভাবলো, সূরা এখলাসের অনুরূপ কোনো বাক্য প্রস্তুত করবে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পারলো না। অবশেষে ভীত হয়ে একাজ থেকে তওবা করলো। এই লোকটি তার সময়ে বিভিন্ন ছন্দ ও কাব্য রচনা করেছিলো এবং কোরআনের সুরা সমূহের শ্রেণীগত নামকরণ করেছিলো মুফাস্‌সাল। একদিন সে শিশুদের এক বিদ্যাপীঠের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলো। শুনতে পেলো বিদ্যালয়ের বাচ্চারা এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করছে 'ক্বীলা ইয়াআরদুব লায়ী মা আকা' তেলাওয়াত শুনে সে আর এগুলো না। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরে এসে তার লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলো নষ্ট করে ফেললো এবং বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এই কালামের মোকাবেলা কেউ করতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম নয়।

কোরআনুল করীম মোজেজ হওয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে গায়বী সংবাদ প্রদান করা। কোরআন মজীদ এমন বিষয়ের সংবাদ জগৎবাসীকে প্রদান করেছে, যা তখনও ঘটেনি। পরবর্তীতে ঘটেছে। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার এরশাদ– '(হে রসুল!) আপনি মসজিদে হারামে ইনশাআল্লাহ্‌ অবশ্যই নিরাপদ অবস্থায় প্রবেশ করবেন।' হক তায়ালা আরও এরশাদ করেছেন– 'আর তারা তাদের বিজয়ের পরে অচিরেই পরাভূত হবে।' আরও এরশাদ করেছেন– 'তথাকথিত সমস্ত দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য।' আরও এরশাদ রয়েছে– 'তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার এবং সৎকর্মশীল, আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' আরও এরশাদ করেছেন– 'আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং বিজয় যখন আসবে–' আরও ঘোষণা করেছেন– 'নিশ্চয়ই আমি কোরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমি এর হেফাযত করবো'। দেখা গেছে, অসংখ্য দুশমন, অতিরঞ্জিতকারী এবং বাতিলপন্থীরা একত্রিত হয়ে নানা রকম উপায় অবলম্বন

করেছে, ষড়যন্ত্র করেছে, শক্তি খাটিয়ে চেষ্টা করেছে কোরআনের নূরকে নিভিয়ে দিতে। কিন্তু পারেনি। কোরআন মজীদের একটি শব্দেও বিকৃতি আনতে সক্ষম হয়নি। একটি অক্ষর সম্পর্কেও মুসলমানদের অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক করতে পারেনি। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন– 'অতি তাড়াতাড়ি এই বিরুদ্ধবাদীরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।' আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ করেছেন– 'তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।' বলেছেন– 'এরা আর কোনোদিন যুদ্ধের অভিলাষী হবে না।' আরও এরশাদ করেছেন– 'তোমরা (কাফেরেরা) কক্ষণো কোরআনের সুরার মতো কিছু প্রস্তুত করতে পারবে না।'

এরকম আরও বহু আয়াতে কোরআনী এবং হাদীছ রয়েছে।

কোরআন মজীদ মোজেজ হওয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে, এই কোরআন অতীতের অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছে। সে সম্পর্কে কিছু কিছু লোক যৎসামান্য জ্ঞান রাখলেও অনেকেই এ ব্যাপারে কিছুই জানতো না। যেমন আসহাবে কাহাফের ঘটনা, হজরত মুসা আ. ও খিযির আ. এর ঘটনা, যুলকারনাইনের ঘটনা, হজরত ইউসুফ আ. এবং তাঁর ভ্রাতৃবর্গের ইতিবৃত্ত, হজরত লুকমান আ. এবং তাঁর পুত্রের কাহিনী এবং বহু আম্বিয়া কেরাম ও তাঁদের উম্মতগণের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলী। তাছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতগণের শরীয়ত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এসমস্ত ব্যাপারে যৎসামান্য জ্ঞানলাভকারীরা কোরআন মজীদে উপস্থাপিত কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। তারা ভালোভাবেই জানতো যে, রসুলেপাক স. একজন উম্মী (আক্ষরিক জ্ঞানবিমুক্ত) নবী। তিনি লেখাপড়া করেননি। কোনো বিদ্যালয়ে যাননি। এ জাতীয় মজলিশের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতাও ছিলো না। তিনি তাদের সামনে সারা জীবনই অক্ষরের অমুখাপেক্ষী রয়েছেন। অন্য কোনো দেশেও যাননি। অথচ তিনি তওরাত, ইঞ্জীল, ইব্রাহীম আ. ও মুসা আ. এর সহীফাসমূহের ঘটনাবলী বলে যাচ্ছেন অবলীলায়। কোরআনে অলৌকিকত্বের বর্ণিত দিকগুলো খুবই স্পষ্ট। এর মধ্যে আচ্ছন্নতা, সন্দেহ কিংবা মতানৈক্যের অবকাশ নেই। এছাড়া, অন্যান্য দিকগুলো হচ্ছে কোরআনের সিফাত বা বৈশিষ্ট্য। ওই সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কোরআন মজীদ শ্রবণকালে শ্রবণকারী এবং তার পাঠক উভয়েই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থা কেবল মুমিনের জন্যই হয়, তা নয়। বরং কাফের ও মিথ্যাচারীদের মধ্যেও এজাতীয় ভীতির সঞ্চার হয়ে থাকে। আল্লাহ্র কালামের পরাক্রমশীলতা এবং জালালিয়াতের হাল তাদের উপরও প্রবল হয়ে যায়। মুমিন ও কাফেরদের মধ্যে এই ভীতিপ্রদ অবস্থার পার্থক্য এই যে, কাফেরদের জন্য এ কালাম শ্রবণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তখন কোরআন থেকে দূরে থাকাই তাদের জন্য হয় স্বস্তিজনক। কোরআনের

আবৃত্তি শ্রবণ তারা সহ্যই করতে পারে না। অপরপক্ষে মুমিনদের অন্তরে ভীতিপ্রদ হাল পয়দা হলেও কোরআনের প্রতি তাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা বেড়ে যায়। মুমিনদের অন্তর্জগতে তখন প্রবাহিত হতে থাকে প্রশান্তি এবং প্রশস্ততা। তাদের এই আকৃষ্টতা মহব্বত ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন, 'কোরআনের তেলাওয়াত শুনে ওই সকল লোকের শরীরের পশম খাড়া হয়ে যায়, যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে।' আল্লাহ্তায়ালা আরও বলেছেন, 'অতঃপর তাদের দেহ এবং অন্তর আল্লাহ্তায়ালার জিকিরের দিকে বিনম্র হয়ে যায়।' আরও বলেছেন, 'এই কোরআনকে আমি যদি পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তোমরা অবশ্যই দেখতে যে, পাহাড় আল্লাহ্তায়ালার ভয়ে কম্পমান।' এই আয়াতগুলো একথাই প্রমাণ করে যে, কোরআনে করীমের মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব অতি মহান। কোরআনের শ্রবণকারী জ্ঞান ও চেতনার অধিকারী হোক বা না হোক, এর অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝুক বা নাই বুঝুক, শ্রবণকারীর মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হবেই। এ কথাটির যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় মহিলা এবং অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে। কোরআন শ্রবণ করা মাত্রই তাদের উপরে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন তারা অভিভূত হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, কোরআন আল্লাহ্র কালাম। এটি অন্য কারও কালাম বা ভাষার মতো নয়।

জনৈক খৃষ্টানের একটি ঘটনা আছে। খৃষ্টান লোকটি একদিন কোনো এক কোরআন পাঠকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলো। কোরআনের আওয়াজ তার কানে আসা মাত্রই সে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কাঁদছো কেনো? তুমি তো এর অর্থ বুঝ না। লোকটি বললো, আমি এর মাধুর্য ও বাচনভঙ্গিতে অভিভূত হয়ে কাঁদছি। এই কালাম শুনে প্রাণের আস্বাদ ও আনন্দ জেগেছে। আমার কাঁদবার কারণ এটাই।

কোরআনে করীম শ্রবণের ভয়ভীতি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এক সম্প্রদায়ের উপর কাজ করেছিলো। যে কারণে বিনা দ্বিধা ও কালক্ষেপণে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। এ প্রসঙ্গে হজরত জুবায়ের ইবনে মুতইম রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেন, একবার আমি মাগরিবের জামাতে নবী করীম স. কে সুরা তুর পাঠ করতে শুনেছি। রসুলেপাক স. যখন 'আমখলিকু মিন গইরি শাইয়্যিন আমহুমুল খলিকুন' থেকে 'আমহুমুল মুসাইতিরুন' পর্যন্ত পাঠ করলেন তখন আমার প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এরকম প্রতিক্রিয়া আমার মধ্যেই সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছিলো। উতবা ইবনে রবিয়া নবী করীম স. থেকে সুরা হামিম আস্সেজদার তেলাওয়াত শুনে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলো। সে নিজ গোত্রের কাছে বলেছিলো, আমি মোহাম্মদের কাছ থেকে এমন এক কালাম শুনে এসেছি, যা আগে শুনিনি। তার বর্ণনা করার শক্তি আমার নেই। তারপরও সে কুফুরীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত রয়ে গিয়েছিলো। বরং তার অস্বীকৃতি ও বিরোধিতা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিলো।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমান আল্লাহ্তায়ালার দেয়া বিশেষ দান। জ্ঞান ও বিদ্যা এখানে কার্যকর হয় না। যে কারণে তারা নবী করীম স. কে আপন সন্তানের চেয়ে বেশী জেনেও তাঁর উপর ইমান আনতে ব্যর্থ হয়েছে। এজাজে কোরআনের আরেকটি দিক হচ্ছে, এর পাঠক কখনোই একঘেয়েমির সন্ধান পায় না এবং শ্রবণকারী শুনতেও অপছন্দ করে না। বরং এর তেলাওয়াতে মাধুর্য, আনন্দ, মহব্বত, সজীবতা এবং স্বাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। নির্জনে তেলাওয়াতের আস্বাদ বেশী অনুভূত হয়। এ অবস্থা সবসময়ই বিদ্যমান। কিন্তু অন্য কালাম এর বিপরীত। যতোই কাব্যসুষমামণ্ডিত এবং সুন্দর হোক না কেনো, বারংবার পাঠে তা স্বাদহীন হতে বাধ্য। এই ব্যাপারটি অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়গুলো অবশ্য ইমান ও মহব্বতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু কাফের, মুনাফেক ও দুশমনদের বেলায় আল্লাহ্তায়ালার চূড়ান্ত ঘোষণা— 'এদের বেলায় ক্ষতি ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি পায় না।'

কোরআন মজীদ মোজেজ হওয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে, এই কোরআনে ওই সমস্ত এলেম ও মারেফত সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যার ব্যবহার আরবদেশে ছিলো না। তাছাড়া নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বেও ওই সমস্ত এলেম ও মারেফত সম্পর্কে রসুলেপাক স. এর জানা ছিলো না। অতীতের উম্মতগণের আলেম সমাজের মধ্য থেকে কেউই এ ব্যাপারে কিছু রচনা করে যাননি। তাদের কোনো কিতাবে এ জাতীয় এলেম ও মারেফতের উল্লেখ নেই। আল্লাহ্তায়ালা কোরআন মজীদে শরীয়তের এলেম, আদব, শিষ্টাচার, সুন্দর চরিত্র ও স্বভাব, উপদেশ ও প্রজ্ঞাবাণী পূর্ববর্তী উম্মত ও নবীগণের জীবনী, আখেরাত সম্পর্কে সংবাদ প্রদান— ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। এগুলো আল্লাহ্তায়ালার এককত্বের এবং গুণাবলীর প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ দলীল, বিশ্বাসগত প্রমাণ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন। ঘোষণা করা হয়েছে, 'আমি কোরআন মজীদে কোনো বিষয়ের আলোচনা বাকি রাখিনি।' আল্লাহ্তায়ালা আরও বলেছেন 'আমি আপনার উপর সর্ববিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কোরআন নাযিল করেছি।' আরও এরশাদ করেছেন, 'আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সকল উদাহরণ দিয়েছি।' আরও ঘোষণা করেছেন, 'এই কোরআন মজীদ বনী ইসরাইলদের ওই বিষয়াবলীর বর্ণনা প্রদান করে, যেগুলোর ব্যাপারে তাদের অধিকাংশ লোক মতানৈক্য করে থাকে।' আল্লাহ্তায়ালা আরও বলেন 'এই কোরআন মানুষের জন্য বয়ান ও হেদায়েত।'

সবচেয়ে আশ্চর্য এবং সূক্ষ্ম বিষয় এই যে, এই কোরআনে প্রমাণ এবং প্রমাণিত বিষয় উভয়টিকে একত্রিত করা হয়েছে। আর এজন্য কোরআন মজীদের ও তার বালাগাতগত সৌন্দর্য দলীল প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। আবার তার মধ্যে আদেশ নিষেধ, ভয়ভীতি প্রদর্শন, প্রতিশ্রুতি প্রদান ইত্যাদি বিষয়েও

আলোকপাত করা হয়েছে। কোরআনের কোনো একখানা আয়াত নিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি গবেষণা করলে তার প্রকৃষ্ট দলীল লাভ করতে সক্ষম হয়। তার সাথে সাথে উক্ত কালামের বিধান সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হয়। কোরআন মজীদের মোজেজ হওয়ার আরেকটি অন্যতম দিক হচ্ছে, এর বাণীসমূহ নযম বা পদ্যের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে, গদ্যের ধারায় নয়। কেনোনা পদ্যের মধ্যে চিত্তাকর্ষণ ক্ষমতা বেশী, এটা মানুষের জন্য সহজসাধ্য, শ্রবণশক্তিকে সজাগকারী এবং অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়ক। কোরআন মজীদ মোজেজ হওয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে শিক্ষার্থী এবং হাফেজগণের জন্য কোরআন শিক্ষা অত্যন্ত সহজসাধ্য। আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা করেছেন, 'আমি স্মৃতিবদ্ধ করার জন্য কোরআনাকে সহজ বানিয়ে দিয়েছি।' অতীতের উম্মতগণ তাদের আসমানী কিতাব মুখস্থ রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। ঘটনাক্রমে দু' একজন পারলেও অধিক সংখ্যক লোকের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি, যদিও তারা সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করেছিলেন। কিন্তু কোরআন মজীদ শিশু ও আলেমদের জন্য সহজ। তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোরআন আয়ত্ত করতে পারে। কোরআন মজীদের এজাজের আরেকটি দিক এই যে, এর জুয বা পারার মধ্যে পারস্পরিক মিল রয়েছে। বিভিন্ন প্রকারে আলোচ্য বিষয়গুলো পারস্পরিক সামঞ্জস্যের সাথে গ্রথিত হয়েছে। অত্যন্ত নিপুণতা ও সৌন্দর্যের মাধ্যমে এক ঘটনা থেকে অন্য ঘটনার দিকে আলোচনা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এক বাক্য থেকে অপর বাক্যের দিকেও এভাবেই বক্তব্য প্রবাহিত হয়েছে। সুরায় অনুচ্ছেদবিন্যাস না করে, প্রসঙ্গের নামকরণ না দিয়ে আদেশ, নিষেধ, বিজ্ঞপ্তি, প্রতিশ্রুতি, সতর্ক সংকেত, নবুওয়াত সাব্যস্তকরণ, তওহীদের বর্ণনা, অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি– যাবতীয় বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ফাসাহাত ও বালাগাত বিষয়ে কোনো সুদক্ষ পণ্ডিত এ যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনা একত্র করতে গেলে দেখবে ফাসাহাত ও বালাগাতের দুর্বলতা চলে এসেছে এবং প্রাঞ্জলতা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। বাক্যের মধ্যে শব্দের ধারাবাহিকতা লোপ পাচ্ছে এবং ভাষ্যের মধ্যে দোদুল্যমানতার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু কোরআন মজীদ? যতোই প্রসঙ্গ বৃদ্ধি পাচ্ছে, বর্ণনা দীর্ঘ হচ্ছে, ততই তার মধ্যে বর্ণিত গুণাবলী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোরআন মজীদের এজাজের আরেকটি দিক হচ্ছে, এর আয়াতসমূহ চিরস্থায়ী। আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার ঘোষণা, 'আমিই কোরআন নাযিল করেছি, আর আমিই এর হেফাজতকারী।' অন্যান্য আসমানী কিতাবের হেফাজতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো আহবার ও রোহবানগণের উপর। কিন্তু তারা হেফাজত করেনি। বরং তাকে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করেছে। কিন্তু ওরকম অপকর্ম কোরআন মজীদের কাছে আসতেই পারে না। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন,

‘কোরআন মজীদের কাছে বাতিল আসতে পারবে না। সামনে থেকেও নয় পিছন থেকেও নয়।’ আম্বিয়া কেরামের মোজেজাসমূহ তাঁদের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোরআনে করীম রসুলেপাক স. এর এমন এক মোজেজা, যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য এবং চিরপ্রোজ্জ্বল। প্রত্যেক যুগেই ভাষাবিদ, বালাগাতের পণ্ডিত, তেজোদীপ্ত বক্তা, সীমা লংঘনকারী এবং ধর্মের শত্রু বিদ্যমান ছিলো। এখনও রয়েছে। কিন্তু কই? কোরআনে করীমের মোকাবেলা তো কেউ করতে পারলো না? এ মহিমান্বিত কোরআনকে খণ্ডন করার মতো কোনো রচনাও কেউ উপস্থাপন করতে পারলো না। কেউ কোনো ত্রুটিও নিরূপণ করতে পারলো না। বরং যারা এ ধরনের ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবশেষে ময়দান ছেড়ে দিয়েছে। কাযী আয়ায র. বলেছেন, এজাজে কোরআন সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বহুবিধ দৃষ্টিকোণ উল্লেখ করেছেন। অবশ্য অধিকাংশই বালাগত ও ফাসাহাত সম্পর্কিত।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ

ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে, সাইয়্যেদুল মুরসালীন স. এর সর্ববৃহৎ মোজেজা হচ্ছে কোরআন মজীদ। তাছাড়া চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা, পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করা, খাদ্যবস্তুকে বাড়িয়ে দেয়া, পাথর ইত্যাদি জড় পদার্থ দ্বারা কথা বলানো– এগুলোও নবী করীম স. এর বড় বড় মোজেজার অন্তর্ভূত। এগুলোর মধ্যে কোনো কোনো মোজেজা আহাদ, কোনোটি মশহুর, আবার কোনোটি মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু মোজেজার বর্ণনা খবরে ওয়াহেদের (একক বর্ণনার) ভিত্তিতে পাওয়া গেলেও বর্ণনায় বিভিন্ন ধারা এবং সনদের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোও বহুবর্ণিত হাদীছের (মুতাওয়াতির) মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু কিছু মোজেজা তো তাঁর নবুওয়াতের প্রচারের পূর্বেই সংঘটিত হয়েছে। সেগুলোকে এরহাসাত বলা হয়। ‘এরহাস’ এর অর্থ কোনোকিছুর ভিত্তি স্থাপন করা। ওই সকল মোজেজা তাঁর নবুওয়াতের ভিত্তি স্থাপন করেছিলো। আবার কিছু কিছু মোজেজা রসুলেপাক স. এর নবুওয়াত প্রকাশের প্রাক্কালে ঘটেছিলো। নবী করীম স. এর মোজেজার আরেকটি প্রকারও রয়েছে, যা তাঁর ওফাতের পর আওলিয়া কেরামের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এগুলোকে কারামত বলা হয়। আওলিয়া কেরামের কারামতসমূহ রসুলেপাক স. এরই মোজেজার অন্তর্ভূত। এগুলো তাঁর নবুওয়াতের বিশুদ্ধতা এবং রেসালতের সত্যতার প্রমাণ।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মোজেজাটি একটি মহান মোজেজা। এটি অন্যান্য মোজেজা থেকে উন্নততর। কেনোনা এর মাধ্যমে ঊর্ধ্বজগতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হয়েছিলো, যা অন্য কোনো নবী কর্তৃক সংঘটিত হয়নি। এই মোজেজার বর্ণনা

কোরআন করীমেও রয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ ফরমান, ‘কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।’ এই আয়াতে করীমা নবী করীম স. এর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করছে। মুফাসসেরীনে কেরাম এরকমই তাফসীর করেছেন। অবশ্য কোনো কোনো তাফসীরকার এই আয়াত দ্বারা কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এবং সেদিন চন্দ্র টুকরা টুকরা হয়ে যাবে এরকম মত গ্রহণ করেছেন। তাদের উক্ত মতামত আল্লাহ্তায়ালার এই আয়াত দ্বারাই খণ্ডিত হয়ে যায় ‘কাফেরেরা যখন কোনো নিদর্শন দেখে তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা পুরাতন যাদু।’ কাফেরেরা তো কিয়ামতের দিন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়াকে পুরাতন যাদু বলে মনে করবে না।

হজরত ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এর জামানায় চন্দ্র দু’টুকরা হয়ে এক টুকরা পাহাড়ের উপর ছিলো আর এক টুকরা পাহাড়ের নীচে চলে গিয়েছিলো। এই বর্ণনাটি সাহাবা কেরামের এক বড় জামাত উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেন, কুরাইশ বংশের কাফেরেরা নবী করীম স. এর নিকট মোজেজার দাবি করলো এবং বললো, আপনি সত্য নবী হয়ে থাকলে চাঁদকে দু’টুকরা করে দেখিয়ে দিন। রসুলেপাক স. চাঁদের দিকে হাত দ্বারা ইশারা করলেন। চাঁদ দু’টুকরা হয়ে গেলো। লোকেরা হেরা পর্বতকে চাঁদের দু’টুকরার মধ্যখানে দেখতে পেলো। এরপর রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা সাক্ষ্য দাও। কাফেরেরা বললো, নিশ্চয়ই ইবনে আবী কাবশা তোমাদের উপর যাদু করেছে। তাদের ভিতর থেকে একজন বললো, তিনি যদি যাদু করে থাকেন, তাহলে তোমাদেরকে করেছেন। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর উপর তো তিনি যাদু করতে পারেন না। ময়দান থেকে মুসাফিরেরা যখন বাড়ি ফিরলো, তখন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনা বর্ণনা করলো। আবু জাহেল একথা শুনে বলল, আরে এটাতো সেই পুরনো যাদুই।

হাদীছ শাস্ত্রের একজন বড় আলেম ছিলেন ইবনে আবদুল বার। তিনি বলেন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার হাদীছ সাহাবা কেরামের একটি বিরাট জামাত বর্ণনা করেছেন। তাবেয়ীনের অনেক লোক তা প্রচার করেছেন। এভাবে বর্ণনাকারীদের এক বিশাল সংখ্যা আমাদের যুগ পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর কোরআন করীমও তার পক্ষে। তাছাড়া মুতাকাদ্দেমীন ও মুতাআখখেরীনের অনেকে হাদীছ গ্রন্থে বর্ণনার বিভিন্ন ধারা এবং বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে উক্ত মোজেজার কথা উল্লেখ করেছেন। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায় উদ্ধৃত হয়েছে, মুখতাসার ইবনে হাজেরের শরাহতে আল্লামা ইবনে সুবকী র. বলেছেন, আমার মতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বর্ণনাটি ব্যাপক বর্ণিত। কোরআন মজীদে এর সাক্ষ্য বিদ্যমান।

সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বহু সহীহ্ সনদে উক্ত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। কাজেই বিষয়টি বহুল প্রচারিত বলে বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য কিছু কিছু বেদাতী লোক উক্ত মোজেজাকে অস্বীকার করেছে। তাদের মতটি ওই বিরুদ্ধবাদীদের মতের অনুরূপ, যারা বলে, ঊর্ধ্বাকাশ বিদীর্ণ হওয়া এবং জোড়া লাগা সম্ভব নয়। মিল্লাতে ইসলামীর অনুগত আলেমগণের অভিমত হচ্ছে, উক্ত কাজে জ্ঞানগত অসম্ভাব্যতা নেই। কেনোনা চন্দ্র সূর্য আল্লাহ্তায়ালাই সৃষ্টি। তিনি সেখানে যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। যেমন কিয়ামতের বর্ণনায় বলা হয়েছে। বিপথগামীরা বলে থাকে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার হাদীছ বহু বর্ণিত হলে পৃথিবীর সকলেই জানতে পারতো। শুধু মক্কাবাসীদের জন্য এটা বিশিষ্ট থাকতো না। কেনোনা ব্যাপারটা দর্শন ও অনুভূতির অন্তর্গত। আর দৃষ্টি ও অনুভূতিতে আশ্চর্যজনক এই ব্যাপারটি সহজেই সকলকে প্রভাবিত করতে পারতো। ইতিহাসের পাতায় এর উল্লেখ থাকতো। অথচ ঘটনাটি ইতিহাসে নেই। তারকাবিদ্যার পুস্তকেও নেই।

উলামা কেরাম তাদের সন্দেহের জওয়াব দিয়েছেন এভাবে, রসুল করীম স. এর কাছে মোজেজার দাবি করেছিলো একটি কাওমের বিশেষ কতিপয় ব্যক্তি। কাজেই সারা পৃথিবীর মানুষকে দেখানো উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ ঘটনাটি ঘটেছিলো রাতে, যেসময় মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। কিছু লোক জেগে থাকলেও ঘরের মধ্যে থাকে। মরুভূমিতে রাতে জেগে থাকার ঘটনা স্বাভাবিক নয়। আর ব্যাপারটি ছিলো এক মুহূর্তের। এমন নয় যে, চন্দ্রটি সারা রাত দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় ছিলো। অথবা এমনও হতে পারে, তখন তাদের দৃষ্টিপথে কোনো না কোনো অন্তরায় ছিলো, যেমন পাহাড় পর্বত বা আকাশের মেঘমালা। অথবা মানুষ সে সময় আনন্দ উল্লাস কিস্সা কাহিনীতে নিমজ্জিত ছিলো। তাই সেদিকে কারো খেয়ালই পড়েনি।

এটাও স্বাভাবিকতা থেকে বহুদূরে যে, মানুষ চাঁদের দিকে সারাক্ষণ চোখ মেলে বসে থাকবে। হাঁ, এরূপ অবস্থা তখনই কল্পনা করা যেতে পারে যে, মানুষের মধ্যে পূর্ব থেকেই এরকম চাঁদের দিকে অবিরত তাকিয়ে থাকার প্রবণতা ছিলো এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় ঘোষণা দিয়ে সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এরকম করা হলে সকলের পক্ষেই হয়তো দেখা সম্ভব হতো। আবার এমনও হতে পারে, চন্দ্র সে রাত্রিতে এমন অবস্থানে ছিলো যেখান থেকে কোনো প্রান্তে চাঁদ দেখা গিয়েছিলো, আবার কোনো প্রান্তে দেখা যায়নি।

যেমন এক কাওমের কাছে চাঁদ প্রকাশমান, কিন্তু অপর কাওমের চোখে তা লুপ্ত থাকে। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় তো এরকমই হয়ে থাকে। কোনো দেশ থেকে পূর্ণগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয়, কোনো দেশে আংশিক হয়, কোনো দেশে আবার দেখাই যায় না। গ্রহবিদ্যার পণ্ডিতেরা হিসাব করে শুধু গ্রহণ সম্বন্ধে বলতে পারে।

চোখে দেখতে পায় না। হকপন্থীদের নিকট দেখতে পাওয়া না পাওয়া আল্লাহ্তায়ালার কুদরতের অধীন ব্যাপার। আল্লাহ্তায়ালা যাকে ইচ্ছা দেখান। যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন। এ মোজেজা তাদেরকেই দেখানো উদ্দেশ্য ছিলো, যারা চ্যালেঞ্জ করেছিলো। তারা রসুলেপাক স. এর কাছে নবুওয়াতের আলামত দেখতে চেয়েছিলো। তারা তা দেখেছে। এখানে অন্যের দেখাটা সম্ভাব্য। আবশ্যিক নয়।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায় এসেছে, কতিপয় কাহিনীকার এরকম বলে থাকেন, ওইসময় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে রসুলেপাক স. এর জামা মোবারকের ভিতর দিয়ে ঢুকে আস্তিন দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো। এ জাতীয় কথার কোনো ভিত্তি নেই। শায়েখ বদরুদ্দীন যারকাশী র. শায়েখ এমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর র. থেকে এরকম উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সূর্যকে ফিরিয়ে আনা

সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর সে সূর্যকে পুনরায় আকাশে ফিরিয়ে আনাও রসুলেপাক স. এর অন্যতম মোজেজা। হজরত আসমা বিনতি ওমায়স রা. থেকে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম স. হজরত আলী কাররমাল্লাহু ওয়াজহাহুর উরুর উপর মাথা রেখে আরাম করছিলেন। তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিলো। হজরত আলী তখনও আসরের নামাজ আদায় করেননি। তিনি নবী করীম স. এর পবিত্র মস্তক সরিয়ে দিয়ে নামাজ আদায় করতে গেলেন না। সূর্য অস্ত গেলো। রসুলেপাক স. হজরত আলী রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, আলী! আসরের নামাজ পড়েছো? তিনি বললেন, না। রসুলেপাক স. মুনাজাত করলেন, হে আল্লাহ্! তোমার আলী, তোমার এবং তোমার রসুলের আনুগত্যে ছিলো। তুমি সূর্যকে পুনরায় উদিত করে দাও। মুনাজাতের সাথে সাথে সূর্য আকাশে উদিত হলো। হজরত আসমা রা. বলেন, আমি সূর্যকে ডুবে যেতে দেখেছি। তারপর আবার সে সূর্যকে আকাশে উঠতেও দেখেছি। সূর্যের রশ্মি তখন পাহাড়ের চূড়া এবং যমীনে পতিত হয়েছিলো। খয়বর যুদ্ধের বর্ণনায় এই হাদীছের পরিপূর্ণ আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

পবিত্র আঙুল থেকে পানির ঝর্ণা

নবী করীম স. এর পবিত্র আঙুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া তাঁর মশহুর মোজেজাগুলোর মধ্যে অন্যতম মোজেজা, যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বহু লোকের সামনে সংঘটিত হয়েছিলো। এই ঘটনার বর্ণনা এতো বেশী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, একে অকাট্য বলে মানতেই হয়। হাতের আঙুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়ার মোজেজা অন্য কোনো নবীর মাধ্যমে হয়েছে বলে শোনা যায় না।

হজরত মুসা আ. হাতের লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করার কারণে পাথর ফেটে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছিলো। কিন্তু আঙুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া, পাথর থেকে পানি প্রবাহিত হওয়ার চেয়ে অধিকতর পরিপূর্ণ ও বিস্ময়কর। কেনোনা পাথর থেকে পানি বের হওয়া কিছুটা স্বাভাবিকতার অন্তর্ভূত। কিন্তু গোশত এবং হাড় থেকে পানি প্রবাহিত হওয়ার ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়। নিঃসন্দেহে উপরোক্ত হাদীছ সাহাবা কেরামের বড় বড় জামাত বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে হজরত আনাস রা., হজরত জাবের রা. এবং হজরত ইবনে মসউদ রা. এর বর্ণনাও রয়েছে।

হজরত আনাস রা. এর হাদীছ বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বর্ণনা করেন, আমি একদা নবী করীম স. কে দেখলাম। তখন ছিলো আসরের ওয়াক্ত। লোকেরা চতুর্দিকে পানির সন্ধান করছিলো। কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া যাচ্ছিলো না। রসুলেপাক স. এর জন্য একটি পাত্রে করে কিছু পানি আনা হলো। তিনি তাঁর পবিত্র হাত পানির পাত্রের ভিতর রাখলেন এবং মানুষকে হুকুম করলেন, পাত্র থেকে অজু করো। আমি লক্ষ্য করলাম, রসুলেপাক স. এর অঙ্গুলির মাঝখান থেকে ফোয়ারার মতো পানি ঝরছে।

এক বর্ণনায় আছে, আঙুল এবং তার জোড়া থেকে পানি প্রবাহিত হয়েছিলো। সমস্ত মানুষই ওই পানিতে অজু সমাধা করেছিলো। হজরত আনাস রা. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা তিনশ'। ইবনে শাহীনের হাদীছে হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা তবুকের যুদ্ধে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ছিলাম। মুসলমানগণ নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা এবং আমাদের উটেরা সকলেই তৃষ্ণার্ত। রসুলেপাক স. বললেন, অল্প কিছু পানি নিয়ে এসো। তাঁরা বিভিন্ন মশক থেকে নিংড়িয়ে কয়েক অঞ্জলি পানি একত্রিত করে রসুলেপাক স. এর নিকটে আনলেন। তিনি বললেন, পানি বরতনে ঢেলে দাও। এরপর তিনি তাঁর পবিত্র হাত পানিতে চুবিয়ে দিলেন। হজরত আনাস রা. বলেন, আমি দেখতে পেলাম, রসুলেপাক স. এর আঙুল থেকে পানি ছিটকে পড়ছে। আমরা আমাদের উট ও অন্যান্য পশুকে সেই পানি পান করালাম। আর অবশিষ্ট পানি নিজেদের মশকের মধ্যে ভরে নিলাম।

বায়হাকী হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. কূপের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে এক ব্যক্তি তার ঘর থেকে একটি ছোট্ট পেয়ালা নিয়ে এলো। রসুলেপাক স. উক্ত পেয়ালায় হাত রাখলেন। পেয়ালার মধ্যে হাত ঢুকছিলো না। পাত্রটি ছিলো ছোট। মাত্র চারখানা আঙুল পেয়ালার মধ্যে গেলো। কনিষ্ঠাঙ্গুলি রয়ে গেলো বাইরে। দেখা গেলো, আঙুল থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হজরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, হুদাইবিয়ার দিন আমরা সকলেই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম। রসুলেপাক স. এর সামনে

একটি মশক। মশকের পানি দিয়ে তিনি অজু করছিলেন। সাহাবা কেরাম রসুল স. এর চারিদিকে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি স. বললেন, ব্যাপার কী? তোমরা এভাবে দাঁড়িয়েছো কেনো?

সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাদের কাছে অজু করা বা পান করার মতো পানি নেই।

রসুলেপাক স. একথা শুনে তাঁর হাত মোবারক মশকের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ণার মতো পানি বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। আমরা পান করলাম। অজুও করলাম। হজরত জাবের রা. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনারা কতোজন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা একলাখ হলেও আমাদের জন্য সেই পানি যথেষ্ট হতো। তবে আমাদের লোকসংখ্যা ছিলো দেড় হাজার।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমরা বওয়াতের যুদ্ধে ছিলাম। তখন আমাদের মশকে ছিলো সামান্য কয়েক ফোঁটা পানি। সেটুকু নিংড়িয়ে একটি পেয়ালার মধ্যে জমা করা হলো। রসুল স. তাঁর আঙুলসমূহ পেয়ালায় রেখে দিলেন। দেখা গেলো, আঙুলের মাঝখান দিয়ে পানি উছলে বেরিয়ে আসছে। অতঃপর রসুল স. লোকদেরকে পানি পান করতে বললেন। সকলেই খুব তৃপ্তির সাথে পানি পান করলো। শেষে যখন রসুল স. তাঁর হাত মোবারক পেয়ালা থেকে বের করলেন, দেখা গেলো, পেয়ালাটি তখনো পানিতে ভরপুর। এই হাদীছখানা ইমাম আহমদ, বায়হাকী এবং ইবনে শাহীন হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমরা একবার নবী করীম স. এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের কাছে পানি ছিলো না। রসুল স. বললেন, কারও কাছ থেকে কিছু পানি নিয়ে এসো। আমরা কিছু পানি নিয়ে রসুলেপাক স. এর কাছে এলাম। পানিটুকু তিনি একটি বরতনে রাখলেন এবং নিজের হস্ত মোবারক সেই পানিতে ডোবালেন। এই হাদীছসমূহ বিভিন্ন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন সবাই। নতুবা প্রতিবাদ হতো, যা ছিলো সাহাবা কেরামের সাধারণ অভ্যাস।

বিধান এই যে, খবরে ওয়াহেদ (একক বর্ণনা) যদি সাহাবা কেরামের জামাতের সামনে বর্ণনা করা হয়, আর তাঁরা চুপ থাকেন, তখন সকলেই উক্ত খবরে ওয়াহেদের বর্ণনাকারী হয়ে যান।

নবী করীম স. এর অঙ্গুলি মোবারক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকেও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হাদীছগুলো শোনার পর একটি প্রশ্নের অবতারণা হয় যে, প্রথমে পেয়ালায় পানি সঞ্চিত করে তারপর সেখানে হাত মোবারক প্রবেশ করানোর মাহাত্ম্য কী? প্রথমেই তো পানি প্রবাহিত করাতে

পারতেন। এই প্রশ্নের জবাবে উলামা কেরাম বলেন, এক্ষেত্রে নবী করীম স. আল্লাহ্তায়ালার দরবারের আদব রক্ষা করেছেন। কেনোনা কেবল আল্লাহ্তায়ালাই অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে কোনোকিছুকে অস্তিত্ববান করেন। এই অলৌকিকত্বে আল্লাহ্তায়ালার সমতুল্য কেউ নয়। রসুলেপাক স. এর হাত ছিলো কয়েকফোঁটা পানিতে সিক্ত। সেই পানিটুকুর স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালা। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টিক্ষমতাই ছিলো রসুলেপাক স. এর অবলম্বন। তার সঙ্গে ছিলো প্রার্থনা, যার বরকতে সংঘটিত হয়েছে মোজেজা।

পানি বৃদ্ধি করে দেয়া

উল্লিখিত মোজেজার ন্যায় অল্প পানিকে বেশী পানিতে রূপান্তরিত করে দেয়ার মতো মোজেজাও নবী করীম স. থেকে প্রকাশ পেয়েছিলো। তাঁর দোয়ার বরকতেই এরকম হয়েছিলো। সহীহ মুসলিম শরীফে তবুকের যুদ্ধের প্রসঙ্গে হজরত মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, তবুক যুদ্ধের সময় রসুলেপাক স. সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা ইনশাআল্লাহ্ সূর্যোদয়ের সময় তবুক ঝর্ণার কাছে পৌঁছে যাবে। আমি সেখানে পৌঁছাবার আগে কেউ যেনো ঝর্ণার পানিতে হাত না লাগায়। হজরত মুআয রা. বলেন, আমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম, দু'জন লোক আমাদের আগেই সেখানে হাজির হয়েছে। ঝর্ণা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছিলো। রসুলেপাক স. লোক দু'টিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি ঝর্ণার পানিতে হাত দিয়েছো? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি তাদেরকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্তায়ালার যা মর্জি তাই হয়। সাহাবীগণ নিজেরা হাত দিয়ে ঝর্ণার মাটি খনন করার চেষ্টা করলেন যাতে পানিগুলো সেখানে যেয়ে জমা হতে পারে। দেখা গেলো, ঝর্ণা থেকে ঘন কুয়াশার মতো কিছু বেরিয়ে আসছে। তারপর রসুলেপাক স. তাঁর মুখমণ্ডল ও হাত মোবারক ধৌত করলেন এবং ধৌত কার্যে ব্যবহৃত পানি পুনরায় ঝর্ণায় ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ণা কুলকুল করে পানিতে ভরপুর হয়ে গেলো। সবাই পানি পান করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, হে মুআয! তোমরা যদি দীর্ঘায়ূ লাভ করো তবে দেখতে পাবে, এস্থানটি একদিন বড় বড় অট্টালিকা এবং উদ্যানে সুশোভিত হয়ে উঠবে। পরবর্তীতে তাই হয়েছিলো। এই খবর প্রদানের ব্যাপারটিও রসুলেপাক স.এর একটি মোজেজা।

হুদাইবিয়া যুদ্ধের বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. চারশ' সাহাবী নিয়ে হুদাইবিয়ার কূপের নিকট উপস্থিত হলেন। কূপটি ছিলো এমন যে, পঞ্চাশটি বকরীকেও তা থেকে পানি পান করানো যায় না। সাহাবায়ে কেরাম কূপের সমস্ত পানি তুলে ফেললেন। এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট ছিলো না। এমতাবস্থায়

রসুলেপাক স. কূপের এক পাশে এসে দাঁড়ালেন। বালতিতে রাখা পানি দিয়ে অজু করলেন। তারপর মুখের কুলি করা পানি কূয়োর মধ্যে ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কূপের পানি উথলে উঠলো। কূপের মুখ পর্যন্ত পানি থৈ থৈ করতে লাগলো। পানি পান করে সাহাবীগণ পরিতৃপ্ত হলেন এবং আপন উটসমূহকেও পানি পান করালেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তুনীর থেকে তীর বের করে কূপের ভিতর নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পানি উঠতে লাগলো। সাহাবীগণ সকলেই তৃপ্তির সাথে সেই পানি পান করলেন। হজরত জাবের রা. থেকেও এরকম বক্তব্য এসেছে। হুদাইবিয়া নামক স্থানে রসুলেপাক স. এর আঙুল মোবারকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে ঝর্ণাধারা জারী হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়।

দু'টি বর্ণনার মধ্যে সামান্য অসামঞ্জস্য আছে। উলামা কেরাম দু'টি ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হয়েছিলো বলে মনে করেন। জাবের রা. বর্ণিত হাদীছের বিবরণ হচ্ছে– নামাজের সময় হলে রসুলেপাক স. অজু করলেন এবং সকলেই পানি পান করে তৃপ্ত হলেন। তারপর তিনি বালতির অবশিষ্ট পানি কূপের মধ্যে ঢেলে দিলে পানি বৃদ্ধি পেলো। এভাবেই দুই বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

হজরত আবু কাতাদা রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদা সাইয়্যেদে আলম স. আমাদেরকে একটি সফর সম্পর্কে আভাস দিয়ে বললেন, সারা রাত চলতে থাকবে। সকালে ইনশাআল্লাহ্ পানির নিকট পৌঁছে যাবে। নির্দেশ মোতাবেক সেখানে পৌঁছে সকলেই পানির সন্ধান করতে লাগলেন। রসুলেপাক স. এর সাহচর্যের কথা তাঁরা ভুলেই গেলেন। আরো সামনে চলতে লাগলেন। রাতের শেষ প্রহরে রসুলেপাক স. একস্থানে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে সাহাবীগণকে বলে রাখলেন, যাতে তাঁরা ফজরের ওয়াক্তের খেয়াল রাখেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে সকলেই নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সকলের পূর্বে ঘুম থেকে জাগলেন নবী করীম স.। তাঁর পবিত্র মুখাবয়বের উপর সূর্যের কিরণ পড়ছিলো। তিনি বললেন, যাত্রা শুরু করো, এখান থেকে দ্রুত চলে যেতে হবে। এটা শয়তানের জায়গা। সকলেই রওনা হয়ে গেলেন। সূর্য তখন বেশ উপরে। একস্থানে থামলেন সবাই। তাঁবু খাটালেন। সাহাবীগণের নিকট পানির অন্বেষণ করলেন রসুল স.। পানির মশকটি আমার নিকটে ছিলো। পানি ছিলো সামান্য। তিনি সেটুকু দিয়ে অজু করলেন এবং অবশিষ্ট যৎসামান্য পানিসহ মশকটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, খুব হেফাজতে রেখো। এর মাধ্যমে এক বিরাট মোজেজা প্রকাশ পাবে।

এরপর হজরত বেলাল রা. নামাজের জন্য আযান দিলেন। ফজরের নামাজ আদায় করে সামনে অগ্রসর হলেন রসুল স.। সূর্যের আলো যখন প্রখর হয়ে

গেলো, সবকিছু হলো উত্তপ্ত, তখন আমরা নিবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা তো পিপাসায় মরে যাচ্ছি। তিনি বললেন, না। এরপর তিনি আমার কাছ থেকে মশক নিয়ে মশকের মুখের উপর মুখ রাখলেন। বুঝলাম না, রসুলেপাক স. মশকের মধ্যে তাঁর মুখের লালা মোবারক ঢেলে দিলেন, না ফুঁ দিলেন। দেখলাম, মশক থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। রসুল স. আমাকে হুকুম করলেন, লোকদেরকে পানি পান করাও। সবাই পানির জন্য জটলা করতে লাগলেন। নবী করীম স. বললেন, ভিড় কোরো না। শৃঙ্খলার সঙ্গে পানি পান করো। সকলেই পান করতে পারবে। পানি পান করে সকলেই পরিতৃপ্ত হলো। আমরা ছিলাম তিনশ'। সকলের শেষে রসুলেপাক স. আমার দিকে পানির পাত্রটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাও, পান করো। আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি পান না করলে আমি পান করবো না। তিনি হুকুম করলেন, তুমি পান করো। পানি পান করানেওয়ালা সবশেষেই পান করে থাকে।

সাইয়্যেদুনা ওমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত আছে, তখন মানুষ এতো পিপাসিত হয়ে পড়েছিলো যে, তারা নিজেদের উট জবেহ করে সেগুলোর নাড়িভুঁড়ি নিঙড়িয়ে পান করা শুরু করে দিয়েছিলো। তখন হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. আল্লাহ্তায়ালার কাছে দোয়া করার জন্য নবী করীম স. নিকট আবেদন জানালেন। তিনি দোয়া করার জন্য হাত ওঠালেন। দোয়া শেষে হাত নামানোর আগেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। যাঁদের নিকট বরতন ছিলো, সকলের বরতনই ভরপুর হয়ে গেলো। লক্ষণীয় ব্যাপার, এই বৃষ্টি সেনাসীমানার বাইরে কোথাও বর্ষিত হয়নি। লশকরের সীমানা পর্যন্তই ছিলো এই বৃষ্টির পতনপরিধি।

কথিত আছে, একদা নবী করীম স. ও তাঁর চাচা সাইয়্যেদ আবু তালিব একটি বাহনের উপর বসে সফর করছিলেন। আবু তালিব বললেন, ভাতিজা! আমার তেষ্টা পেয়েছে। পানিও নেই। রসুলেপাক স. বাহন থেকে নিচে নামলেন এবং কদম মোবারক দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন। যমীন থেকে পানি বের হতে লাগলো। রসুল স. বললেন, চাচাজান! পানি পান করুন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত আছে, এক সফরে আমি রসুল করীম স. এর সঙ্গে ছিলাম। লোকেরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লো। তিনি দু'জন সাহাবীকে ডাক দিয়ে আনলেন। তন্মধ্যে একজন হচ্ছেন হজরত আলী ইবনে আবী তালিব। বললেন, পানির তালাশে বেরিয়ে পড়ো। তোমরা একটি মেয়ে লোককে দেখতে পাবে, যার উটের উপর দু'টি পানির মশক রয়েছে।

দু'জন সাহাবী সেই মহিলার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়লেন এবং এক পর্যায়ে উক্ত রমণীর সাথে দেখা হয়ে গেলো। তাঁরা উক্ত রমণীকে পানির মশকসহ নবী করীম স. এর নিকটে নিয়ে এলেন। তার উটের উপর থেকে পানির মশক নামিয়ে আনা

হলো। রসুলেপাক স. পানির বরতন চাইলেন এবং রমণীর মশক থেকে পানি নিয়ে বরতনে ঢাললেন। বললেন, তোমরা এসো। সকলেই পানি পান করে যাও এবং অন্যদেরকেও পান করাও।

মহিলাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলো এবং এমনভাবে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো যে, সামনে না জানি আরও কতো ঘটনা ঘটবে। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! রসুলেপাক স. মহিলার মশক ভর্তি পানি সবটুকুই ফিরিয়ে দিলেন এবং আমার মনে হলো যে পূর্বের পানির চেয়ে তার পানি আরও বেশী হয়ে গেছে। এরপর রসুলেপাক স. ওই মহিলার জন্য আহারের আয়োজনের নির্দেশ দিলেন।

সাহাবীগণ খেজুর, আটা এবং ছাতু একত্রিত করে চাদরের মধ্যে বেঁধে তার উটের উপর রেখে দিলেন। অতঃপর নবী করীম স. মহিলাটিকে লক্ষ্য করে বললেন, যাও। তোমার পানি একটুও কমেনি। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে তাঁর আপন কুদুরত থেকে পানি দান করেছেন। এরপর মহিলাটি আপন জনপদে পৌঁছে লোকদেরকে বলতে লাগলো, আমি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। দু'জন লোক আমাকে এমন একজন লোকের কাছে নিয়ে গেলো, যাঁকে তারা তাদের নেতা বলে মনে করে। এরপর মহিলাটি সমস্ত ঘটনা বলার পর বললো, আল্লাহ্‌র কসম! লোকটি হয় একজন মস্ত যাদুকর, না হয় আল্লাহ্‌র খাঁটি রসুল। সে আরো বললো, তোমাদের কারও ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে না কি?

হাদীছের বিবরণ আরো দীর্ঘ। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায় এই হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো বিবৃতিতে আছে, লোকেরা সেই মহিলার কথা শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। এ ধরনের আরও হাদীছ রয়েছে। যথাস্থানে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

আহারের মোজেজা

অল্প খাবারকে অধিক করে দেয়ার ব্যাপারেও বর্ণনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হজরত জাবের রা. বলেন, একদিন আমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, খাবার আছে? আমি রসুল করীম স. কে ক্ষুধার্ত দেখে এসেছি। আমার স্ত্রী একটি থলে বের করে আনলো, যার মধ্যে এক সা এর মতো যব ছিলো। আর একটি বকরীর বাচ্চা এনে দিলো। বকরীর বাচ্চাটি জবেহ করলাম। আমার স্ত্রী যব পিষে আটা তৈয়ার করলো। এরপর গোশত বানিয়ে পাতিলে চড়িয়ে দিয়ে রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হলাম এবং নিবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি একটি বকরীর বাচ্চা জবেহ করেছি এবং আমার স্ত্রী যব পিষে আটা প্রস্তুত করেছে। একথা শুনে রসুলেপাক স. কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে আমার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন। তিনি স. উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন, চলো, সবাই চলো। জাবের খানা

প্রস্তুত করেছে। ওর ওখানে যাই। অতঃপর রসুলেপাক স. বলে দিলেন, যেনো না যাওয়া পর্যন্ত পাতিল চুলা থেকে না নামানো হয়। আর আটার খামিরগুলোকেও যেনো ওই অবস্থাতেই রেখে দেয়া হয়। অতঃপর রসুলেপাক স. এক হাজার সাহাবীকে নিয়ে আমার বাড়িতে এলেন। আমি আটা এবং গোশতের পাতিল রসুলেপাক স. এর সামনে এনে দিলাম। তিনি তার মধ্যে তাঁর পবিত্র মুখের কিছু লালা ফেলে দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। আমার স্ত্রীকে বললেন, রুটি তৈয়ার করো। সঙ্গে অন্য কোনো মহিলাকে নিয়ে নাও। পাতিল থেকে গোশত বের করো, তবে ঢাকনা খুলে ভিতরে দেখো না। হজরত জাবের বলেন, আল্লাহ্তায়ালার কসম! এক হাজার মানুষ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। তারপরও গোশত এবং আটা বেশ কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেলো।

হজরত আনাস রা. এর হাদীছ

এ প্রসঙ্গে বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত আনাস রা. এর হাদীছও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হজরত আবু তালহা রা. হজরত উম্মে সুলায়ম রা. কে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি রসুলেপাক স. এর কণ্ঠস্বরে ক্লিষ্টতা অনুভব করেছি। ক্ষুধায় তাঁকে দুর্বল করে ফেলেছে। খাবার কি কিছু আছে? বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে হজরত উম্মে সুলায়ম যবের কয়েকটি রুটি এনে কাপড়ে পেঁচিয়ে আমাকে দিলো। আমি রুটিক'টি রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির করলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন এবং তাঁর কাছে অনেক লোকজনও ছিলো।

রসুলেপাক স. আমাকে দেখে বললেন, তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ। রসুলেপাক স. সাহাবীগণকে বললেন, চলো। আবু তালহার বাড়িতে যাই। সবাই রওয়ানা হলেন। আমি পূর্বেই আবু তালহার নিকট খবর দিলাম, রসুল স. আসছেন।

এ কথা শুনে হজরত আবু তালহা হজরত উম্মে সুলায়মকে বললেন, হে উম্মে সুলায়ম! রসুল স. তো সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন। আর আমাদের রয়েছে মাত্র কয়েকখানা রুটি। কী করবো? আর রুটি কয়টি তো রসুলেপাক স. এর খেদমতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। উম্মে সুলায়ম বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই ভালো জানেন।

রসুলেপাক স. এসে হজরত উম্মে সুলায়মকে বললেন, উম্মে সুলায়ম! যা কিছু আছে হাজির করো। উম্মে সুলায়ম পূর্বে প্রেরিত রুটিগুলোই রসুলেপাক স. এর সামনে পেশ করলে তিনি বললেন, রুটিগুলোকে টুকরা টুকরা করে তার মধ্যে সামান্য ঘি মিশ্রিত করে সেগুলো একটি বরতনে করে আমাদের সামনে নিয়ে এসো। রুটি আনা হলে রসুলেপাক স. কিছু পাঠ করে তার উপর দম করলেন

এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর বললেন, এক সঙ্গে দশজন করে খেতে বসো। এক সঙ্গে দশ জন করে এলেন এবং পেট ভরে খেয়ে চলে গেলেন। এভাবে প্রায় সত্তর অথবা আশি জন ভোজন করলেন। বোখারী শরীফে সত্তর অথবা আশির মধ্যে বর্ণনাকারীর সন্দেহের উল্লেখ রয়েছে। তবে মুসলিম শরীফে বর্ণনাকারী কোনো প্রকার সন্দেহ ছাড়াই আশিজনের কথা বলেছেন। সকলের শেষে রসুলেপাক স. এবং হজরত আবু তালহার ঘরের লোকজনেরা খেয়েছিলেন। এক বর্ণনায় আট জনের দলের কথা রয়েছে। তবে আট জনের ব্যাপারটি সম্ভবতঃ অন্য কোনো ঘটনা সংক্রান্ত হবে। বোখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য অধিকাংশ বিবরণে দশজনের দলের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার বর্ণনাও এরকম। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ছোট ছোট দল করে খেতে বলার হুকুম দেয়ার মাহাত্ম্য সম্পর্কে উলামা কেরাম বলেন, সকলকে একসাথে আসতে বলা হলে এতো অল্প খাবারকে তাঁরা যথেষ্ট মনে করতেন না। এরকম ধারণা বরকত না হওয়ার কারণ হয়ে যেতে পারতো। তাই রসুলেপাক স. তাদেরকে ছোট ছোট দল করে আসতে বলেছিলেন। অন্য একটি কারণ এও হতে পারে যে, একসাথে বসার মতো প্রশস্ততা সেখানে ছিলো না। অথবা আশংকা ছিলো ভিড়ের এবং গোলমালের। ওয়ালাল্লাহু আ'লাম।

হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদীছ

হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, তবুক যুদ্ধের কথা যা ছিলো রসুলেপাক স. এর জীবনের শেষ যুদ্ধ। মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছিলো, তখন হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! হুকুম করুন, যার কাছে যেটুকু খাদ্য আছে, সবাই যেনো সেসব একত্রিত করে এবং আপনি মেহেরবানি করে বরকতের জন্য দোয়া করুন।

নবী করীম স. বললেন, ঠিক আছে। ঘোষণা শুনে সবাই তাদের অপ্রতুল খাদ্য সামগ্রী এনে একত্রিত করতে লাগলেন। কেউ আনলেন এক মুষ্টি ছাতু, কেউবা এক টুকরা রুটি। এক ব্যক্তি আনলেন এক সা অর্থাৎ পৌণে চার সের খেজুর। দস্তরখানায় এই সামান্য খাদ্যসম্ভার রেখে রসুলেপাক স. বরকতের জন্য দোয়া করলেন। তারপর হুকুম কররেন, সকলেই যেনো আপন আপন পাত্র ভরে নেয়। সেনাদলের সকলেই পাত্র পূর্ণ করে নিলেন এবং আহার করলেন পরিতৃপ্তির সাথে। এরপরেও দস্তরখানায় কিছু খাবার অবশিষ্ট থেকে গেলো। সেই তবুক যুদ্ধের সৈন্যসংখ্যা ছিলো সত্তর হাজার। নবী করীম স. যখন এই মোজেজা প্রদর্শন কররেন, বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ স. আপনি তো এইমাত্র বললেন, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আন্নী রসুলুল্লাহ' এর

কারণ কি? তিনি স. বললেন, এই সাক্ষ্যের সাথে যে আল্লাহ্তায়ালার সাক্ষ্য লাভ করতে পারবে, নিঃসন্দেহে তার বাসস্থান হবে জান্নাত।

বান্দা মিসকীন শায়েখ মুহাক্কেক আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলবী র. বলেন, মোজেজা দর্শনকালে উম্মতের শাহাদাতের কলেমা উচ্চারণ হয়ে থাকে নবুওয়াতের দাবীর সত্যতার উপর বিশ্বাস ও দৃঢ়প্রত্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই। কিন্তু এ স্থলে এই শাহাদত দ্বারা উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করা ও শিক্ষা প্রদান করাই ছিলো নবী করীম স. এর উদ্দেশ্য।

হজরত আনাস রা. এর হাদীছ

হজরত আনাস রা. বলেন, উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা যয়নব রা. এর বিবাহের সময় হজরত উম্মে সুলায়ম রা. হায়স ভর্তি একটি বড় পেয়ালা আমাকে দিয়ে রসুলেপাক স. এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। হায়স হচ্ছে খেজুর, ঘি ও ছাতুমিশ্রিত এক বিশেষ ধরনের আহার্য। উম্মে সুলায়ম হজরত আনাসকে বললেন, হে আনাস! এগুলো রসুলেপাক স. এর খেদমতে নিয়ে যাও এবং বলো আপনার খেদমতে আমার আম্মাজান এই খাবার প্রেরণ করেছেন। আপনার কাছে তিনি সালাম পেশ করেছেন।

হজরত আনাস নবী করীম স. এর দরবারে খাবার পেশ করলেন। তিনি বললেন, রেখে দাও। অমুক অমুক ব্যক্তিকে ডেকে আনো। কাকে কাকে আনতে হবে তিনি তাঁদের নাম বলে দিলেন। আরও বললেন, রাস্তায় যাকে যাকে পাবে তাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। হজরত আনাস বলেন, রসুলেপাক স. যাদেরকে ডেকে আনতে বলেছিলেন, তাঁদেরকে এবং রাস্তায় যাদের পেয়েছি, তাঁদের সকলকে ডেকে আনলাম।

রসুলেপাক স. এর বাড়ির আঙ্গিনা তখন লোকে লোকারণ্য। হজরত আনাস জানিয়েছেন, লোকসংখ্যা ছিলো তিন হাজার।

রসুলেপাক স. তাঁর পবিত্র হাতখানা হায়সের বরতনের উপর রাখলেন এবং কিছু পাঠ করলেন। তারপর দশ জন করে খেতে ডাকলেন। বললেন, তোমরা প্রত্যেকেই বিসমিল্লাহ পড়ে নিজেদের সামনে থেকে খেতে থাকো। এভাবে একসঙ্গে দশজন করে আসছেন এবং খেয়ে চলে যাচ্ছেন। সকলেই পেট পুরে খেলেন। এরপর তিনি স. বললেন, আনাস! এখন বরতন উঠিয়ে নাও। হজরত আনাস বলেন, আমি বরতন ওঠালাম। কিন্তুবুঝতে পারলাম না, হায়সভর্তি বরতনটিতে আনার সময় খাবার বেশী ছিলো, না বেশী ছিলো নিয়ে যাবার সময়। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

হজরত আবু আইয়্যুব আনসারী রা. এর হাদীছ

হজরত আবু আইয়্যুব আনসারীর হাদীছে এসেছে, একবার তিনি রসুলেপাক স. এবং হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা., এ দুজনের জন্য যথেষ্ট হয়– এই পরিমাণ খাবার প্রস্তুত করলেন। রসুলেপাক স. আবু আইয়্যুব আনসারী রা. কে বললেন, আনসারদের সম্মানিত ত্রিশজন লোককে ডেকে আনো। তিনি তাঁদেরকে ডেকে আনলেন। রসুলেপাক স. তাদেরকে খানা খাওয়ালেন। কিন্তু খানা তার পরেও অবশিষ্ট রইলো। পরে সত্তরজন আনসারকে ডেকে এনে খানা খাওয়ানো হলো। তারপরও খানা অবশিষ্ট রইলো। এ সকল লোকদের মধ্যে এমন একজন লোকও ছিলো না, যারা খানা খাওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে রসুলেপাক স. এর হাতে বায়াত হননি। হজরত আবু আইয়্যুব আনসারী রা. বলেন, আমার খানা সেদিন একশ' আশি জন খেয়েছিলো।

হজরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. এর হাদীছ

হজরত সামুরা ইবনে জুন্দুবের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেন, একদিন আমরা সারাদিন রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ছিলাম। আল্লাহ্তায়ালার কসম! আমরা কয়েকজন পর্যায়ক্রমে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষদেরকে খানা খাওয়ালাম। দশজন লোক খানা শেষ করে দাঁড়াতো, তখন আর দশজন খানার জন্য বসতো। কেউ তখন হজরত সামুরাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, এতো বরকত কোত্থেকে হয়েছিলো? তিনি আসমানের দিকে ইশারা করে বলেছিলেন, ওখান থেকে। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন দারেমী, ইবনে আবী শায়বা, তিরমিযী, হাকেম, বায়হাকী এবং আবু নঈম।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর রা. এর হাদীছ

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবী বকরের হাদীছে এসেছে, একবার আমরা একশ' তিরিশ জন নবী করীম স. এর সঙ্গে ছিলাম। প্রায় সাড়ে চার সের আটার খামির বানানো হয়েছিলো। আর একটি বকরীর গোশত পাক করা হয়েছিলো। তারপর বকরীর কলিজা, গোর্দা ইত্যাদি ভূনা করা হয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালার কসম! একশত তিরিশ জনের মধ্যে এমন একজনও ছিলো না, যাকে রসুলেপাক স. গোশতের টুকরা প্রদান করেননি। গোশতের তরকারী দু'টি বড় বড় বরতনে রাখা হয়েছিলো। সকলেই অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পর বেঁচে যাওয়া গোশত নিজের বরতনে ভরে উটের পিঠে তুলে দিয়েছিলেন।

হজরত আবু হুরায়রা রা. এর কয়েকখানা হাদীছ

হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসুল করীম স. আমাকে আহলে সুফফাগণকে ডেকে আনতে বললেন। আমি তাঁদেরকে ডেকে নিয়ে এলাম। রসুলেপাক স. এর সামনে তখন এক পেয়ালা খানা ছিলো। সেই খানাটুকু আমরা সকলে মিলে খুব তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করলাম। খাওয়া শেষে দেখা গেলো, পেয়ালা পূর্বের মতোই ভর্তি। তবে তাতে আঙুল লাগানোর দাগ শুধু দেখা যাচ্ছিলো। অন্য এক হাদীছে হজরত আবু হুরায়রা বলেন, এক সময় আমি খুবই ক্ষুধার্ত ছিলাম। রসুলেপাক স. এর সামনে তখন দুধভর্তি একটি পেয়ালা ছিলো। তিনি আসহাবে সুফ্ফাগণকে ডেকে আনতে বললেন। একথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, দুধতো নিতান্তই অল্প। রসুলেপাক স. যদি এটুকু আমাকেই দান করে দিতেন, তাহলে আমি পরিতৃপ্ত হতে পারতাম। কিন্তু নবী করীম স. এর আদেশ বাস্তবায়ন ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। সুতরাং আমি রসুলেপাক স. এর হুকুম মতো আসহাবে সুফফাগণকে ডেকে আনলাম। সকলেই পান করলেন। কেবল আমি আর রসুলেপাক স. বাকী ছিলাম। রসুলেপাক স. আমাকে পেয়ালা দিলেন। সকলের শেষে তিনি পান করলেন এবং বললেন, কাওমের সাকী সর্বশেষেই পান করে থাকে।

হজরত আলী রা. এর হাদীছ

হজরত আলী মুর্তজা বর্ণনা করেন, একবার রসুলেপাক স. আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদেরকে একত্রিত করলেন। তারা সর্বমোট চল্লিশ জন ছিলো। তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলো, যারা একেকজন একেকটি বকরী শুরুয়াসহ খেয়ে শেষ করে দিতে পারে। কিন্তু রসুলেপাক স. মেহমানদারীর জন্য মাত্র এক বরতন খানার আয়োজন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তারা সকলেই অত্যন্ত পরিতৃপ্তি সহকারে খানা খেয়েছিলো। খাওয়া শেষে এক পেয়ালা পানি দেয়া হলো। সকলে মিলে সেই এক পেয়ালা পানি পান করার পরে দেখা গেলো, পেয়ালা আগের মতোই ভর্তি।

হজরত জাবের রা. এর হাদীছ

হজরত জাবের থেকে বর্ণিত আছে, উম্মে মালেক নামের জনৈকা আনসারী মহিলা মাঝে মাঝে রসুলেপাক স. এর খেদমতে এক পেয়ালা ঘি পাঠাতেন। তিনি সর্বদাই পেয়ালা ভর্তি ঘি দেখতে পেতেন। একদিন উম্মে মালেকের সন্তানেরা খাওয়ার জন্য সালুন চাইলো। কিন্তু ঘরে সে সময় কোনো সালুন ছিলো না। মহিলা সেই পেয়ালাটির কাছে গেলেন, যার মধ্যে দৈনিক তিনি ঘি জমা করতেন। সেদিন তিনি সেই পেয়ালা থেকে সবটুকু ঘি ঢেলে সন্তানদেরকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু পরে আর তাতে ঘি জমা করতে পারলেন না। তিনি রসুলেপাক স. এর খেদমতে যেয়ে

সব কথা খুলে বললেন। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি তো সমস্ত ঘি নিংড়িয়ে ঢেলে নিয়েছিলে, তাই এমন অবস্থা হয়েছে। সামান্য কিছু রেখে দিলে সর্বদাই ঘি থাকতো।

বান্দা মিসকীন (শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, বর্ণিত হাদীছ দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, রসুলেপাক স. এর মহব্বতে যা কিছু খরচ করা হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রিযিকের ভাণ্ডার থেকে তাতে দান করেছেন বরকত আর বরকত।

হজরত জাবের রা. এর আরেকখানা হাদীছ

হজরত জাবের থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর নিকট কিছু খানা চাইলো। রসুলেপাক স. তাকে ষাট সা যব দান করলেন। লোকটি খাদ্যটুকু নিয়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রী পরিজন ও মেহমানসহ খেয়ে যেতে লাগলো। পরিশেষে একদিন খাবারটুকু ওজন করে দেখার পর সহসাই সে খাদ্য ফুরিয়ে গেলো। লোকটি রসুলেপাক স. এর খেদমতে যেয়ে তার অবস্থার কথা আরজ করলো। তিনি স. বললেন, তুমি ওজন না করলে খাদ্য কখনও শেষ হতো না।

আহলে এলেমগণ বলেন, পেয়ালা থেকে ঘি নিংড়িয়ে বের করার কারণে এবং যবকে ওজন করার কারণে বরকত দূর হয়ে গেলো। হেকমত এই যে, নিংড়ানো এবং ওজন করা আল্লাহ্তায়ালার উপর তাওয়াককুলের পরিপন্থী কাজ। তাই নেয়ামত দূর করার দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। ইমাম নববী র. এ মাহাত্ম্যটি বর্ণনা করেছেন। এজন্যই খাবার পাতিলের ভিতর দৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছিলো।

এ সম্পর্কে উপরে একখানা হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বরকতের পরিপ্রেক্ষিতে ওই হাদীছখানাও বিখ্যাত, যা ইমাম বোখারী হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি হজরত জাবেরের পিতা হজরত আবদুল্লাহ আনসারী রা. এর ঋণ আদায় সংক্রান্ত। হজরত আবদুল্লাহ আনসারীর কর্জদাররা ঋণের টাকা দাবী করলো। কিন্তু আবদুল্লাহ আনসারীর খেজুর বাগানে ওই পরিমাণ খেজুর ছিলো না, যার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যায়। হজরত জাবের নবী করীম স. এর দরবারে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি তো জানেন, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি অনেক ঋণ রেখে গেছেন, আমার ইচ্ছা ছিলো, ঋণ শোধের উদ্দেশ্যে বাগানের খেজুরগুলো রসুল স. এর দরবারে পেশ করি। কিন্তু খেজুরের পরিমাণ ঋণ শোধ করবার মতো নয়।

রসুলেপাক স. বললেন, যাও, আলাদা আলাদাভাবে রক্ষিত খেজুরের স্তূপগুলো একত্রে জমা করে কয়েকটি স্তূপ করে ফেলো। রসুলেপাক স. এর আদেশ মোতাবেক সেরকমই করলাম। এরপর আমি রসুলেপাক স. কে সঙ্গে নিয়ে সেদিকে চললাম।

কর্জদাররা যখন রসুলেপাক স. কে দেখলো, তখন তারা আমার পিছু নিলো। তিনি যখন তাদেরকে দেখতে পেলেন, তখন খেজুরের স্তূপের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করলেন, সবচেয়ে বড় স্তূপটির নিকট বসে পড়লেন এবং বললেন, কর্জদারদেরকে ডেকে আনো। অতঃপর রসুলেপাক স. তাদেরকে মেপে মেপে খেজুর দিতে লাগলেন। এভাবে আমার মরহুম পিতার সমস্ত ঋণ শোধ হয়ে গেলো।

আমি মনে মনে মহাখুশী। ভাবলাম, পিতার ঋণ তো পরিশোধ হলো। এখন বোনদের জন্য কিছু না থাকলেও ক্ষতি নেই।

হজরত জাবেরের বোন ছিলেন নয়জন। বড় স্তূপটি থেকেই সকলের পাওনা পরিশোধ হয়েছিলো। অন্যান্য স্তূপগুলো পুরাই রয়ে গিয়েছিলো। হজরত জাবের রা. বলেন, রসুল করীম স. যে বড় স্তূপটি থেকে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করেছিলেন, পরে দেখি সেই স্তূপটিও আগের মতোই পূর্ণ। একটা খেজুরও কমেছে বলে মনে হলো না। কর্জদাররাও বিস্ময়ে হতবাক।

হজরত আবু হুরায়রা রা. এর আরেকখানা হাদীছ

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, একদা আমরা প্রচণ্ড ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়েছিলাম। রসুলেপাক স. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার কাছে কি কিছু আছে? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রসুলাল্লহ! থলের মধ্যে কয়েকখানা খেজুর রয়েছে। তিনি বললেন, নিয়ে এসো। অতঃপর রসুলেপাক স. স্বীয় হস্ত মোবারক থলের ভিতর প্রবেশ করালেন এবং এক মুষ্টি খেজুর বের করে এনে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর একসঙ্গে দশ জন করে খেতে আসতে বললেন, সবাই পেট পুরে খাওয়ার পর রসুলেপাক স. আমাকে বললেন, যাও, যা এনেছিলে নিয়ে যাও এবং যত্নসহকারে রেখে দিও। প্রয়োজন পড়লে থলের ভিতর হাত দিয়ে বের করে এনো। কখনও গুণো না এবং থলে ঝেড়ো না। যাওয়ার সময় দেখলাম, যা এনেছিলাম তার চেয়ে বেশী নিয়ে যাচ্ছি।

এরপর রসুলেপাক স. এর জীবদ্দশায়, হজরত আবু বকর রা. ও হজরত ওমর ফারুক রা. এর জীবদ্দশায় আমি ওই থলে থেকে খেজুর বের করে করে নিজে খেয়েছিলাম এবং অন্যকেও খাইয়ে ছিলাম। হজরত ওছমান রা. শহীদ হবার পর আমার ঘরবাড়ি লুট হয়ে যায় এবং থলেখানা হারিয়ে যায়।

অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি ওই থলে থেকে যতো খেজুর বের করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বণ্টন করেছি এবং উট ভর্তি করে দিয়েছি, তার পরিমাণ আমার যতদূর মনে পড়ে এক ওসক এবং ষাট সা ছিলো। এক সা হয় সাড়ে চার সেরে।

উলামা কেরাম বলেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. এর উক্ত থলেতে দশখানার উপর খেজুর ছিলো না। আবার কেউ বলেন একুশখানার উপর ছিলো না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বর্ণিত আছে, একদিন নবী করীম স. হজরত ওমর রা. কে খেজুর দিয়ে উট বোঝাই করার নির্দেশ দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি চারশ' উট বোঝাই করে ফেললেন। দেখা গেলো যেখান থেকে উট বোঝাই করেছেন সেখানে খেজুরের পরিমাণ এতটুকুও কমেনি।

খাবার বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত বহু মোজেজা নবী করীম স. থেকে প্রকাশ পেয়েছে। এ রকম হাদীছ অনেক। তন্মধ্যে তবুক যুদ্ধের দিন সংঘটিত ঘটনাটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। পথ চলার মতো সংগৃহীত সামান্য পণ্যসামগ্রী থেকে খরচের পর বেঁচে যাওয়া যৎসামান্য খাবারের মধ্যে এতো বরকত হয়েছিলো যে, সত্তর হাজার সৈন্য পেট ভরে খেয়েছিলেন, আবার বরতনে ভরে নিয়েও ছিলেন।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদেরকেও যেনো সরওয়ারে কায়েনাত স. এর বরকত থেকে মাহরুম না করেন। এই ফকীর দরবেশদেরকেও যেনো রসুলেপাক স. এর জাহেরী ও বাতেনী নেয়ামত দানে ধন্য করেন। আমীন।

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী বলেন, এ মুহূর্তে আমার ওই ঘটনাটি মনে পড়ে গেলো— মক্কা মুকাররমার বাজারে এক তরকারী বিক্রেতা তরকারীর মধ্যে পানি ছিটিয়ে দিতে দিতে বলছিলো, হে নবীর বরকত! তুমি নাযিল হও। এসো। অতঃপর যাও। হে আল্লাহ্! নবী স. এবং তাঁর বংশধরগণের উপর দরূদ এবং সালাম বর্ষণ করো এবং বরকত প্রদান করো।

প্রাণীর মুখে কথা বলানো এবং আনুগত্য করানো

সাইয়্যেদে আলম স. এর হুকুম পালন করা, তাঁর শরীয়ত পালন করা, তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর আদেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা মানব জাতির উপর যেমন ফরজ করে দেয়া হয়েছে, তেমনি প্রাণীকুলকেও রসুলেপাক স. এর ফরমাবরদার বানিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে ইমানদারগণই সৌভাগ্যের রাজটিকা লাভ করেছে এবং তা হয়েছে নবী করীম স. এর আনুগত্যের মাধ্যমেই। আল্লাহ্তায়ালা এজাজ এবং অস্বাভাবিকতার ভিত্তিতে প্রাণীকুলকেও তাঁর হাবীব স. এর অনুগত করে দিয়েছেন। মুহাক্কেক এবং আহলে বাতেল সকলেই বলে থাকেন, নবী করীম স. এর নবুওয়াত ও রেসালত সমস্ত প্রাণীকুল, উদ্ভিদরাজি, জড়পদার্থ তথা সমস্ত মাখলুকাতের প্রতিই সম্বন্ধিত। কিন্তু প্রাণীকুল যেহেতু জ্ঞানের সীমানা এবং আদেশ নিষেধের দায়বদ্ধতার বাইরে, তাই তাদের থেকে নবী করীম স. এর প্রতি ইমান, বিশ্বাস ও আনুগত্য ব্যতীত রেসালতের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের আর

কোনো নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় না। অবাধ্য ও গোনাহ্গার হিসেবেও তাদেরকে চিহ্নিত করা যায় না।

একটি উটের ঘটনা এই মর্মে উল্লেখ করা যেতে পারে। উটটি নবী করীম স. এর কাছে এসে মাথা নত করে সেজদা করেছিলো এবং তাঁর নিকট অভিযোগ পেশ করেছিলো।

হাদীছখানা হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। আনসার গোত্রের প্রত্যেকেই উট পালন করতো। এক বাড়িওয়ালা নবী করীম স. এর কাছে নিবেদন করলেন, আমার একটি উট রয়েছে যার পিঠে করে আমি পানি এনে থাকি। উটটি বড় বেয়াড়া হয়ে গিয়েছে। বোঝা বহন করতে চায় না। আর এদিকে আমার খেজুর বাগান পানির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে।

এ কথা শুনে নবী করীম স. সাহাবা কেরামকে সঙ্গে নিয়ে উটটির কাছে গেলেন। তিনি বাগানে পৌঁছলেন এবং একস্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাগানের এক কোণে বসা ছিলো উটটি।

আনসারী লোকটি বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ্! এটাই আমার উট, যে কুকুরের মতো মানুষকে কামড়াতে চায়। আমার ভয় হচ্ছে, না জানি আপনাকেও সে কামড়ে দেয়। তিনি বললেন, আমার ব্যাপারে ভয় কোরো না। রসুলেপাক স. উটের সামনে গেলেন। উটটি তাঁকে দেখামাত্র মাথা ওঠালো এবং তাঁর সামনে গিয়ে কদম মোবারকের কাছে মাথা নত করে সেজদা করলো।

রসুলেপাক স. উটটির মাথার পশম ধরে টান দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিলেন। সাহাবা কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এটি একটি জানোয়ার, তার কোনো জ্ঞানবুদ্ধি নেই। এই প্রাণীটি আপনাকে সেজদা করেছে। তবেতো আমরাও আপনাকে সেজদা করতে পারি।

রসুলেপাক স. এরশাদ করলেন, কোনো মানুষের জন্য এটা উচিত নয় যে, সে অন্য একজন মানুষকে সেজদা করবে। মানুষের জন্য মানুষকে সেজদা করা বৈধ হলে আমি নারী জাতিকে তাদের স্বামীগণকে সেজদা করতে বলতাম। এই হাদীছখানা ইমাম আহমদ এবং নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তখন রসুলেপাক স. বলেছিলেন, আসমান ও যমীনের মধ্যে নাফরমান জ্বীন ও মানুষ ব্যতীত অন্য কারো এটা অজানা নয় যে, আমি আল্লাহ্র রসুল। অন্য এক হাদীছে এসেছে, লোকেরা উটটিকে জবেহ্ করতে চেয়েছিলো, তখন উটটি রসুলেপাক স. এর কাছে নালিশ করেছিলো। এক হাদীছে এসেছে, উটটি রসুলেপাক স. এর সামনে হাজির হয়ে তার গর্দান রসুলেপাক স. এর সামনে নত করে তার নিজের ভাষায় ফরিয়াদ করেছিলো। তা দেখে রসুলেপাক স. তার মাথার চুল ধরে টেনে খাড়া করলেন এবং তার মালিককে

বললেন, উটটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। লোকটি বললো, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে হাজির। তবে উটটি যে আমার পরিবারের প্রয়োজন মেটায়। জীবিকার জন্য এ উটটি ছাড়া আমার আর কিছু নেই।

রসুলেপাক স. বললেন, উটটি অভিযোগ করছে, তুমি তাকে দিয়ে বেশী কাজ করাও, আর খেতে দাও কম। তুমি তার অধিকারের দিকে খেয়াল রেখো। এই হাদীছটি বিভিন্ন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো বর্ণনাই সহীহ্।

হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন, নবী করীম স. হজরত আবু বকর রা. ও হজরত ওমর রা.কে সঙ্গে নিয়ে জনৈক আনসারীর বাগানে গেলেন। সেখানে একটি বকরী ছিলো। বকরীটি রসুলেপাক স. কে সেজদা করলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরাই তো আপনাকে সেজদা করার অধিকার রাখি বেশী। তিনি স. বললেন, এক মানুষের জন্য আরেক মানুষকে সেজদা করা বৈধ নয়।

একবার একটি উট নবী করীম স. এর নিকটে এসে তার কাওমের লোকদের সম্পর্কে অভিযোগ করে বললো, তারা এশার নামাজ আদায় না করেই ঘুমিয়ে পড়ে। আমার ভয় হচ্ছে, না জানি আল্লাহ্তায়ালা তাদের উপর আযাব নাযিল করে দেন।

রসুলেপাক স. তাদেরকে ডেকে এনে বলে দিলেন, তারা যেনো এশার নামাজ আদায়ের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, আমাদের ঘরে একটি বকরী ছিলো। রসুলেপাক স. আরাম করার জন্য যখন আমার ঘরে তশরীফ আনতেন, তখন বকরীটি নিশ্চিন্তে আরামের সাথে চুপচাপ পড়ে থাকতো। আর তিনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলে পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে দিতো।

এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম স. যখন উট কোরবানী করতে উদ্যত হতেন, তখন উটগুলো একে অপরকে সরিয়ে দিয়ে রসুলেপাক স. এর সামনে দাঁড়িয়ে যেতো। একটি বকরীর দুধ শুকিয়ে গিয়েছিলো। তিনি স. সেই বকরীর স্তনে হাত লাগানো মাত্রই তার স্তন দুধে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলো। তিনি বকরীটির দুধ দোহন করে নিজেও পান করেছিলেন এবং হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা.কেও পান করিয়েছিলেন। উম্মে মা'বাদের এই বকরীর বিখ্যাত ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ হিজরতের বর্ণনায় আসবে ইনশাআল্লাহ্।

নেকড়ে বাঘের কথা বলা

নেকড়ে বাঘের কথা বলা সম্পর্কিত হাদীছ কতিপয় সাহাবী বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে এগুলো বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ র. হজরত আবু

সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার একটি নেকড়ে বাঘ একটি বকরীর উপর চড়াও হয়েছিলো এবং বকরীটিকে ধরে জঙ্গলের ভিতর নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু রাখালেরা বকরীটিকে বাঘের থাবা থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলো। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর বাঘটি তার লেজের উপর ভর করে বসে পড়ে বললো, রাখালেরা! তোমাদের আল্লাহ্র ভয় নেই। তোমরা আমার রিযিক ছিনিয়ে নিলে যা আল্লাহ্তায়ালা আমার অধিকারে দিয়েছিলেন।

একথা শুনে রাখালেরা বললো, সুবহানাল্লাহ্! কী আশ্চর্যের কথা। নেকড়ে বাঘ মানুষের মতো কথা বলে। নেকড়ে বাঘটি বললো, আমার মানুষের ভাষায় কথা বলার চেয়ে কি আশ্চর্যের বিষয় এটা নয় যে, মোহাম্মদ মদীনা মুনাওয়ারায় এসে লোকদেরকে অতীতকালের কথা এবং সংবাদ শোনাচ্ছেন অথচ মানুষেরা তাঁর উপর ইমান আনছে না। নেকড়ে বাঘের একথা শুনে রাখালেরা বকরীটি রেখে মদীনা শরীফে রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হলো এবং সমস্ত ঘটনা তাঁকে বললো। নবী করীম স. সকল মানুষকে একত্রিত করার ঘোষণা দিলেন। সকল মানুষ একত্রিত হলে রসুলেপাক স. রাখালদেরকে পুরো ঘটনা বর্ণনা করতে বললেন।

ইমাম বায়হাকী হজরত ইবনে ওমর রা. থেকে এবং আবু নাঈম হজরত আনাস থেকে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে সহীহ্ সনদের মাধ্যমে এই হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে উল্লেখ আছে, নেকড়ে বাঘ বলেছিলো, আমার কথা বলার চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, হারামাইনের মধ্যবর্তী স্থানে একজন মানুষ খেজুর বাগানের ভিতরে বসে অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে কথা বলছেন। তাঁর ব্যাপারটিতো আরও আশ্চর্যের। রাখালটি ইহুদী ছিলো। রসুলেপাক স. এর দরবারে এসে সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। হজরত আবু হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের কোনো কোনো সনদে এ রকম বর্ণনা এসেছে যে, নেকড়ে বাঘটি রাখালদেরকে বলেছিলো, আমার অবস্থার চেয়ে তোমাদের অবস্থাতো আরও বিস্ময়কর। তোমরা আপন বকরীর পাল নিয়ে রয়েছো, অথচ এমন এক নবীকে ছেড়ে দিয়েছো যাঁর চেয়ে উচ্চ মর্যাদাধারী আর কোনো নবীকে আল্লাহ্তায়ালা দুনিয়াতে প্রেরণ করেননি। তার জন্য বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়েছে। বেহেশতের হুর গেলেমান এবং ফেরেশতাবৃন্দ এই নবীর সাহাবীগণকে অভিনন্দন জানানোর জন্য অপেক্ষমাণ। তারা প্রতীক্ষারত, কখন নবীর সাহাবীগণ শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন, আর তারা তাঁদের সেবা করবেন। নেকড়ে বাঘ আরো বললো, তোমাদের এবং সেই নবীর মধ্যে সামনের এই পাহাড়ের স্তূপটি ছাড়া আর কোনো বাধা নেই। যাও, পাহাড় অতিক্রম করে নবীর দরবারে হাজির হও এবং আল্লাহ্র বাহিনীর মধ্যে নিজেদেরকে শামিল করে নাও।

রাখালেরা বললো, তাহলে আমাদের বকরীগুলোকে কে দেখবে? বাঘ বললো, আমিই বকরীগুলোকে দেখে রাখবো। তারা নবী করীম স. এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। পরে তারা নেকড়ে বাঘটিকে একটি বকরী খেতে দিয়েছিলো।

ওই ঘটনার মতো হজরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ও সফওয়ান ইবনে উমাইয়া থেকেও একটি বর্ণনা আছে। একটি নেকড়ে বাঘ একদিন একটি হরিণের উপর চড়াও হলো। হরিণটি হেরেমের সীমার ভিতরে এলে বাঘটি ফিরে গেলো। মানুষ বিস্মিত হলো।

নেকড়ে বাঘটি বললো, অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপারতো এই যে, মদীনা মুনাওয়ারায় মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করে যাচ্ছেন, আর তোমরা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকছো। একথা শুনে আবু সুফিয়ান সফওয়ানকে বললেন, লাত, মানাত ও উয্যার কসম, এই ঘটনা মক্কার লোকদের কাছে বর্ণনা করলে নারীরা স্বামী ছাড়াই তাদের জীবন কাটিয়ে দিবে। আবু জাহেল ও তার সাথীদের থেকেও এরকম একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে দব অর্থাৎ কাগলাশের হাদীছখানাও উল্লেখযোগ্য। কাগলাশ কথা বলেছিলো, যা ইমাম বায়হাকী অনেক হাদীছের মাধ্যমে জানিয়েছেন। কাযী আয়ায তাঁর কিতাব আশশেফাতে হজরত ওমর রা. থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, নবী করীম স. একদিন সাহাবা কেরামের এক মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ বনী সালেম গোত্রের এক বেদুইন একটি কাগলাশ শিকার করে নিয়ে এলো। সে উক্ত কাগলাশটিকে তার জামার আস্তিনের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিলো। উদ্দেশ্য, তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ভুনা করে খাবে। বেদুইন জিজ্ঞেস করলো, উপবিষ্ট লোকটি কে? সাহাবীগণ বললেন, ইনি আল্লাহ্‌র রসুল। বেদুনইনটি জামার আস্তিনের ভিতর থেকে কাগলাশটিকে বের করে বললো, লাত মানাত উয্যার কসম, এই কাগলাশটি আপনার নবুওয়াতের সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত আমি ইমান আনবো না। একথা বলে সে কাগলাশটিকে রসুলেপাক স. এর সামনে ছেড়ে দিলো।

রসুলেপাক স. বললেন, হে কাগলাশ! কাগলাশটি অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে বললো, লাব্বাইকা ওয়া সাদ্দাইক। আমি আপনার খেদমতে হাজির। এ কথা উপস্থিত সবাই শুনলো। রসুলেপাক স. আবার বললেন, হে কাগলাশ! কিয়ামত পর্যন্ত এ পৃথিবীতে কে কে আসবে? কাগলাশ জবাব দিলো, সমস্ত মাখলুকই আসবে।

নবী করীম স. আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার ইবাদত করো? কাগলাশ বললো, ওই আল্লাহ্‌তায়ালার, যার আরশ আকাশে এবং যার রাজত্ব যমীনে আর

যার প্রভাবপ্রতিপত্তি সমুদ্রে। জান্নাতে যার রহমত এবং জাহান্নামে যার আযাব রয়েছে। নবী করীম স. জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? কাগলাশ জবাব দিলো, আপনি আল্লাহ্র রসুল, সর্বশেষ নবী। নিঃসন্দেহে সেই কৃতকার্য, যে আপনাকে বিশ্বাস করলো আর ক্ষতিগ্রস্ত সেই যে আপনাকে অবিশ্বাস করলো। এ কথা শুনার পর বেদুইন লোকটি ইসলাম গ্রহণ করলো।

হরিণের কথা বলা

হরিণের কথা বলা সম্পর্কে বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনাসমূহ একে অপরকে দৃঢ়তা দিয়েছে। কাযী আয়ায র. আশশেফা কিতাবে এবং আবু নঈম র. দালায়েল কিতাবে হজরত উম্মে সুলায়েম থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা রসুলেপাক স. মরুভূমি অতিক্রম করছিলেন। অকস্মাৎ 'ইয়া রসুলাল্লাহ!' এরকম তিনটি আওয়াজ শোনা গেলো। রসুলেপাক স. সেই আওয়াজের দিকে অগ্রসর হলেন। দেখলেন, একটি হরিণী বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। কাছেই এক বেদুইন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তিনি হরিণীকে লক্ষ্য করে বললেন, বলো, কী প্রয়োজন তোমার?

হরিণীটি বললো, আমাকে এই লোকটি শিকার করে বেঁধে রেখেছে। আমার দু'টি বাচ্চা এই পাহাড়ের গর্তের ভিতর রয়েছে। আপনি যদি আমাকে মুক্ত করে দেন, তাহলে বাচ্চা দু'টিকে দুধ পান করিয়ে আবার আমি ফিরে আসবো।

তিনি বললেন, তুমি কি আবার ফিরে আসবে?

হরিণীটি বললো, ফিরে না এলে আল্লাহ্তায়ালা আমাকে যেনো ওই আযাব প্রদান করেন, যে আযাব তিনি যাকাত আত্মসাৎকারীর জন্য নির্ধারণ করেছেন।

রসুলেপাক স. তাকে মুক্ত করে দিলেন। সে চলে গেলো। অল্পক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলো। রসুলেপাক স. তাকে আগের মতো বেঁধে রাখলেন।

বেদুইন লোকটি জেগে উঠে বললো, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনার কি কোনো উদ্দেশ্য আছে?

তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করি, তুমি হরিণীটিকে মুক্তি দাও। লোকটি হরিণীটিকে ছেড়ে দিলো। সে মনের আনন্দে চক্কর দিয়ে দিয়ে দৌড়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেলো। যাওয়ার সময় হরিণীটি সাক্ষ্য দিচ্ছিলো, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্।

আরেকটি ঘটনা– নবী করীম স. এক সৈন্যবাহিনীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। সেনাদল ছিলো তৃষ্ণার্ত। এক সময় দেখা গেলো একটি জলাশয়। এমন সময় একটি হরিণী নবী করীম স. এর নিকটে এলো। তিনি হরিণীর দুধ দোহন করলেন এবং বাহিনীর সকল সৈন্যকে পান করিয়ে দিলেন। সৈন্যসংখ্যা ছিলো প্রায়

তিনশ’। নবী করীম স. তাঁর গোলাম হজরত রাফে রা.কে বললেন, তুমি হরিণীটির প্রতি লক্ষ্য রেখো। তিনি হরিনীটিকে বেঁধে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন, সে পালিয়ে গেছে। একথা শুনে রসুলেপাক স. বললেন, যিনি তাকে এনে দিয়েছিলেন, তিনিই তাকে নিয়ে গিয়েছেন।

গাধার কথা বলা

ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এর খয়বর বিজয়ের সময় এক গাধা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলো। রসুলেপাক স. গাধাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার নাম কী? গাধাটি উত্তরে বলেছিলো, আমার নাম এযীদ ইবনে শিহাব। আল্লাহ্তায়ালা আমার দাদার বংশ থেকে এমন ষাটটি গাধা সৃষ্টি করেছেন, যারা নবী ছাড়া অন্য কাউকে বহন করেনি। আমি রসুলেপাক স. এর সওয়ারী হওয়ার আশা পোষণ করি। আমার দাদার বংশ থেকে আমি ছাড়া কেউ জীবিত নেই। আর আপনি ছাড়া আর কোনো নবীও নেই। আসবেনও না। সে আরও বললো, আপনার কাছে আসার পূর্বে আমি এক ইহুদী লোকের অধীনে ছিলাম। লোকটি আমার পিঠে উঠতে চাইলে আমি ইচ্ছা করে লাফালাফি করে তাকে ফেলে দিতাম। আমার পিঠে তাকে উঠতেই দিতাম না। ইহুদী লোকটি রাগান্বিত হয়ে আমাকে অনাহারে রাখতো। একথা শুনে রসুলেপাক স. বললেন, এখন থেকে তোমার নাম হবে ইয়াগফুর। এই ইয়াগফুর নামক গাধাটি সর্বদাই রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির থাকতো। তিনি যখন কাউকে ডেকে আনার জন্য তাকে পাঠাতেন, সে তখন সেই লোকের বাড়ির দরজায় উপস্থিত হয়ে দরজায় মাথা ঠুকতে থাকতো।

বাড়ির মালিক এলে সে ইশারায় বুঝিয়ে দিতো রসুলেপাক স. তাকে তলব করেছেন। এভাবে ওই লোককে সে সঙ্গে করে আনতো। রসুলেপাক স. অন্তরাল গ্রহণ করার পর ইয়াগফুর গাধাটি তাঁর বিরহ ব্যথা সহ্য করতে না পেরে আবুস সাহাম ইবনে মেহান নামক এক ব্যক্তির কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলো।

বাঘের আনুগত্য

হজরত সুফায়না রা. একদিন পথ হারিয়ে আপন সৈন্যবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। পথ চলতে চলতে এক বাঘের সাথে দেখা। তিনি বাঘকে বললেন, আমি রসুলুল্লাহ স. এর এক নগণ্য গোলাম। আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। বাঘটি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে সৈন্যবাহিনীতে পৌঁছে দিয়েছিলো।

ইবনে ওহাব বর্ণনা করেন, মক্কাবিজয়ের দিন যে সকল কবুতর নবী করীম স. এর মাথার উপর ছায়া দান করেছিলো, তিনি তাদের জন্য বরকতের দোয়া করেছিলেন। হিজরতের সময় ছওর গুহাতে মাকড়শার জাল বানানো এবং

কবুতরের ডিম দেয়ার ঘটনাও মশহুর। উলামা কেরাম বলেন, ছওর গুহাতে যে কবুতরেরা ডিম দিয়েছিলো, হেরেম শরীফের কবুতরগুলো তাদেরই বংশধর। এক বর্ণনায় আছে, হিজরতের সময় একটি ছোট্ট গাছকে নবী করীম স. হুকুম করেছিলেন, তুমি মানুষের দেহের মতো বড় হয়ে গুহার মুখকে আচ্ছাদিত করে ফেলো।

কাযী আয়ায র. আশশেফা কিতাবে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রাণীর কথা বলা এবং নবী স. এর প্রতি তাদের আনুগত্য সংক্রান্ত অনেক হাদীছ বিদ্যমান। সেগুলোর মধ্যে যেগুলো বিখ্যাত এবং ইমামগণ যেগুলোকে তাঁদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন, আমিও সেইগুলোর উল্লেখ করলাম। ওয়াল্লাহুল মুওয়াফফেক– আল্লাহ্তায়ালাই তওফীক দাতা।

গাছপালার আনুগত্য

সমস্ত প্রাণীকুল যেমন নবী করীম স. এর অনুগত ও ফরমাবরদার ছিলো, তেমনি গাছপালা ও উদ্ভিদরাজিও নবী করীম স. এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলো।

গাছপালা নবী করীম স. এর সাথে কথা বলেছিলো, তাঁকে সালাম করেছিলো, তাঁর রেসালতের সাক্ষ্য দিয়েছিলো এবং তাঁর হুকুমও তামিল করেছিলো। উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর হাদীছে আছে, নবী করীম স. বলেছেন, আমার নিকট ওহী আসা শুরু হলে সমস্ত বৃক্ষরাজি ও প্রস্তরখণ্ড আমাকে বলতো আসসালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ।

হজরত আলী মুর্তজা রা. বলেন, একদা আমরা রসুল করীম স. এর সঙ্গে মক্কা মুকাররমার বিভিন্নস্থানে গিয়েছিলাম। তখন রাস্তার সমস্ত গাছপালা ও পাহাড় পর্বত বলেছিলো আসসালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ। এই হাদীছখানা ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। হাকিম র. তাঁর হাদীছগ্রন্থ মুস্তাদরেকে উত্তম সনদের মাধ্যমে হজরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণনা করছেন, আমরা একদা রসুল করীম স. এর সঙ্গে কোনো এক সফরে ছিলাম। এক বেদুইন আমাদের সামনে পড়লো। লোকটি নবী করীম স. এর নিকট এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছো? সে বললো, আমার পরিবার পরিজনের কাছে। তিনি বললেন, কোনো কল্যাণ কি তুমি কামনা করো? সে বললো, সেটা আবার কী? তিনি স. বললেন, 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই আর মোহাম্মদ তাঁর বান্দা এবং রসুল'– এই সাক্ষ্য প্রদান করা। সে বললো, আপনি যা বললেন তার সত্যতার সাক্ষী কে? তিনি স. বললেন, এই বৃক্ষটিই আমার সাক্ষী। রসুলেপাক স. এক প্রান্তে অবস্থিত গাছটিকে ডাক দিলেন। বৃক্ষটি তৎক্ষণাৎ মাটি চিরে চিরে দুই ভাগ করে দৌড়ে রসুলেপাক স. এর সামনে

উপস্থিত হলো। তারপর তিনি গাছের নিকট থেকে তিনবার সাক্ষ্যগ্রহণ করলেন। গাছটি আবার যথাস্থানে ফিরে গেলো। ইমাম দারেমীও এরকম একটি বিবরণ দিয়েছেন। উহুদ যুদ্ধের দিন দুরাচার কাফেরেরা নবী করীম স. এর চেহারা মোবারককে রক্তরঞ্জিত করেছিলো, তাঁর দাঁত মোবারকের ক্ষতি করেছিলো। ওই সময় রসুলেপাক স. ময়দানের এক কোণে অবস্থান করছিলেন।

জিব্‌রাইল আ. এসে তাঁর হালঅবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি নবী করীম স. কে চিন্তিত দেখে বললেন, আমি কি আপনাকে এমন একটি নিদর্শন দেখাবো, যাতে আপনি সান্ত্বনাবোধ করেন? তারপর জিব্‌রাইল আ. ওই গাছটির দিকে নযর করলেন, যা পাহাড়ের পিছনে ছিলো। তিনি বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনি গাছটিকে ডাক দিন। রসুলেপাক স. গাছটিকে ডাক দিলেন। গাছটি দৌড়ে এসে রসুলেপাক স. এর সামনে দাঁড়িয়ে গেলো।

জিব্‌রাইল আ. বললেন, এখন গাছটিকে স্বস্থানে ফিরে যেতে বলুন। তিনি স. হুকুম করলে গাছটি আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে গেলো। রসুলেপাক স. বললেন, হাসবী, হাসবী (হয়েছে- যথেষ্ট হয়েছে)। এই ঘটনাটি ইমাম দারেমী হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। হজরত বুরায়দা আসলামী রা. থেকে বর্ণিত আছে, এক বেদুইন একদিন নবী করীম স. এর কাছে মোজেজা দেখতে চাইলো। রসুলেপাক স. বেদুইনকে বললেন, ওই গাছটিকে যেয়ে বলো, আল্লাহ্‌র রসুল তোমাকে ডাকছেন। গাছটি তখন আগে পিছে একটু নড়া চড়া করে মাটি থেকে শিকড়গুলো বের করে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে রসুলেপাক স. এর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলো। বললো, আসসালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ!

বেদুইন বললো, এখন গাছকে স্বস্থানে ফিরে যেতে বলুন। তিনি হুকুম করলেন। আর অমনি গাছটি নিজের জায়গায় ফিরে গেলো। তার ছোটবড় সমস্ত শিকড় মাটির ভিতর প্রবেশ করলো এবং যমীন পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক হয়ে গেলো। বেদুইন নিবেদন করলো, আমাকে অনুমতি দিন, আপনাকে সেজদা করি।

রসুলেপাক স. অনুমতি দিলেন না। সে বললো, তাহলে আপনার হাত ও কদম মোবারক চুম্বন করার অনুমতি দিন। রসুল স. অনুমতি দিলেন।

বর্ণিত আছে, এক অন্ধকার রাতে নবী করীম স. উটের উপর সওয়ার হয়ে নিদ্রাবস্থায় কোনো এক স্থানে সফর করছিলেন। হঠাৎ সামনে পড়ে গেলো একটি কুলগাছ। সঙ্গে সঙ্গে কুলবৃক্ষটি দু'টুকরো হয়ে নবী করীম স. এর চলার পথকে বাধামুক্ত করে দিলো। সেই ঘটনার পর থেকে গাছটির নাম হয়ে গিয়েছিল সিদ্‌রাতুন্নবী।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, এক বেদুইন একদিন রসুলেপাক স.কে বললো, আমি কেমন করে জানবো যে, আপনিই আল্লাহ্‌র রসুল?

তিনি স. বললেন, আমি খেজুরের ডালকে ডাকছি, সেই এসে সাক্ষ্য দিবে। ডাক দিতেই সেই ডালটি গাছ থেকে ছিন্ন হয়ে পড়ে গেলো। রসুল স. ডালটিকে বললেন, স্বস্থানে চলে যাও। ডালটি উঠে পুনরায় গাছে জোড়া লেগে গেলো। ঘটনা দেখে বেদুইন ইসলাম কবুল করলো।

এই হাদীছখানা ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীছটি সহীহ্। হজরত জাবের রা. এর মাধ্যমে একখানা দীর্ঘ সহীহ্ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একদা আমরা এক উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁবু ফেলেছিলাম। রসুলেপাক স. প্রকৃতির ডাকে চলে গেলেন। আমিও তাঁর পিছে পিছে পানির পাত্র নিয়ে যেতে লাগলাম। কোথাও আড়াল নেই। হঠাৎ প্রান্তরের এক প্রান্তে একটি বৃক্ষ দেখা গেলো। রসুলেপাক স. সেই বৃক্ষটির দিকে চললেন। গাছের একটি ডাল ধরে বললেন, আল্লাহ্র হুকুমে আমার আনুগত্য করো। ডালটি রসুলেপাক স. এর এমন অনুগত হলো, উটের নাকে রশি লাগালে সে যেমন তার প্রভুর অনুগত হয়। তারপর সেই ডালটি গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরেকটি গাছের দিকে চলে গেলো। বর্ণনাকারী বলেন, সেই ডালগুলো পরস্পরে মিলিত হয়ে রসুলেপাক স. কে আড়াল করে ফেললো। অন্য আরেক বর্ণনা– রসুলেপাক স. বললেন, হে জাবের, গাছটিকে বলো, আল্লাহ্র রসুল বলছেন, তোমরা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাও, যাতে তিনি তোমাদের আড়ালে বসতে পারেন। তাই বললাম। গাছটি অন্য আরেকটি গাছের সঙ্গে মিলিত হলো। রসুলেপাক স. তার পিছনে বসলেন। আমি দূরে বসে দেখছিলাম এবং চিন্তা করছিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম, রসুলেপাক স. আসছেন। তারপর দেখলাম, গাছ দু'টি পৃথক হয়ে আপন আপন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো।

এই রকম বর্ণনা হজরত উসামা ইবনে যায়েদের হাদীছেও এসেছে। তিনি বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধে নবী করীম স. আমাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহ্র রসুলের প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণের জন্য উপযুক্ত কোনো জায়গা দেখতে পেয়েছো? আমি নিবেদন করলাম, এ প্রান্তরে নির্জন কোনো জায়গা দেখছি না। চারিদিকে শুধু খেজুর গাছ আর পাথর। তিনি বললেন, গাছগুলোকে বলো, রসুলুল্লাহ্র জন্য তারা যেনো পরস্পরে মিলিত হয়ে যায়। পাথরগুলোকেও একথা বলো। আমি নির্দেশ পালন করলাম। কসম ওই মহান জাত পাকের যিনি আল্লাহ্র রসুলকে সত্যের সঙ্গে প্রেরণ করেছেন, আমি দেখলাম, গাছগুলো একটি অপরটির কাছে এসে গেলো। আর পাথরগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলো। তারপর রসুলে করীম স. প্রয়োজনমুক্ত হলে বললেন, ওদেরকে একে অপর থেকে পৃথক হতে বলো।

এ ধরনের মোজেজা রয়েছে অনেক। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, লোকেরা রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলো, এমন কোন জিনিস আছে, যা

আপনার রেসালতের সাক্ষ্য প্রদান করে? তিনি বললেন, এ গাছটিই আমার রেসালতের সাক্ষ্য দেবে। তারপর গাছকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বৃক্ষ! কাছে এসো। সঙ্গে সঙ্গে গাছ এসে গেলো এবং সাক্ষ্য দিলো। কাযী আয়ায র. বললেন, সাহাবা কেরামের এক দল এবং বহুসংখ্যক তাবেয়ীন উক্ত মোজেজার ব্যাপারে একমত।

জড় পদার্থের আনুগত্য

জড় পদার্থসমূহও নবী করীম স. এর হুকুমের গোলাম ছিলো। তারাও রসুলেপাক স. এর দরবারে সালাম নিবেদন করেছে, কথা বলেছে, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম স. এর বাণী 'এমন কোনো গাছ ও পাথর নেই, যারা আমার উপর সালাম পেশ করেনি।' তারা সশব্দে বলেছে, আসসালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ্।

এ প্রসঙ্গে হাদীছ বর্ণনা করেছেন হজরত আলী রা, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এবং হজরত জাবের রা.। তাছাড়া নবুওয়াতের পূর্বে প্রথম জীবনে আবু তালেবকে সঙ্গে নিয়ে যখন তিনি স. সফরে বেরিয়েছিলেন, তখন সমস্ত গাছপালা ও পাথর তাঁকে সেজদা করেছিলো। এই হাদীছের বিস্তারিত বর্ণনা যথাস্থানে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে হজরত জাবের ইবনে সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে– নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আমি নিঃসন্দেহে ওই পাথরগুলোকে চিনি, নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে যারা মক্কা মুকাররমায় আমাকে সালাম জানাতো। এ নিয়ে অবশ্য মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সে পাথর হচ্ছে হাজারে আসওয়াদ।

কেউ কেউ আবার বলেন, হাজারে আসওয়াদ ছাড়া আরও কিছু পাথর আছে যা হজরত খাদীজাতুল কুবরা রা. এর বাড়ির দিকে যাওয়ার পথে দেয়ালে রক্ষিত আছে। মানুষে এগুলো স্পর্শ করে বরকত লাভ করে থাকে। এগুলোর নাম যেকাকুল হাজার। মানুষেরা বলে, পাথরগুলো রসুলেপাক স. এর আসা যাওয়ার সময় তাঁকে সালাম পেশ করতো। শায়েখ ইবনে হাজার মক্কী র. বলেন, মক্কাবাসীদের নিকট থেকে ব্যাপকভাবে বর্ণিত আছে, পাথরগুলো হচ্ছে যেকাকুল হাজার। এগুলোই রসুলেপাক স.কে সালাম পেশ করতো। তার বিপরীত দিকে অপর একটি দেয়াল রয়েছে, যেখানে রসুলেপাক স. এর কনুই মোবারকের দাগ রয়েছে। দেয়ালটি একটি পাথরেই তৈরী। উলামা কেরাম বলেন, আম্বিয়া কেরামের জন্য আল্লাহ্র কুদরতে লোহা এবং পাথর নরম করে দেয়া হয়েছিলো। মক্কা মুকাররমার ওই পাহাড় যেখানে রসুলেপাক স. বকরী চরাতেন, সেখানে তাঁর কদম মোবারকের দাগ আছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার আবু হাফস শিরাজী র. বলেছেন, আমি মক্কা মুকাররমার অলিতে গলিতে যতো লোকের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, সকলেই মত প্রকাশ করেছেন, যে পাথর রসুলেপাক স.কে সালাম পেশ করতো, সেগুলো ছিলো যেকাকুল হাজার।

নবী করীম স. যখন দোয়া করেছেন, তখন ঘরের সমস্ত দেয়াল ও খুঁটি দোয়ার সঙ্গে আমীন আমীন বলেছে। তিনি স. হজরত আব্বাস রা. ও তাঁর ফরজন্দগণের জন্য দোয়া করেছিলেন। এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাকী দালায়েল কিতাবে এবং ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন 'মাহযার' নামক কিতাবে। রসুলেপাক স. হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে বললেন, আগামীকাল আমার আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আপনি এবং আপনার সন্তানাদি কেউ যেনো ঘর থেকে বের না হন। আপনাদের সাথে আমার একটি বিশেষ কাজ আছে। আপনারা অবশ্যই অপেক্ষায় থাকবেন। রসুলেপাক স. চাশতের সময় তাঁদের গৃহে উপস্থিত হয়ে বললেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

তিনি স. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, সকাল কেমন কাটলো? তাঁরা বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্! ভালোভাবেই কেটেছে। তিনি বললেন, আপনারা বসুন। রসুলেপাক স. তাঁদের প্রতি তাওয়াজ্জুহ্ দিলেন এবং দোয়া করলেন, হে আমার রব! ইনি আমার চাচা, পিতৃতুল্য। হে আল্লাহ্! আপনি তাঁকে এবং তাঁর আহলে বাইতের সকলকে দোযখের আগুন থেকে এমনভাবে হেফাজত করুন, যেমন আমি তাদেরকে আমার চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করেছি। এরপর ঘরের সমস্ত দেয়াল ও খুঁটি সকলেই আমীন আমীন বলতে লাগলো।

একদা হজরত আকীল ইবনে আবীতালেব কোনো এক সফরে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। তখন রসুলেপাক স. তাঁকে এক পাহাড়ে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা পাহাড়কে বলো, পানি দাও। পাহাড় বললো, 'ওই আগুনকে ভয় করো, যে আগুনের ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর।' এই আয়াত যেদিন নাযিল হয়েছিলো, সেদিন থেকেই আমি আল্লাহ্র ভয়ে এতো বশী কেঁদেছি যে, এখন আর আমার চোখে পানি নেই।

হুনাইনে জিয্অ বা উস্তুনে হান্নানার রোদন

অভিধানে হুনাইন শব্দের অর্থ বাসনা প্রকাশ করা, রোদন করা এবং ওই উষ্ট্রীর আওয়াজ যার কাছ থেকে তার বাচ্চাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। জিয্অ শব্দের অর্থ গাছের ডাল। উস্তুনে হান্নানার হাদীছখানা সাহাবা কেরামের এক বিরাট গোষ্ঠী বর্ণনা করেছেন। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে হজরত তাজুদ্দীন সুবকী বলেছেন, শরহে মুখতাসার ইবনে হাজেব কিতাবে বলা হয়েছে, উস্তুনে

হান্নানার হাদীছখানা সর্বজনবিদিত। এটাই বিশুদ্ধ মত। এই হাদীছ বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছগ্রন্থে অসংখ্য ও অগণিত সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

হতে পারে এ হাদীছ কারও কারও কাছে মুতাওয়তির (সর্বজনবিদিত) নয়। শায়েখ ইবনে হাজার র. ফতহুলবারীতে বলেছেন, উস্তুনে হান্নানা এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার হাদীছ মশহুর। যারা হাদীছ-বিশেষজ্ঞ তাদের নিকট এ সকল বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ বটে। আর যারা হাদীছবিদ্যার সাথে সম্পর্ক রাখেন না, তাদের নিকট বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে নাও হতে পারে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ইমাম বায়হাকী র. বলেন, উস্তুনে হান্নানার ঘটনা একটি প্রকাশ্য ব্যাপার, যা সলফে সালেহীন পূর্ববর্তীগণ থেকে বড় বড় মোজেজার অন্যতম হিসেবে পেয়েছেন। এই ঘটনাটি নবী করীম স. এর নবুওয়াতের দলীলরূপে গৃহীত হয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমাদের নবী স. কে যা কিছু দান করা হয়েছে, এতোকিছু আল্লাহ্পাক অন্য কোনো নবীকে দান করেননি। তিনি আরও বলেছেন, হজরত ঈসা আ. কে আল্লাহ্তায়ালা মৃতকে জীবিত করার মোজেজা দান করেছেন, আর আমাদের নবী স. কে মৃতবৃক্ষ উস্তুনে হান্নানাকে জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় করে দেখাবার মোজেজা দান করেছেন। মৃত খেজুরবৃক্ষের ডাল জীবন্ত প্রাণীর মতো বিলাপ করে কেদেঁছে। তার বিলাপ ও রোদনের আওয়াজ সবাই শুনেছে। এটি তো মৃতকে জীবিত করার চেয়েও অধিকতর বিস্ময়কর। তারপর তিনি সাহাবীগণের সংখ্যা আলোচনা করেছেন, যারা উক্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তার সাথে সাথে তিনি উক্ত বিবরণসমূহের সূত্র এবং তরিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যার বর্ণনা অতিদীর্ঘ।

উস্তুনে হান্নানার ঘটনা

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. এর মসজিদ শরীফের ছাদ খেজুর গাছের কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়েছিলো। খেজুর গাছের একটি কাণ্ড যা খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো, মিম্বর শরীফ নির্মিত হওয়ার পূর্বে নবী করীম স. তার উপর হেলান দিয়ে খোতবা প্রদান করতেন। পরবর্তীতে খুঁটিটি সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হলে সে সজোরে ক্রন্দন করেছিলো। বাচ্চাওয়ালা উটনীর নিকট থেকে তার বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিলে সে যেমন করে কাঁদে, খুঁটিটি ঠিক তেমনি সশব্দে কেঁদেছিলো। হজরত আনাসের হাদীছে এসেছে, তার রোদনের আওয়াজে মসজিদ প্রকম্পিত হচ্ছিলো। কাষ্ঠখণ্ডের এরূপ বিলাপ দেখে উপস্থিত সকলেই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম স. এর বিচ্ছেদ-বিরহে কাষ্ঠখণ্ড ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিলো। রসুলেপাক স. তাঁর হাত মোবারক তার গায়ে বুলিয়ে দিলে সে শান্ত হয়েছিলো। নবী করীম স. তখন বললেন, কাঠের খুঁটিটি আল্লাহ্‌র জিকির করা থেকে দূরে সরে পড়েছে বলে ক্রন্দন করছে। আমি তার গায়ে হাত না বুলিয়ে দিলে আল্লাহ্‌র নবীর বিরহব্যথায় কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে কাঁদতেই থাকতো। নবী করীম স. কাষ্ঠখণ্ডটিকে মিম্বর শরীফের নীচে দাফন করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর রসুলেপাক স. সেদিকে লক্ষ্য করে নামাজ আদায় করতেন।

আরেক বিবরণে আছে, ক্রন্দন শোনার পর রসুলেপাক স. তাকে নিজের দিকে আহ্বান করলেন। আর অমনি সে মাটি চিরে দৌড়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলো। হজরত বুরায়দা রা. এর হাদীছে আছে, রসুলেপাক স. খেজুর গাছের কাণ্ডটিকে বললেন, বলো তুমি কোনটি চাও? যদি চাও, তবে তোমাকে সেই বাগানে পুনরায় লাগিয়ে দেয়া হবে, যে বাগানে তুমি ছিলে। তোমার রগরেশাগুলো পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে, তোমার ডালপালাকে সজীব করে দেয়া হবে এবং পুনরায় ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে যাবে তুমি। আর যদি তুমি চাও, তবে তোমাকে জান্নাতের বাগানে লাগিয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ্‌প্রেমিক বান্দারা জান্নাতে তোমার ফল ভক্ষণ করবে। তারপর রসুলেপাক স. তার কান মোবারক উস্তুনে হান্নানার নিকট নিয়ে গেলেন, সে কী বলে তা শোনার জন্য। এরপর বললেন, সে বলছে, ‘হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে জান্নাতেই লাগিয়ে দেয়া হোক, যাতে আমি আল্লাহ্‌র প্রেমিক বান্দাদেরকে আমার ফল ভক্ষণ করাতে পারি। সেখানে আমি কখনও বৃদ্ধ হবো না। ধ্বংসও হবো না।

রসুলেপাক স. বললেন, হাঁ, আমি তাই করবো। কেনোনা তুমি ধ্বংসশীলতার চেয়ে চিরন্তনতাকে পছন্দ করেছো।

হজরত হাসান বসরী র. এই হাদীছখানা বর্ণনাকালে বলতেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! একটি কাষ্ঠখণ্ড রসুলুল্লাহ স. এর ভালোবাসায় যদি এরূপ রোদন করতে পারে, তবে তোমরাতো তার চেয়ে বেশী হকদার যে, তোমরা রসুলেপাক স. এর দীদারের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকবে। এই হাদীছটি বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। তবে এখানে যতটুকু উল্লেখ করা হলো– তাই যথেষ্ট।

পাহাড়ের কথা বলা

হজরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে, একদা রসুলেপাক স. হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত ওছমানকে সঙ্গে নিয়ে উহুদ পাহাড়ে উঠেছিলেন। উহুদ মদিনা মনোয়ারার নিকটবর্তী একটি পাহাড়। উহুদ এমন একটি পাহাড় যে

আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরা তাকে ভালোবাসি। তিনজন উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলে সে কাঁপতে লাগলো। রসুলেপাক স. স্বীয় কদম মোবারক তার উপরে রেখে বললেন, হে উহুদ! স্থির থাকো। তোমার উপর এ মুহূর্তে একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং দুজন শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই।

হাদীছটি ইমাম আহমদ, বোখারী ও তিরমিযী আবু হাতেম থেকে বর্ণনা করেছেন। আরেকখানা হাদীছ হজরত ওছমান ইবনে আফফান যুন্নুরাইন রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম স. একদা মিনার বাশীর নামক পাহাড়ে উঠলেন। তখন রসুলেপাক স. এর সঙ্গে আবু বকর সিদ্দিক, ওমর ফারুক এবং আমি ছিলাম। পাহাড় কাঁপতে লাগলো। এমনকি তার টুকরোগুলো গর্তের ভিতরে গিয়ে পড়তে লাগলো। রসুলেপাক স. বললেন, হে বাশীর! তুমি আপন স্থানে স্থির থাকো। এ মুহূর্তে তোমার উপর নবী, সিদ্দিক আর দু'জন শহীদ ছাড়া আর কেউ নেই।

হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, বোখারী, আহমদ, তিরমিযি এবং আবু হাতেম।

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, একদা রসুলেপাক স. মক্কা-মুকাররমার হেরা পর্বতে আরোহণ করলেন। ওহী নাযিলের পূর্বে তিনি হেরা পর্বতে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। সেখানেই সর্বপ্রথম তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়েছিলো। ওই ঘটনার সময় রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ছিলেন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওছমান, হজরত আলী, হজরত তালহা এবং হজরত যুবায়ের রা.। হেরা পর্বত কেঁপে উঠলে তিনি বলেছিলেন, হে হেরা শান্ত থাকো। তোমার উপর এখন নবী, সিদ্দিক এবং কতিপয় শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই।

হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের হাদীছে হজরত আলীর কথা নেই। অন্য এক হাদীছে হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ছাড়া সমস্ত আশারা মুবাশশারার নাম রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, কুরাইশরা যখন নবী করীম স. কে খোঁজাখুঁজি করছিলো, তখন বাশীর নামক পাহাড় নবী করীম স. এর নিকট নিবেদন করেছিলো, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি অনুগ্রহ করে আমার উপর থেকে অবতরণ করুন। আমার ভয় হচ্ছে, দুশমনেরা যদি আপনাকে শহীদ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ্তায়ালা আমার উপর আযাব নাযেল করবেন।

তখন হেরা পর্বত বলেছিলো, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি আমার উপর তশরীফ নিয়ে আসুন। বাশীর আর হেরা মক্কা মুকাররমার সামনাসামনি দু'টি পাহাড়। উলামা কেরাম বলেন, হজরত মুসা আ. এর কাওমের লোকেরা যখন তাদের কলেমা পরিবর্তন করে ফেলেছিলো, তখন সেখানকার পাহাড় পর্বতও প্রকম্পিত হয়েছিলো। তবে বাশীর এবং হেরা পর্বতের কম্পন ওই পাহাড় পর্বতের কম্পনের

মতো ছিলো না। সেগুলো কেঁপেছিলো আল্লাহতায়ালার গজবের ভয়ে, আর বাশীর ও উহুদ কেঁপেছিলো আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের কারণে। এ ওসিলায় নবী করীম স. নবী, সিদ্দীক এবং শহীদের মাকাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

পাথর দানার তাসবীহ্ পাঠ

হজরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, একদা রসুলেপাক স. তাঁর মুঠির ভিতর কিছু পাথর দানা নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো তাঁর হাতের ভিতর থেকে তসবীহ্ পাঠ করা শুরু করলো। তসবীহ্ পাঠের আওয়াজ আমরাও শুনতে পেলাম। তিনি পাথরগুলো হজরত আবু বকর সিদ্দিকের হাতে দিলেন। তখনও তসবীহ্র পাঠ চলছিলো। এরপর ওগুলো যখন আমার হাতে নিলাম, তখন তসবীহ্ পাঠ বন্ধ হয়ে গেলো। আশশেফা কিতাবে এ ধরনের হাদীছ হজরত আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, হজরত ওমর ও হজরত ওছমানের হাতে যাওয়ার পরও পাথরগুলো তসবীহ্ পাঠ করেছিলো।

উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে এভাবে প্রদান করা হয়েছে– ওলীদ ইবনে সুওয়ায়দ বর্ণনা করেন, বনী সালেম গোত্রের এক বৃদ্ধ হজরত আবু যর রা. এর ঘরে এলেন। তিনি হজরত আবু যর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন– তিনি বলেন, আমি দুপুরবেলা রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হলাম। তখন তাঁর নিকট আর কেউ ছিলেন না। আমি দেখলাম, রসুল স. এর উপর ওহীর হাল জারি হচ্ছে। আমি সালাম প্রদান করলাম। রসুলেপাক স. সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, হে আবু যর! কী প্রয়োজনে তুমি এখানে এসেছো?

আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই তো ভালো জানেন। তিনি বললেন, বসো! আমি তাঁর পাশে বসে পড়লাম। এরপর আমি কিছু জিজ্ঞেস করলাম না, তিনি স.ও আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। নীরবতা বিরাজ করছিলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এলেন। তিনিও সালাম পেশ করলেন। রসুলেপাক স. সালামের জবাব দিয়ে বললেন, কী প্রয়োজনে এসেছো? হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বললেন, আমাকে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসুল নিয়ে এসেছেন। রসুলেপাক স. তাঁকে হাতের ইশারায় বসে যেতে বললেন। তিনি রসুলেপাক স. এর সামনাসামনি বসে পড়লেন। এবার এলেন হজরত ওমর রা.। তাঁর সঙ্গেও এধরনের কথোপকথন হলো। তিনি হজরত আবু বকর রা. এর পাশে বসে পড়লেন। এরপর এলেন হজরত ওছমান রা.। তিনি হজরত ওমর রা. এর পাশে বসে পড়লেন। এরপর রসুলেপাক স. পাথরের সাত কি নয়টি টুকরা অথবা এর কমবেশী হতে পারে, স্বীয় হাত মোবারকের ভিতর তুলে নিলেন। তখন পাথরের টুকরোগুলো হাতের ভিতর থেকে এতো জোরে তসবীহ্ পাঠ করতে লাগলো যে, আমরা

মৌমাছির গুঞ্জনের মতো তাদের আওয়াজ শুনতে পেলাম। এরপর রসুলেপাক স. পাথরদানাগুলো হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর হাতে দিলেন– আমার হাতে দিলেন না– সেগুলো হজরত আবু বকর সিদ্দীকের হাতের ভিতরও তসবীহ্ পাঠ করছিলো। এরপর যখন সেগুলোকে হজরত আবু বকরের হাত থেকে নিয়ে মাটিতে রেখে দিলেন, তখন তাদের তসবীহ্ পাঠ বন্ধ হয়ে গেলো। এরপর হজরত ওমরের হাতে পাথরগুলো দেয়া হলো। তখন সেগুলো ওরকম তসবীহ্ পাঠ করতে লাগলো হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর হাতের ভিতর যেরকম করেছিলো। তারপর হজরত ওছমান রা. এর হাতে দেয়া হলে তারা পূর্বের মতো তসবীহ্ পাঠ করতে লাগলো। যখন মাটিতে রাখা হলো, তখন চুপ হয়ে গেলো। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বাযযার র.। তিবরানী র. করেছেন আওসাত কিতাবে। ইমাম বায়হাকী যুহরী র. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিবরানীর বিবরণে আছে, আবু যর রা. বলেছেন, পাথরগুলো আমার হাতে দেওয়া হলে তসবীহ্ পাঠ আর শোনা গেলো না। এরকম বর্ণনা মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়াতেও রয়েছে। রওজাতুল আহবাব কিতাবে আবু শাকুর সালমী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, হজরত আলী মুর্তজা রা.ও সেই মজলিশে উপস্থিত ছিলেন এবং তার হাতেও পাথরগুলো তসবীহ্ পাঠ করেছিলো।

খাদ্যদ্রব্যের তসবীহ্ পাঠ

বোখারী শরীফে হজরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে– একবার আমরা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে খানা খাচ্ছিলাম। খানা থেকে তসবীহ্ পাঠের আওয়াজ বেরোচ্ছিলো, আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। ইমাম জাফর ইবনে মোহাম্মদ বাকের র. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম স. একদা অসুস্থ হয়ে পড়লে হজরত জিব্রাইল আ. একটি পাত্রভর্তি আঙ্গুর ও আনার নিয়ে এলেন। রসুলেপাক স. যখন ফলগুলো মুখে তুলছিলেন, তখন তারা তসবীহ্ পাঠ করতে লাগলো। হজরত ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন, একদিন রসুলেপাক স. মিম্বরের উপরে বসে 'তারা আল্লাহ্তায়ালার কুদরতকে তাঁর শান মুতাবেক জানতে পারেনি' এই আয়াতখানা পাঠ করলেন। তারপর বললেন, জাব্বার ও কাহহার আল্লাহ্তায়ালা আপন শান সম্পর্কে বলেন আমি পরাক্রমশালী, আমি শ্রেষ্ঠ, অতি উন্নত। তখন মিম্বর শরীফ এমনভাবে কাঁপতে লাগলো যে, আমরা আশংকা করছিলাম, না জানি রসুলেপাক স. পড়ে যান। হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে– খানায়ে কাবাতে তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিলো, যেগুলো শীশা দিয়ে পাথরের উপর বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। মক্কাবিজয়ের দিন রসুলেপাক স. যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করছিলেন, তখন তাঁর হাতে ছিলো লাঠি। তিনি লাঠিখানা সেই মূর্তিগুলোর গায়ে লাগাচ্ছিলেন আর

বলছিলেন 'যায়াল হাক্ক ওয়া জাহাকাল বাতিল।' লাঠি দ্বারা পুরাপুরি ইশারাও করা হয়নি, তবু মূর্তিগুলো মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলো। তাঁর দস্ত মোবারকের তেজস্বীতা ও ক্ষমতার কাছে তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিলো।

দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা বলা এবং সাক্ষ্য প্রদান

হজরত মুআইকাব ইয়ামানী রা. থেকে বর্ণিত আছে– আমি বিদায় হজের সময় উপস্থিত ছিলাম। সেখান থেকে যখন আমার ঘরে পৌঁছলাম, তখন নবী করীম স. কে আমার ঘরে উপস্থিত দেখতে পেলাম। সেখানে এক বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হলো। এক ইয়ামানী ব্যক্তি একটি সদ্যপ্রসূত সন্তান কোলে করে নবী করীম স. এর কাছে নিয়ে এলো। নবী করীম স. বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কে!" বাচ্চাটি উত্তরে বললো, 'আপনি মোহাম্মদ, আল্লাহ্র রসুল।' নবী করীম স. বললেন 'তুমি সত্য বলেছো, আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে বরকত দান করুন।' বাচ্চাটি কথা শেষ করতে না করতেই যুবক হয়ে গেলো। আমরা তার নাম রেখেছিলাম মোবারকু ইয়াসামা। হজরত ফাহাদ ইবনে উতাইয়া থেকে বর্ণিত আছে– একদা রসুলেপাক স. এর কাছে এমন একটি শিশুকে নিয়ে আসা হলো, যে কথা বলতে পারে না। রসুলেপাক স. শিশুটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কে?' তৎক্ষণাৎ তার মুখে ভাষা ফুটলো, আপনি আল্লাহ্র রসুল। এই হাদীছ ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

রোগীদেরকে সুস্থ করা

হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম স. এর কাছে এক মহিলা তার সন্তানকে নিয়ে এলো। নিবেদন করলো, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার এ সন্তানটি উন্মাদ, সে আমাদেরকে যন্ত্রণা দেয়। সকাল সন্ধ্যায় আমার সময় নষ্ট করে। একথা শুনে রসুলেপাক স. বাচ্চাটির বুকের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। সে বমি করে দিলো। তার পেট থেকে একটি কালো রঙের কীট বের হয়ে হাঁটতে লাগলো। হাদীছখানা দারেমী বর্ণনা করেছেন।

বনী খাছআম গোত্রের এক মহিলা তার বাচ্চাকে রসুলেপাক স. এর নিকট নিয়ে এলো। বাচ্চাটি ছিলো বোবা। রসুলেপাক স. পানি চাইলেন এবং তার মধ্যে কুলি করলেন এবং দুখানা হাত ধৌত করলেন। তারপর সে পানি বাচ্চাটিকে পান করিয়ে দিলেন। সাথে সাথেই বাচ্চাটির ভাষা ফুটলো এবং সে সম্পূর্ণ সুস্থ ও জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে গেলো।

হজরত কাতাদা ইবনে নোমান রা. এর চোখে উহুদের যুদ্ধের দিন আঘাত লেগেছিলো। চোখের মণি বের হয়ে গাল পর্যন্ত নেমে এসেছিলো। তিনি নিবেদন

করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার স্ত্রীকে আমি খুব ভালোবাসি। আমার চোখের এরূপ যখম নিয়ে তার নিকট যেতে আমি অস্বস্তিবোধ করছি। রসুলেপাক স. তাঁর চোখের মণিটি হাত দিয়ে ধরে কোটরে বসিয়ে দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! চোখটি ভালো করে দাও। তাঁর চোখটি অপর চোখের চেয়ে অধিকতর সুন্দর ও উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন হয়েছিলো। কখনো অপর চোখে যন্ত্রণা হলেও এই চোখটি সবসময় সুস্থ থাকতো। হজরত কাতাদা ইবনে নুমান রা. এর জনৈক সন্তান থেকে বর্ণিত হয়েছে– তিনি একদিন ওমর ইবনে আবদুল আযীয র. এর নিকট এসেছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?' উত্তরে তিনি এই শেরখানা পাঠ করেছিলেন যার অর্থ– আমার পিতা ওই ব্যক্তি, যিনি মুস্তফা স. এর কাছে তাঁর চোখের অসুবিধা দূর করে দেয়ার আবেদন করেছিলেন। নবী মুস্তফা স. এর পবিত্র হাতের মাধ্যমে তাঁর চোখ স্বস্থানে ফিরে এসেছিলো। কতইনা সুন্দর হয়েছিলো তাঁর চোখ, আর চোখকে স্পর্শকারী হাতও কতো যে সুন্দর।

ওমর ইবনে আবদুল আযীয তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন এবং সম্মান জ্ঞাপন করেছিলেন। তিবরানী ও আবু নাঈম হজরত কাতাদা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি আমার শরীর দিয়ে রসুলেপাক স. এর দিকে নিক্ষিপ্ত বৃষ্টির মতো তীরগুলো প্রতিহত করছিলাম। হঠাৎ একটি তীর এসে আমার চোখে লাগলো, ফলে কোটর থেকে চোখের মণি বের হয়ে এলো। বেরিয়ে আসা চোখটিকে হাত দিয়ে ধরে রসুলেপাক স. কে দেখার চেষ্টা করছিলাম। আমার অবস্থা দেখে রসুলেপাক স. এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি দোয়া করলেন, বারেগাহে এলাহী! সে আপন চেহারা দিয়ে আপনার নবীকে রক্ষা করেছে এবং যখম হয়েছে। আপনি তার চোখকে এমন ভালো করে দিন, যাতে তার এই চোখ অপর চোখ থেকেও উত্তম হয়ে যায়।

অপর এক বর্ণনায় আছে, এস্তেসকার এক রোগী তার রোগমুক্তির আবেদন করে কোনো একজনকে রসুলেপাক স. এর নিকট প্রেরণ করলো। রসুলেপাক স. এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে তার মধ্যে মুখের লালা দিয়ে লোকটির হাতে দিলেন। লোকটি তাজ্জব হয়ে গেলো। ভাবলো, নবী করীম স. হয়তো তার সঙ্গে কৌতুক করছেন। যা হোক, মাটি নিয়ে লোকটি রোগী ব্যক্তির কাছে হাজির হলো। রোগী তখন মরণাপন্ন। লোকটি তার জিহবায় মাটি লাগিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হয়ে গেলো।

আরেক লোকের দু'টি চোখই নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। কিছুই দেখতে পেতো না সে। রসুলেপাক স. তার চোখে দম করে দিলেন। তারপর থেকে তার চোখ এমন ভালো হয়ে গেলো যে, আশি বৎসর বয়সেও তিনি সুই এর মধ্যে সুতা লাগাতে পারতেন। এ ধরনের অসংখ্য মোজেজা রয়েছে।

খয়বরের যুদ্ধে রসুলেপাক স. জিজ্ঞেস করলেন, 'আলী মুর্তজা কোথায়?' সাহাবীগণ বললেন, তাঁর চোখ উঠেছে। রসুলেপাক স. তাকে ডেকে আনলেন। হজরত আলী রা. এর মাথা কোলে নিয়ে দুচোখে পবিত্র মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যেনো তাঁর চোখে কোনো অসুখই হয়নি। এরপর হজরত আলী রা. এর জীবনে আর কখনও চক্ষু ওঠার রোগ হয়নি।

খয়বরের যুদ্ধের দিন হজরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. এর পায়ের গোছা ভেঙে গিয়েছিলো। নবী করীম স. তিন বার দম করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো। পরবর্তী জীবনে তাঁর পায়ে আর কোনো ব্যথা অনুভূত হয়নি। সেদিন হজরত যায়েদ ইবনে মুআয রা. এর পায়ে তলোয়ারের আঘাত লেগে যখম হয়ে গিয়েছিলো। তিনি যখন কাআব ইবনে আশরাফকে কতল করলেন, তখন নবী করীম স. তাঁর পায়ের যখমে থুতু লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পা ভালো হয়ে গেলো।

সহীহ্ বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে– হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উতায়ক রা. যখন আবু রাফে ইহুদীকে কতল করলেন, তখন ছিলো জোৎস্নাময়ী রজনী। তিনি সিঁড়ির উপর পা রাখতে যেয়ে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলেন, ফলে পায়ের গোছা ভেঙে গেলো। তিনি রসুলেপাক স. এর শরণাপন্ন হলেন। রসুলেপাক তাঁর পায়ের গোছার উপর হাত বুলিয়ে দিতেই পা ঠিক হয়ে গেলো। হাদীছগ্রন্থসমূহে এরকম অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মৃতকে জীবিত করা

ইমাম বায়হাকী 'দালায়েল' কিতাবে লিখেছেন, রসুলেপাক স. এক ব্যক্তিকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। লোকটি বললো, আমি ইমান আনবো না যদি না আমার মৃত কন্যাটিকে আপনি জীবিত করে দেন। রসুলেপাক স. বললেন, তার কবরটি দেখিয়ে দাও। লোকটি তার মৃত কন্যার কবরের কাছে নবী করীম স. কে নিয়ে গেলো। অন্য বর্ণনায় আছে, লোকটি বলেছিলো, আমি কন্যাটিকে মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়েছি। রসুলেপাক স. বললেন, মরুভূমিটি দেখিয়ে দাও। অতঃপর রসুলেপাক স. সেখানে উপস্থিত হয়ে কন্যাটিকে তার নাম ধরে ডাক দিলেন। কন্যাটি জওয়াব দিলো, লাব্বাইকা ও সাদাইক। রসুলেপাক স. মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে আসতে চাও? মেয়েটি জওয়াব দিলো, ইয়া রসুলাল্লাহ! আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। অন্য বর্ণনায় আছে, নবী করীম স. বললেন, তোমার মা বাবা ইমান এনেছে। তুমি যদি দুনিয়াতে আসতে চাও,

তাহলে তোমাকে ফিরিয়ে আনি। মেয়েটি বললো, আমার মা বাবার প্রয়োজন নেই। আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ তাদের চেয়ে অধিকতর অনুগ্রহশীল ও উত্তম। এই হাদীছ থেকে বুঝা যায়, কাফেরের সন্তান বুদ্ধিজ্ঞান হওয়ার পূর্বে মারা গেলে আযাব হবে না।

হজরত জাবের রা. এর সন্তানদেরকে জীবিত করার ঘটনাও রয়েছে। রসুলেপাক স. যখন তাঁর ঘরে মেহমান হয়েছিলেন, তখন মেহমানদারীর জন্য তিনি একটি বকরী জবেহ করেছিলেন। বকরী জবেহ করার দৃশ্যটি দেখে তাঁর সন্তান দুটির মনে কৌতূহল হলো। বকরীটি জবেহ করার অনুকরণে বড় ছেলেটি তার ছোট ভাইটিকে শুইয়ে দিলো এবং তার গলায় ছুরি চালিয়ে দিলো। তাদের মা এ দৃশ্য দেখে দৌড়ে আসছিলেন। রক্তাক্ত ছোট ভাইকে দেখে বড় ছেলেটি ভয় পেয়ে বাড়ির উপর তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করলো। রসুলেপাক স. হজরত জাবেরের উভয় সন্তানকেই জীবিত করে দিয়েছিলেন। শাওয়াহেদুন্নবুওয়াত গ্রন্থে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। নবী করীম স. তাঁর পিতা মাতাকেও জীবিত করেছিলেন এবং তাঁরা ইমানও এনেছিলেন। হাদীছ শরীফে তার বর্ণনা রয়েছে। তবে হাদীছের এই বর্ণনা সম্পর্কে মোহাদ্দেছগণের কেউ কেউ আপত্তি তুলেছেন। আবার কেউ কেউ উক্ত হাদীছকে সহীহ্ হাদীছের স্তরে সাব্যস্ত করেছেন।

হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, এক আনসারী যুবকের মৃত্যু হলো। যুবকটির বৃদ্ধা অন্ধ মাতা তখনো বেঁচে ছিলো। লোকেরা মৃত যুবকটিকে কাফন পরিয়ে তাঁর মাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। জননী জিজ্ঞেস করলো, আমার ছেলে কি মরে গেছে? লোকেরা বললো, হাঁ। মহিলা বলতে লাগলো, হে আমার আল্লাহ্! তোমার তো ভালোভাবেই জানা আছে, আমি তোমার এবং তোমার নবীর উপর এই আশা করে হিজরত করেছিলাম যে, তুমি আমাকে সাহায্য করবে। বিপদাপদে তুমি আমার প্রার্থনা কবুল করবে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে কঠিন বিপদে ফেলো না। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তখনও সরে আসিনি এর মধ্যেই সে জীবিত হয়ে গেলো এবং আমাদের সঙ্গে আহার করলো। হাদীছখানা বর্ণনা করেছেন ইবনে আদ্দী, ইবনে আবিদ্ দুনইয়া, বায়হাকী ও আবু নাঈম।

বৃদ্ধার পুত্র সন্তানের জীবিত হয়ে যাওয়াটা রসুলেপাক স. এর নিকট ফরিয়াদ করার বরকতেই হয়েছিলো। এরকম এক হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবনে যেহাক হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রা.। তিনি বলেন, এক আনসারী লোকের মৃত্যু হলো। লোকেরা যখন তাকে কাফন পরাতে যাচ্ছিলো, তখন সে বলে উঠলো, মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায় হজরত নোমান ইবনে বশীর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হজরত যায়েদ ইবনে খারেজা আনসারদের নেতা ছিলেন। একদা তিনি মদীনা মুনাওয়ারার পথে হাঁটতে হাঁটতে যোহর ও আসর নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে হঠাৎ করে রাস্তার উপর অধোবদন হয়ে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হলো। আনসার নারীপুরুষেরা কান্নাকাটি শুরু করে দিলো। এ অবস্থা চললো মাগরিব পর্যন্ত। মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে একটি আওয়াজ শোনা গেলো 'তোমরা চুপ করো' তারপর যখন গভীর মনযোগের সাথে সবাই শুনতে চেষ্টা করলো, তখন শোনা গেলো, যে চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে রাখা হয়েছিলো, সেই চাদরের ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে–

'মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল, উম্মী নবী, শেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না। একথা পূর্ববর্তী কিতাবে ছিলো। একথা সত্য। সত্য কথা বলেছেন এই রসুল। হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার উপর সালাম, আল্লাহ্‌র রহমত এবং বরকত বর্ষিত হোক।'– হাদীছখানা আবু বকর ইবনে আবিদ্ দুনইয়া লিখেছেন 'মানআশা বাদাল মাওত' পুস্তকে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়দুল্লাহ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত আছে, হজরত ছাবেত ইবনে কায়স ইবনে শামাস রা. কে যাঁরা দাফন করেছিলেন, আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। তাঁকে যখন কবরে নামানো হলো, তখন তাঁকে স্পষ্ট বলতে শুনেছি, 'মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ- আবু বকর আস্‌সিদ্দীক, ওমর আশ শহীদ। ওছমান ইবনে আফ্‌ফান আল বার আর রহীম।'

কথাগুলো শোনার পর আমি ভালো করে তাঁকে দেখলাম। দেখলাম, তিনি মৃতই। আশশেফা বইতেও এরকম লেখা আছে। এ ক্ষেত্রে যদি কেই সন্দেহ পোষণ করে যে, এমনও হতে পারে, যাঁদেরকে মৃত বলা হয়েছে, তাঁরা জীবিত ছিলেন, অথবা এ জাতীয় কোনো ঘটনা রসুলেপাক স. এর মাধ্যমে ঘটেনি যাকে মোজেজা হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

জবাব এই যে, মৃত্যু এমন ব্যাপার নয়, যাকে গোপন রাখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ রসুলেপাক স. এর পবিত্র নাম আলোচনা করা এবং তাঁর প্রশংসায় কিছু বলার উদ্দেশ্য এটাই যে, এসব কিছু তাঁরই বরকত ও মর্যাদারই পরিণতি। এগুলো যদি তাদের কারামতও ধরা হয়, তবুও স্বীকার করতে হবে যে, এসব মূলে নবী করীম স. এর মোজেজা।

আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের রা. একদিন একটি বকরী যবেহ করে তার গোশত রান্না করে নিয়ে নবী করীম স.এর খেদমতে হাজির হলেন। উপস্থিত লোকেরা তা ভক্ষণ করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, গোশত খাও, কিন্তু হাড়গুলো ভেঙো না। খাওয়া শেষে নবী করীম স. হাড়গুলো একত্রিত করে তার উপর পবিত্র হাত রাখলেন এবং কিছু পাঠ করলেন। দেখতে দেখতে বকরীটি জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেলো এবং কান নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

এরকম কামেল মোকাম্মেল আউলিয়া কেরামও আছেন, যাঁরা আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরতের প্রকাশস্থল হতে পেরেছেন। তাঁরা নবী করীম স. এর পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর প্রতিবিম্ব হয়ে কারামত প্রদর্শন করেছেন। এরকম একজন বুযুর্গের ঘটনা— একটি মোরগ জবাই করে তার গোশত খাবার পর হাড়গুলো একত্রিত করে তার উপর হাত রেখে আল্লাহ্‌তায়ালা এবং তাঁর রসুল স. এর নাম নিলেন তিনি। অমনি মোরগ জীবিত হয়ে ডাক দিয়ে উঠলো। এটাও মূলে নবী করীম স. এর মোজেজা।

খয়বরের যুদ্ধের সময় যে বকরীর গোশতে বিষ মিশ্রিত করে নবী করীম স. কে খেতে দেয়া হয়েছিলো, সেই জবেহকৃত বকরীও নবী করীম স. এর সঙ্গে কথা বলেছিলো। কোনো কোনো আলেম এটাকেও মৃতকে জীবিত করার মধ্যে গণ্য করে থাকেন। বকরীর জীবিত হয়ে কথা বলা সম্পর্কে অবশ্য কেউ কেউ এরূপ মত পোষণ করে থাকেন যে, পাথর ও গাছপালা থেকে আল্লাহ্‌তায়ালা যেরকম শব্দ ও বাক্য বের করেছেন, জবেহকৃত বকরী থেকেও আল্লাহ্‌তায়ালা এরকম আওয়াজ বের করতেই পারেন।

এরূপ ক্ষেত্রে কোনো বস্তুর বাহ্যিক আকৃতি পরিবর্তন না করেও তা থেকে আওয়াজ পয়দা করা সম্ভব। শায়েখ আবুল হাসান ও কাযী আবু বকর বাকেশানীর মত এরকম। আবার কেউ কেউ মনে করেন, হায়াত সৃষ্টির মতো প্রথমে এগুলোকে আল্লাহ্‌তায়ালা সৃষ্টি করেন, তারপর তার মধ্যে বাকশক্তি প্রদান করেন। আল্লাহ্‌পাকই ভালো জানেন।

দোয়া কবুল হওয়া

আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে নবী করীম স. এর দোয়া কবুল হওয়াও এক প্রকারের মোজেজা। এ প্রসঙ্গে আশশেফাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নবী করীম স. এর দোয়া মঙ্গলের জন্য হোক অথবা অমঙ্গলের জন্য সবই আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে গৃহীত হয়েছে। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, যা অর্থের দিক দিয়ে মুতাওয়াতিরের মর্যাদা রাখে।

হজরত হুযায়ফা রা. বলেছেন, নবী করীম স. কখনও কারও জন্য দোয়া করলে সে দোয়ার প্রতিক্রিয়া তার পুত্র, নাতী ও পুতি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতো। হজরত আনাস রা. এর জন্য নবী করীম স. যে দোয়া করেছিলেন, সেই দোয়াটি সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি পুরো দশ বছর নবী করীম স. এর খেদমত করেছেন। তিনি স. তাঁর জন্য দোয়া করেছেন। ফলে জাহেরী ও বাতেনী বিভিন্ন প্রকারের নেয়ামত ও সম্মানে ধন্য হয়েছেন তিনি। তাঁকে তাঁর মাতা রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির করে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার খাদেম আমার সন্ত

ান আনাস আপনার খেদমতে হাজির হয়েছে। দ্বীনি ব্যাপারে আম খাস সকলের জন্যই আপনি দোয়া করে থাকেন। আনাসের জন্য খাস দোয়া করবেন, যাতে সে দুনিয়াবী স্বাচ্ছন্দ্যও হাসিল করতে পারে। রসুলেপাক স. তাঁর জন্য দোয়া করলেন। বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি তার মাল ও আওলাদের মধ্যে বরকত প্রদান করো। আর যে সব নেয়ামত তুমি তাকে দান করেছো তার মধ্যে আরও বেশী বরকত দান করো।

হজরত ইকরামা রা. বলেছেন, হজরত আনাস রা. বলতেন, আল্লাহ্র কসম! আমার মাল অধিক হয়েছে। আমার আওলাদের সংখ্যা একশ'র উপরে। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, আমার মতো এরকম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পৃথিবীতে কেউ লাভ করতে পেরেছে কিনা জানি না। আমি স্বহস্তে আমার একশত সন্তানের লাশ কবরে শুইয়ে দিয়েছি। আর গর্ভ নষ্ট হওয়া অন্যান্য সন্তানদের তো হিসেবই নেই। এক বর্ণনায় আছে, তাঁর বাগানের খেজুর বৎসরে দুবার ফলতো। নবী করীম স. হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর জন্যও বরকতের দোয়া করেছিলেন। তিনি বলেছেন, রসুলেপাক স. দোয়া করার পর আমি যদি কোনো পাথর ওঠানোর ইচ্ছা করতাম, তখন এই বিশ্বাস করতাম যে, তার নীচে সোনা লুকিয়ে রয়েছে। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের জন্য রিযিকের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিলো। তিনি যখন হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় যান, তখন একেবারেই দরিদ্র ছিলেন। ধনদৌলত বলতে কিছুই ছিলো না। কিন্তু তাঁর ইনতেকালের পর দেখা গেলো, রেখে যাওয়া সম্পত্তির মধ্যে স্বর্ণের বড় বড় টুকরা রয়েছে, যা ছেনি দিয়ে কাটতে হয়েছিলো। তাঁর স্ত্রী ছিলেন চারজন। প্রত্যেকে ভাগে পেয়েছিলেন আশি হাজার স্বর্ণমুদ্রা। এক বর্ণনায় আছে, প্রত্যেকে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিলেন। অপর এক বিবরণে আছে, তাঁর তালাকপ্রাপ্তা বিবির জন্য আশি হাজারের বেশি স্বর্ণমুদ্রা দেয়া হবে বলে সাব্যস্ত হয়েছিলো। তিনি দুই হাতে দান করেছেন। এছাড়া পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দানের ব্যাপারে ওসিয়তও করে গিয়েছিলেন। তিনি দৈনিক তিরিশজন করে গোলাম আযাদ করতেন। একসময় তিনি পুরো একটা উটের কাফেলাই দান করে দিয়েছিলেন। কাফেলায় সাতশ উট ছিলো। উটগুলোতে বিভিন্ন প্রকারের মাল আসবাব ভর্তি করে দিয়ে তারপর সেগুলো দান করেছিলেন।

তাঁর এই বিরাট ধরনের দানের কারণ ছিলো এই— হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. একদিন বলেছিলেন, নবী করীম স. বলেছেন, আমি দেখেছি আবদুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতের একটি মহল খরীদ করে নিয়েছে। এই শুভ সংবাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তিনি এতো দান করতেন।

নবী করীম স. হজরত আমীর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. এর জন্য দীর্ঘ রাজত্বের দোয়া করেছিলেন। তাই হয়েছিলো। সুদীর্ঘ হুকুমত পেয়েছিলেন তিনি। নবী করীম স. তাঁকে বলেছিলেন, হে মুয়াবিয়া! তুমি যখন রাজত্ব পাবে, তখন তোমার স্বভাব ও আচরণকে নম্রতামণ্ডিত করো।

হজরত মুআবিয়া রা. বলেন, যেদিন রসুলেপাক স. আমার ব্যাপারে এ মন্তব্য করেছিলেন, সেদিন থেকে আমার মনে রাজ্যশাসনের বাসনা জন্মেছিলো।

হজরত সায়াদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. এর ব্যাপারেও তিনি স. দোয়া করেছিলেন। হকতায়ালা তা কবুলও করেছিলেন। তিনি কারও জন্য দোয়ায়ে খায়ের করলে তা কবুল হয়ে যেতো। তাঁর দোয়াকে এমন তীরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে দোয়া করেছিলেন, যেনো হজরত ওমর অথবা আবু জাহেলকে ইসলামের খাদেম বানিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত ওমর রা. কে কবুল করেছিলেন। হজরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, হজরত ওমর ফারুক রা. এর ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই প্রতিনিয়ত ইসলামের মহিমা ও বিজয় অর্জিত হচ্ছিলো।

এক যুদ্ধে সাহাবীগণ নবী করীম স. এর সঙ্গে ছিলেন। পিপাসায় সকলেই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় হজরত ওমর রা. নবী করীম স. এর নিকট দোয়ার জন্য নিবেদন করলেন। নবী করীম স. দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষণ শুরু হলো। এসতেস্কার ক্ষেত্রে বৃষ্টি হওয়ার ঘটনা নবী করীম স. এর পবিত্র জীবদ্দশায় অসংখ্য রয়েছে।

নাবেগা জাদীর জন্য নবী করীম স. দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেনো তাঁর দাঁতকে নষ্ট না করেন। দেখা গেছে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হজরত নায়েগা জাদীর একটি দাঁতও নষ্ট হয়নি। অন্য এক বর্ণনায় আছে, হজরত নাবেগা জাদী দাঁতের ব্যাপারে বড়ই সৌভাগ্যবান ছিলেন। তাঁর দাঁত পড়ে গেলে সেখানে নতুন দাঁত গজিয়ে যেতো। তিনি একশ বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। কেউ কেউ তার চেয়ে বেশীও বলেছেন। তিনি ছিলেন আরবের প্রাচীন কবিগণের অন্যতম, যাঁরা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই বইয়ের শেষের দিকে ‘নবীর জন্য নিবেদিত কবিগণ’ অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

নবী করীম স. হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর জন্য দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করো। আর তাফসীর করার এলেম দাও । এই দোয়ার ফলে তিনি তরজুমানুল কোরআন বা কোরআনের মুখপত্র বলে উম্মতের নিকট খ্যাত হন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের জন্য দোয়া করেছিলেন ব্যবসায়ে উন্নতি ও বরকতের জন্য। এরপর থেকে তিনি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যা কিছুই করতেন, তাতেই লাভ হতো। হজরত মেকদাদ রা. এর জন্য মালের বরকতের ব্যাপারে দোয়া করেছিলেন। তাঁর নিকট সবসময় অধিক পরিমাণে মাল থাকতো।

গুযুহ ইবনে আবী জাআদ এর জন্য দোয়া করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি বাজারের এক গলিতে দাঁড়াতাম। আর একেকদিন চল্লিশ হাজার করে লাভ করতাম। বোখারী শরীফে আছে, গুযুহ ইবনে আবী জাআদ বলেন, আমি মাটি খরিদ করলেও লাভ হতো। তিনি আরও বলেন, একবার রসুলেপাক স. এর উটনী পালিয়ে গিয়েছিলো, তিনি সেটিকে ডাকছিলেন। আমি নিজে যেয়ে উটনিটিকে ধরে এনেছিলাম। তখন রসুলেপাক স. আমার জন্য দোয়া করেছিলেন।

রসুলেপাক স. আবু হুরায়রা রা. এর মায়ের জন্য দোয়া করেছিলেন, যাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আগে তিনি রসুলেপাক স. সম্পর্কে মন্দ কথা বলতেন। হজরত আলী রা. এর জন্য দোয়া করেছিলেন, যাতে তিনি শীত ও গরমের তীব্রতা থেকে সুরক্ষিত থাকেন। তাঁর অবস্থা এমন হয়েছিলো যে, তিনি গরমের দিনে শীতের দিনের কাপড় আর শীতের দিনে গরমের দিনের কাপড় পরিধান করতে পারতেন। শীত ও গরম তাঁর ক্ষতি করতে পারতো না। হজরত ফাতেমা রা. এর জন্য দোয়া করেছিলেন, যেনো তিনি কখনও ক্ষুধার্ত না থাকেন। বাকী জীবনে তিনি কোনোদিন ক্ষুধার্ত থাকেননি।

তুফায়েল ইবনে আমর রা. তাঁর কাওমের জন্য নবী করীম স. এর কাছে মোজেজা প্রদর্শনের নিবেদন করলেন। রসুলেপাক স. দোয়া করলেন। বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি তুফায়েলকে নূর দান করো। এরপর তাঁর দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে নূর দেখা যেতে লাগলো। তিনি নিবেদন করলেন, আমার চিন্তা হয়, মানুষ একে না জানি শ্বেতী রোগ মনে করে। তখন নূরের স্থান পরিবর্তন করে দিয়ে তা তাঁর হাতের লাঠির মধ্যে এনে দেয়া হলো। রাতের অন্ধকারে পথ চলার সময় তাঁর লাঠি থেকে নূর বিচ্ছুরিত হতো। এ জন্য তিনি যুন্নুর নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

একদা নবী করীম স. মুদার গোত্রের জন্য দোয়া করেছিলেন। তারা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছিলো। নবী করীম স. এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলো। পারস্যের বাদশাহ্ কেসরা যখন নবী করীম স. এর পবিত্র পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিলো, তখন তিনি দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা যেনো তার বাদশাহী ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেন। তাই হয়েছিলো। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে পারস্য রাজত্ব চিরদিনের জন্য মুছে গিয়েছিলো।

এক ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর নামাজে বাধা সৃষ্টি করেছিলো। রসুলেপাক স. দোয়া করলেন, আল্লাহ্তায়ালা যেনো তার পা দুটি ভেঙে দেন। তাই হয়েছিলো, সে যেস্থানে বসে ছিলো, সেখান থেকে ওঠে যেতে পারেনি।

নবী করীম স. একদিন এক ব্যক্তিকে বাম হাতে খেতে দেখলেন। তিনি তাকে ডান হাতে খেতে বললেন। লোকটি বললো, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। লোকটি মিথ্যে বলেছিলো। ফলে পরবর্তী জীবনে আর কোনোদিন সে ডান হাতে খাবার গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকি তার ডান হাতটি ওঠানোর শক্তিও তার হতো না।

উৎবা ইবনে আবু লাহাবের ব্যাপারে বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সৃষ্ট কুকুরসমূহ থেকে যেনো কোনো একটি কুকুর তার জন্য নিয়োজিত করেন। তাকে বাঘে ছিঁড়ে ফেড়ে খেয়েছিলো।

কুরাইশ গোত্রের যে সকল হতভাগ্য নামাজ আদায়ের সময় রসুলেপাক স. এর গর্দান মোবারকে উটের ভূঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছিলো, রসুলেপাক স. তাদের ব্যাপারে বদদোয়া করেছিলেন। ফলে বদর যুদ্ধের দিন তারা সকলেই লাঞ্ছনার মৃত্যুবরণ করেছিলো। হাকাম ইবনুল আস নামক এক পাপিষ্ঠ অহংকার, দম্ভ আর ঘৃণা প্রকাশার্থে তার চোখ বন্ধ করে নিয়েছিলো। নবী করীম স. এর পবিত্র চেহারা সে দেখতে চায়নি। নবী করীম স. বলেছিলেন, এমনই যেনো হয়। হয়েছিলোও তাই। তার নিকৃষ্ট চোখ সে আর কোনোদিন খুলতে পারেনি।

মাহকাম ইবনে জুহামা নামক জনৈক হতভাগার ব্যাপারে তিনি বদদোয়া করেছিলেন, মাটি যেনো তাকে কবুল না করে। মৃত্যুর পর তাকে কবরে নামানো হলে কবর তাকে গ্রহণ করলো না। উপরে বের করে দিলো। কয়েকবার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। কবরের ভিতর লাশ রাখা গেলো না। পরিশেষে তার লাশটি দুটি গর্তের মধ্যবর্তী স্থানে রেখে তার চারদিকে প্রাচীর বানিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু সেখান থেকেও তার লাশ বেরিয়ে এলো।

নাফরমান বারা ইবনে আমের নামক জনৈক পাদ্রীর ব্যাপারে বদদোয়া করেছিলেন, যেনো সে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে নিঃসঙ্গ মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যু সেভাবেই হয়েছিলো। আশশেফা কিতাবের লেখক কাযী আয়ায র. বলেন, এ জাতীয় ঘটনার বর্ণনা এতো অধিক যা শুমার করা সম্ভব নয়।

সম্মান ও বরকত প্রদান

সাইয়্যেদে আলম স. যে জিনিস স্পর্শ করেছেন, যাকে সাহচর্য ও নৈকট্য দানে ধন্য করেছেন, সেই জিনিস এবং সেই ব্যক্তি সম্মান ও বরকতের অধিকারী হয়েছেন। এ প্রসেঙ্গ বহু সহীহ্ হাদীছ রয়েছে।

হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. একদা একটি জুব্বা বের করে বললেন, এই জুব্বা মোবারক রসুলেপাক স. ব্যবহার করেছেন। আমরা রুগ্ন ব্যক্তিকে এ জুব্বা মোবারকের এক কোণা ধৌত করে পানি পান করিয়ে দেই। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হয়ে যায়।

রসুলেপাক স. এর ব্যবহৃত একখানা পেয়ালা ছিলো। তাতে কেউ পানি নিয়ে পান করলে রোগমুক্ত হয়ে যেতো।

হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ রা. এর টুপীতে নবী করীম স. এর কয়েকখানা চুল লাগানো ছিলো। তিনি সে টুপীখানা পরিধান করে যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন, সে যুদ্ধেই বিজয়ী হতেন।

হজরত আনাস রা. এর কূপে নবী করীম স. এর মুখের লালা মোবারক ঢেলে দেয়া হয়েছিলো। মদীনায় তাঁর কূপের পানির চেয়ে মিষ্টি পানি আর ছিলো না।

এক সময় যমযম শরীফের এক বালতি পানি রসুলেপাক স. এর সামনে আনা হলো। তিনি তাতে মুখের লালা ে মিশিয়ে দিলে তা মেশক আম্বরের চেয়ে অধিক সৌরভ ছড়াতে লাগলো।

একদা হজরত ইমাম হাসান রা. ও ইমাম হুসাইন রা. পিপাসায় কাতর হয়ে কাঁদছিলেন। নবী করীম স. তাঁর জিহ্বা মোবারক তাঁদের মুখে দিলেন। তাঁরা চুষতে লাগলেন। মুহূর্তে তাঁদের কান্না থেমে গেলো। তিনি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখে তাঁর মুখের লালা দিলে, সে শিশুর রাত পর্যন্ত আহারের দরকার হতো না।

হজরত মালেক রা. বর্ণনা করেছেন, তাঁর একটি ঘিয়ের কৌটা ছিলো। সেটিতে করে তিনি নবী করীম স. এর জন্য ঘি পাঠাতেন। সেই কৌটা থেকে ঘি নিংড়িয়ে বের না করলে ফুরাতো না। তিনি সব সময় ওই কৌটা থেকে ঘি বের করতে পারতেন।

নবী করীম স. এক ইহুদীর জন্য স্বহস্তে একটি খেজুর গাছ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সে বৎসরই তাতে ফল ধরেছিলো। হজরত সালমান ফারসী রা. এর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে, হজরত সালমান ফারসী রা. কে এক ইহুদী চুক্তিবদ্ধ গোলাম হিসেবে ক্রয় করেছিলো। তাঁর সঙ্গে চুক্তি ছিলো, যেদিন তিনি চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ আর তিনশ খেজুর গাছ উৎপাদিত করে তা থেকে ফল ফলিয়ে এনে দিতে পারবেন, সেদিন তাঁকে মুক্তি দেয়া হবে। তিনশ' গাছের মধ্যে একটি খেজুরগাছ ছাড়া সব কয়টিতেই ফল এলো। সেই গাছটি রসুলেপাক স. লাগিয়ে দেননি। অন্য কারও হাতে সেটি লাগানো হয়েছিলো।

ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করেছেন, সম্ভবতঃ ওই গাছ হজরত ওমর রা. লাগিয়েছিলেন। ইমাম বোখারী বলেন, গাছটি হজরত সালমান ফারসী রা. নিজেই লাগিয়েছিলেন। এমনও হতে পারে যে, দুজনে মিলেই লাগিয়েছিলেন। যাহোক, নবী করীম স. খেজুর গাছটি যমীন থেকে উঠিয়ে পুনরায় স্বহস্তে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আর সে বৎসরই তাতে ফল ধরেছিলো। শুধু তাই নয়, মুরগীর ডিমের মতো বড় স্বর্ণের টুকরো ভর্তি একটি পাত্র তিনি নিয়ে গেলেন। হজরত সালমান ফারসী রা. সেগুলোতে মুখ লাগিয়ে চুম্বন করে চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ এনে ইহুদীকে দিয়ে দিলেন এবং আযাদ হয়ে গেলেন। চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ দেয়ার পর

উক্ত পাত্রে আরও চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ রয়ে গিয়েছিলো। এভাবে হজরত সালমান ফারসী রা. গোলামীর চুক্তি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

হানশ ইবনে আকীল রা. বর্ণনা করেন, একদিন রসুলেপাক স. আমাকে ছাতুর শরবত পান করতে দিলেন। তা থেকে প্রথমে তিনি নিজে কিছু পান করেছিলেন এবং শেষে আমাকে পান করতে বললেন। ওই শরবত পান করার পর থেকে আমার অবস্থা এই হয়েছিলো যে, যখনই আমার ক্ষুধা অথবা পিপাসা হতো, আমি ঘটনাটি স্মরণ করতাম, আর তখনই ক্ষুধা দূর হয়ে যেতো এবং নিজের মধ্যে শীতলতা অনুভব করতাম।

রসুলেপাক স. এর বরকতে বকরীর দুধ বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা রয়েছে। যেমন উম্মে মাবাদ ও হজরত আনাস রা. এর বকরী, নবী করীম স. এর দুধমাতা হজরত হালীমা সাদিয়া রা. এর বকরী এবং উট, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর বকরী। আর সেটা তো তখন পর্যন্ত গর্ভধারণই করেনি। তৎসত্ত্বেও দুধ এসেছিলো। হজরত মেকদাদ রা. এর বকরীর অবস্থাও ছিলো সেরকমই। নবী করীম স. একদিন তাঁর কতিপয় সাহাবীর জন্য সফরের সামগ্রী হিসেবে একটি মশকের মুখ বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং দোয়া করেছিলেন। পথে নামাজের সময় হলো। তাঁরা বাহন থেকে নেমে মশকের মুখ খুললেন। দেখা গেলো, অতি মিষ্টি দুধে মশকটি ভর্তি।

হজরত ওমর ইবনে সাআদ রা. এর মাথায় হাত রেখে নবী করীম স. একদিন দোয়া করেছিলেন। আশি বৎসর বয়সেও তিনি ছিলেন পূর্ণ যুবক এবং যৌবন অবস্থাতেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আশশেফা কিতাবের লেখক বলেন, এ ধরনের বেশুমার ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। কায়স ইবনে যায়েদ জুযামী রা. এর মাথায় হাত রেখে নবী করীম স. দোয়া করেছিলেন। একশ বৎসর বয়সে যখন তাঁর মাথার সমস্ত চুল শাদা হয়ে গিয়েছিলো, তখনও ঐ স্থানটুকুর চুল সম্পূর্ণ কালো ছিলো, যেখানে নবী করীম স. এর পবিত্র হাতের স্পর্শ লেগেছিলো।

হজরত আবেদ ইবনে ওমর রা. হুনায়নের যুদ্ধের দিন আঘাত পেয়েছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁর চেহারাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন। এরপর তাঁর চেহারা সবসময় চমকিত থাকতো। যে কারণে তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিলো গোরা (উজ্জ্বলমুখ)। আরেকজনের চেহারাতেও রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্পর্শ লেগেছিলো। তাঁর চেহারা সবসময় নূরানী থাকতো। আবুদর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে খাত্তাব বেঁটে ধরনের ছিলেন। অথচ তাঁর পিতা ছিলেন দীর্ঘকায় পুরুষ। রসুলেপাক স. একদিন তাঁর মাথায় হাত রেখে বরকতের দোয়া করেছিলেন। তারপর তিনি অন্যান্য লোকের তুলনায় অধিক লম্বা ও সুন্দর হয়েছিলেন।

সাইয়্যেদা যয়নব বিনতে উম্মে সালাম রা. এর চেহারার উপর রসুলেপাক স. একদিন পানির ছিটা মেরে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁর চেহারার লাবণ্য এমন বৃদ্ধি পেলো যে, তিনি অপূর্ব সুন্দরী হয়ে গেলেন। বলা হয়, তিনি এই পানির ছিটা মেরেছিলেন রসিকতা করে। সুবহানাল্লাহ্।

নবী করীম স. এর রসিকতারই যখন এই হাল, তখন গুরুত্ব দিয়ে যদি কারও প্রতি তাওয়াজ্জুহ্ প্রদান করেন, তবে তার অবস্থা কোন পর্যায়ে যেয়ে পৌঁছতে পারে। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হজরত হানযালা ইবনে জুযায়ম রা. এর মাথায় হাত রেখে নবী করীম স. বরকতের দোয়া করেছিলেন। তারপর তাঁর এমন হাল হয়েছিলো যে, কোনো মানুষের চেহারা অথবা কারও বকরীর স্তন ফুলে গেলে তিনি সেই ফুলা স্থানে তাঁর মাথার স্পর্শ লাগালে সঙ্গে সঙ্গে ফুলা দূর হয়ে যেতো।

রসুলেপাক স. এক বাচ্চার মাথায় হাত বুলিয়েছিলেন। বাচ্চাটির মাথায় ছিলো টাক। হাত বুলানোর পর তার মাথায় চুল গজিয়েছিলো। কোনো বাচ্চা অসুস্থ বা উন্মাদ হলে অথবা বদআত্মার প্রভাবে পেলে নবী করীম স. তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়া মাত্র সমস্যা দূর হয়ে যেতো।

হজরত উৎবা ইবনে ফারকাদ রা. এর কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই খুব খোশবু ব্যবহার করতেন। কিন্তু হজরত উৎবার খোশবু তাদের সকলের খোশবুকে ম্লান করে দিতো। কারণ এই ছিলো, রসুলেপাক স. তাঁর পেটে এবং পিঠে পবিত্র হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন থেকে তাঁর শরীর হতে খোশবু বের হতো। তাঁর পবিত্র হাতের সবচেয়ে বড় মোজেজা ছিলো, হুনায়ন যুদ্ধের দিন তিনি এক মুঠো মাটি কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন। সে মাটি গিয়ে পড়েছিলো তাদের চোখে এবং মুখে। হুনায়ন যুদ্ধে কাফেরেরা সাময়িক বিজয় লাভ করেছিলো, কিন্তু তাঁর এই মোজেজার কারণে পরবর্তীতে তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে হয়েছিলো।

হজরত তালহা রা. এর ঘোড়ার উপর নবী করীম স. আরোহণ করার বরকতে তার মধ্যে শক্তি ও ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। পূর্বে ঘোড়াটি ছিলো একেবারেই দুর্বল ও অলস প্রকৃতির। পরে এতোবেশী তেজস্বী ও দ্রুতগামী হয়ে গিয়েছিলো যে, অন্য কোনো ঘোড়াই তার সমকক্ষ হতে পারতো না। হজরত জাবের রা. এর ঘোড়াটি এক সময় খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। রসুলেপাক স. গাছের একটি তাজা ডাল তাকে খাইয়ে দিয়েছিলেন। এতে ঘোড়াটি এতো দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়েছিলো যে, লাগাম ধরে তাকে টেনে ধরে রাখা যেতো না।

হজরত সাআদ ইবনে উবাদা রা. এর গাধার অবস্থাও ছিলো ওইরূপ। নবী করীম স. যখন তার উপর আরোহণ করলেন, তখন সে তুর্কী ঘোড়াকে হার মানিয়ে দিলো। কোনো প্রাণীই তার মোকাবেলা করতে পারতো না। হজরত

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজলী রা. ঘোড়ার পিঠে বসতে পারতেন না। রসুলেপাক স. তাঁর বুকে হাত রাখলেন। তারপর তিনি বিখ্যাত অশ্বারোহী হয়ে গিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের দিন হজরত ওকাশা রা. এর তলোয়ার ভেঙে গিয়েছিলো। নবী করীম স. তাঁকে গাছের একটি ডাল ভেঙে দিয়েছিলেন। সেই ডালখানাই হয়ে গিয়েছিলো তলোয়ার। এরপর সব যুদ্ধেই হজরত ওকাশা বীরদর্পে যুদ্ধ করেছেন। সবশেষে মুরতাদদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি শাহাদতবরণ করেছিলেন। তাঁর সেই তরবারীর নাম রাখা হয়েছিলো আউন অর্থাৎ রসুল স. এর সাহায্য।

উহুদযুদ্ধে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা. কেও খেজুরের ডাল দেয়া হয়েছিলো। আর তিনি সেই ডাল দিয়ে যুদ্ধ করে তরবারীবিশিষ্ট যোদ্ধাদেরকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্ধকার রাতে পথ চলার জন্য তিনি স. হজরত কাতাদা রা. এর হাতে একখানা খেজুরের ডাল তুলে দিয়েছিলেন। তিনি যখন রাস্তায় নামলেন, তখন ডাল থেকে আলো বিকিরিত হতে লাগলো। নবী করীম স. তাঁকে বলে দিয়েছিলেন, ঘরে যখন পৌঁছবে, তখন ডালাটির এক অংশ কালো দেখতে পাবে। কালো অংশটুকু ফেলে দিও। কেনোনা সেটি হচ্ছে শয়তান। তিনি ঘরে পৌঁছলে লাঠিতে ঠিকই কালো অংশ দেখতে পেলেন এবং সেটুকু ঝেড়ে ফেলে দিলেন।

হজরত আবু হুরায়রা রা. নবী করীম স. এর নিকট তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করেছিলেন। তিনি স. তখন একখানা চাদর বিছাতে বললেন। রসুলেপাক স. তাঁর পবিত্র হাতখানা চাদরের উপর রাখলেন। তারপর চাদরটাকে বুকে জড়িয়ে নিতে বললেন। নবী করীম স. এর দস্ত মোবারকের বরকতে তাঁর স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

এলমে গায়েব

রসুলেপাক স. এর উজ্জ্বলতর মোজেজাসমূহের মধ্যে গায়েবী বিষয়ে অবহিত হওয়া, ভবিষ্যতের এবং অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রদান অন্যতম। সত্তাগতভাবে এলমে গায়েব অবশ্য আল্লাহ্তায়ালার জন্যই নির্দিষ্ট। তিনিই একমাত্র আল্লামূল গুয়ুব। রসুলে করীম স. এর পবিত্র রসনা থেকে এবং তাঁর কোনো কোনো প্রকৃত অনুসারীগণের কাছ থেকে যে এলেমসমূহ প্রকাশ পেয়েছে, চাই তা ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকুক অথবা এলহামের মাধ্যমে, সে সম্পর্কে নবী করীম স. বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! আমি নিজে থেকে কিছু জানি না, তবে আমার প্রতিপালক আমাকে জানিয়ে দেন।

আল্লামা কাযী আয়ায র. বলেছেন, নবী করীম স. এর গায়েবী এলেম যাতী হিসেবে অর্থাৎ নিজস্ব হিসেবে ছিলো না। একথা নিঃসন্দেহে বলতেই হয়, নবী করীম স. এর গায়েবী এলেম আল্লাহ্তায়ালার দান। তাঁর গায়েবী এলেমের বিষয়টি সর্বজনবিদিত।

নবী করীম স. এর গায়েবী সংবাদ ছিলো দুই ধরনের। এক প্রকারের এলেম হচ্ছে কোরআন মজীদ। এই কোরআন মজীদ অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদসমূহ সরবরাহ করেছে। অতীত ও বর্তমান উম্মতসমূহের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। সৃষ্টির উৎপত্তি ও চূড়ান্ত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছে।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, এমন বিষয়ের এলেম যা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে। তার আলোচনা হাদীছ শরীফে এসেছে। কোরআন মজীদে ভবিষ্যত সম্পর্কে যে গায়েবী এলেম নবী করীম স. কে প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে রয়েছে 'আমি যা আমার রসুলের প্রতি নাযিল করেছি সে সম্পর্কে তোমরা যদি সন্দিহান হও, তবে এর সুরাগুলোর মতো একটি সুরা তৈরী করে নিয়ে এসো।' এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে 'তোমরা কক্ষনো পারবে না।' এই ভবিষ্যদ্বাণী কাফেরদের বেলায় প্রতিফলিত হয়েছিলো।

গায়েবী খবর প্রসঙ্গে বদরের ঘটনা সংক্রান্ত আয়াত রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে 'যখন আল্লাহ্তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দু'টি দলের মধ্যে একটি তোমাদের হস্তগত হয়ে যাবে। আর তোমরা চাচ্ছিলে ওই দলটি তোমাদের হস্তগত হোক, যাতে বাধাবিপত্তি নেই।' বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার প্রাক্কালে কুরাইশদের দু'টি কাফেলা ছিলো। একটি ছিলো দ্রব্যসামগ্রীতে সমৃদ্ধ নিরস্ত্র কাফেলা, আরেকটি ছিলো সামগ্রীবিহীন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। মুসলমানগণ নিরস্ত্র ও সম্পদপূর্ণ কাফেলাটিকে কামনা করেছিলো, যাতে সহজেই গনিমত হিসেবে সম্পদ অর্জিত হয়। আল্লাহ্তায়ালা তখন তাদের অন্তরস্থিত আকাংখা প্রকাশ করে দিলেন। তার সাথে সাথে যুদ্ধে তাদের নিশ্চিত বিজয়ের খবরটিও জানিয়ে দিলেন। এ জাতীয় সংবাদ গায়েবী খবর প্রদানেরই অন্তর্ভূত। এর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে বদর যুদ্ধের বর্ণনায়। গায়েবী খবর সংক্রান্ত আরও আয়াত রয়েছে, যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'কাফেরেরা অচিরেই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।'

এই আয়াতের মাধ্যমে কাফেরদের ভবিষ্যত অবস্থা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। আর তা বাস্তবে রূপ লাভ করেছিলো বদর যুদ্ধের দিন। অথচ তারা সংখ্যার দিক দিয়ে ছিলো মুসলমানদের তিনগুণ। কাফেরদের সংখ্যা হাজারের উর্ধ্বে ছিলো। তদুপরি অস্ত্রশস্ত্রে তারা ছিলো সম্পূর্ণ সুসজ্জিত। আর মুসলমানগণের সংখ্যা তিনশ তেরো। তাদের নিকট ছিলো মাত্র দুটি ঘোড়া, একটি হজরত যুবায়র রা. এর নিকট। আরেকটি হজরত মেকদাদ রা. এর নিকট।

নগণ্যসংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানদেরকে সাহায্য করলেন এবং বিজয় দান করলেন। তাঁরা বড় বড় কাফের সরদারকে কতল করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাদের দ্রব্য সামগ্রীকে গনিমত হিসেবে পেয়েছিলেন।

গায়েবী খবর সংক্রান্ত আয়াতে আরও বলা হয়েছে, 'অচিরেই আমি কাফেরদের অন্তর শংকাগ্রস্ত করে দেবো।' এই আয়াতে উহুদযুদ্ধের দিন কাফেরদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অথচ ঐদিন এক পর্যায়ে তাদের জয় হয়েই গিয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা কাফেরদের অন্তরে ভয়ভীতি ঢেলে দিলেন। যার ফলে তারা মক্কার দিকে

চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। প্রত্যাবর্তনের সময় সেনাপতি আবু সুফিয়ান, যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, উচ্চস্বরে ঘোষণা দিচ্ছিলেন, হে মোহাম্মদ! যদি চাও তাহলে আগামী বৎসর বদরের প্রান্তরে আবার শক্তি পরীক্ষা হবে। রসুলেপাক স. বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ্।

কাফেরেরা উহুদ প্রান্তর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পথিমধ্যে আক্ষেপ করেছিলো এবং মনে মনে চিন্তা করছিলো, কাজটা বোধ হয় ঠিক হয়নি, মুসলমানদের একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার দরকার ছিলো। তাই তারা ফিরে এসে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে মূলোৎপাটিত করে দিতে মনস্থ করেছিলো। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাদের অন্তরে ভয়ভীতি ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে পুনরায় আক্রমণ করার সাহস তাদের হয়নি।

গায়েবী খবর সংক্রান্ত অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'কাফেরেরা বিজয় লাভের পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই পরাজিত হবে।' শেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।' এই আয়াতে কারীমার শানে নুযুল হচ্ছে, রোম ও পারস্য সম্রাটের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ। কেসরা বা পারস্যের বাদশাহ্ যখন কায়সার বা রোমক সম্রাটকে পরাজিত করলো, তখন মক্কার কাফেরেরা আনন্দিত হলো। কারণ পারস্যসম্রাট ছিলো অগ্নিপূজক। আর কায়সার বা রোমক সম্রাট ছিলো নাসারা আহলে কিতাব। মক্কার মূর্তিপূজকেরা বললো, আমাদের ভাই অগ্নিপূজকেরা তোমাদের ভাই আহলে কিতাবদেরকে পরাজিত করেছে। এভাবে আমরাও তোমাদের উপর বিজয়ী হবো। কিন্তু সাত বৎসর পর দেখা গেলো, হুদায়বিয়া অভিযানের সময় রোমকরা পারস্য জয় করলো এবং অগ্নিপূজকদেরকে দেশান্তরিত করে দিলো।

গায়েবী খবর সংক্রান্ত আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ, তারা তাদের দুহাতের অর্জিত কর্মের কারণে মৃত্যুকে কামনা করবে না। ইহুদীরা যে মৃত্যুকে কখনও কামনা করবেনা, এ সম্পর্কে আয়াতে কারীমা খবর প্রদান করেছে। মৃত্যুকামনা ইচ্ছাধীন ব্যাপার। ইচ্ছে করলে করতে পারে। কিন্তু তারা এটা করেনি। কোরআন ভবিষ্যতের এই খবরটি দিয়েছে। তারা মৃত্যুকে কামনা করেনি। করে থাকলে অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ পেতো।

এক মারফু হাদীছে উক্ত হয়েছে, নবী করীম স. বলেছেন, মৃত্যুকামনা করলে তারা সঙ্গে সঙ্গে মরে যেতো। ধরাপৃষ্ঠে একটি ইহুদীও জীবিত থাকতো না। ভবিষ্যতেও তারা কোনোদিন এ কাজটি করলে নবী করীম স. এর বাণী সত্য প্রমাণিত হবে। ইহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ করেন, ইহুদীদের উপর অপমান ও দারিদ্র আরোপ করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক জামানায় ইহুদীরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত জীবন যাপন করেছে। কোরআন মজীদে যেমন বলা হয়েছে, বাস্তবে তাই হয়েছে।

গায়েবী খবর সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছেন, তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দিবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীগণকে দিয়েছিলেন।' এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ্তায়ালা রসুলে মকবুল স. এর কাছে এই মর্মে অঙ্গীকার করেছেন যে, তাঁর উম্মতগণকে তিনি পৃথিবীর প্রতিনিধি, ইমাম, শাসক এবং সংস্কারক বানাবেন। তাদের

মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ সংশোধনী পাবে। আল্লাহ্‌র বান্দাগণ আল্লাহ্‌র দরবারে আযেজী এনকেছারী করার প্রয়াস পাবে। ভয়ভীতি ও বিপদাপদ দূর করে দিয়ে তাদেরকে নিরাপদ, নিশ্চিন্ত, নির্ভীক ও শক্তিশালী বানিয়ে দিবেন। যাবতীয় দুর্বলতা ও অপারগতা দূর করে দিয়ে পৃথিবীর শাসক বানিয়ে দিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। 'আল্লাহ্‌র চেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি পূরণকারী আর কে হতে পারে?' ওই সময় পর্যন্ত রসুলেপাক স. ইহজগত থেকে বিদায় গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌তায়ালা মক্কা, খয়বর, বাহরাইন, ইয়ামন ও অন্যান্য আরব উপকূলের উপর মুসলমানদের পরিপূর্ণ বিজয় ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাছাড়া শাম দেশের অগ্নিপূজকেরা জিযিয়া দানে বাধ্য হয়। রোমের বাদশাহ্ হারকল এবং মিশর ও ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ্ রসুলেপাক স. এর কাছে হাদিয়া পেশ করতে বাধ্য হয়েছিলো। আসলান, নাজ্জাশী এবং হাবশার বাদশাহ্‌গণ ইমান গ্রহণ করেছিলেন।

রসুলেপাক স. দুনিয়া থেকে প্রস্থানের পর আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর হাবীব স. এর সম্মানের উপযোগী পদমর্যাদায় প্রথম খলীফা হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা.কে অভিষিক্ত করেন। তিনি সংশোধন ও সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। যারা রসুলেপাক স. এর তিরোধানের পর বিহ্বল ও চঞ্চল হয়ে ধর্মীয় চেতনা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো, তাদেরকে ইমানী দৃঢ়তায় একত্রিতি দান করলেন।

তিনি বীরত্ব ও সাহসিকতার এমন কর্মসূচী গ্রহণ করলেন, যা শ্রেষ্ঠ সাহাবীরাও মোকাবেলা করতে সাহস করেননি।

সকলেই মৌনতার নীতি অবলম্বন করেছিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে সমস্ত ফেতনা দূর করতে উদ্যত হলেন। আরব উপকূল থেকে ফেতনার মূল উৎপাটন করে পারস্য অভিমুখে হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ রা. এর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। সেখানে বিজয়ের ঝাণ্ডা উড্ডিন করলেন।

আরেক বাহিনী হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. এর নেতৃত্বাধীনে শাম দেশে প্রেরণ করলেন। আরেক বাহিনী প্রেরণ করলেন মিশর সাম্রাজ্য অভিমুখে হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর নেতৃত্বে।

শাম দেশে প্রেরিত বাহিনী বসরা, দামেস্ক এবং তার নিকটবর্তী দেশসমূহ জয় করেন। ইসলামের অগ্রযাত্রা এ পর্যন্ত আসার পর আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা.কেও উঠিয়ে নিলেন।

মুসলমানগণের নিকট আল্লাহ্‌তায়ালা এলহামের মাধ্যমে একথা জানিয়ে দিলেন যে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. দ্বীনের হুকুম প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর উত্তরসুরী হিসেবে হজরত ওমর রা.কে পছন্দ করেছেন। সুতরাং দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে ওমর রা. নিয়োজিত হলেন। চারিত্রিক শক্তি ও ন্যায়বিচারের পূর্ণতায় তিনি দ্বীনের হুকুম বাস্তবায়ন করতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই পুরো শামদেশ, মিশরের সমস্ত অঞ্চল এবং অধিকাংশ পারস্য অঞ্চল জয় করলেন। পারস্যের বাদশাহ্ কেসরার শান শওকত ভূলুণ্ঠিত করে দিলেন। সে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার শিকার হলো। রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো।

অন্যদিকে রোমক সম্রাট কায়সারকে শাম দেশ থেকে বহিষ্কার করা হলো। কুস্তুন্তুনিয়া পর্যন্ত মুসলমানদের বিজয় কেতন উড়ানো হলো। বিজিত রাজ্যের ধনসম্পদ গনিমত হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টিত হলো। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রসুল স. কে যেরূপ সংবাদপ্রদান করেছিলেন, হুবহু তাই বাস্তবায়িত হলো।

হজরত ওছমান রা. এর খেলাফতের সময় ইসলামী রাজ্যের পরিধি পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে আরও বৃদ্ধি পেলো। তাঁর খেলাফতের সময় উন্দুলুস, কিরওয়ান ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল বাহরে মুহীত্ জয় করে পূর্ব প্রান্তে চীন সাম্রাজ্য পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা প্রশস্ত হলো। পারস্য অধিপতি কেসরাকে হত্যা করে পরিপূর্ণভাবে রাজত্বকে খতম করে দেয়া হলো। মাদায়েন, ইরাক, খোরাসান এবং আহওয়ায জয় করে মুসলমানগণ তুর্কিদের সঙ্গে এক যবরদস্ত যুদ্ধে লিপ্ত হলো। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলসমূহ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের কর আসতে শুরু করলো।

এসব কিছুই হয়েছে কোরআনে করীমের তেলাওয়াত ও তার বরকতে। হজরত ওছমান রা. কুরআনে করীমের অতুলনীয় খেদমত করেছেন। আর সে কারণেই বেশীর ভাগ রাজ্য জয় হয়েছিলো।

তারপর খলীফা নির্বাচিত হলেন সাইয়্যেদুনা আলী মুর্তযা রা.। কিন্তু মানুষ তাঁর মর্যাদা নিরূপণ করতে ব্যর্থ হলো। তারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলো। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন। হানাফী মাযহাবের ফেকাহ্ ও হাদীছ শাস্ত্রের বিশিষ্ট আলেম ইমাম তাওরিশী তাঁর স্বরচিত কিতাব আকায়েদে উল্লেখ করেছেন, সাইয়্যেদুনা হজরত আলী রা. এর বিরুদ্ধাচরণকারীদের মধ্যে তিনটি দল ছিলো। একদল যারা তাঁকে চিনতে পারেনি। দ্বিতীয় দল যারা দুনিয়ার মহব্বতে লিপ্ত ছিলো। আর তৃতীয় দল যারা এজতেহাদের ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা রা., হজরত তালহা রা. ও হজরত যুবায়ের রা. প্রমুখ সাহাবীগণের ব্যাপারে আলোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। তাঁদের ব্যাপারে সংযমী হওয়া উচিত।

গায়েবী খবর পরিবেশনের দিক দিয়ে আল্লাহ্ আরও এরশাদ করেন, 'তিনি হচ্ছেন ওই আল্লাহ্ যিনি তাঁর রসুলকে হেদায়েত ও সৎধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, সমস্ত ধর্মের উপর সত্য ধর্মকে বিজয়ী করার জন্য।' এই কথায় বারী তায়ালার বাক্যের তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। যেভাবে বলা হয়েছে, সেভাবেই ইসলাম অন্য ধর্মের উপর প্রবল হয়ে রয়েছে। গায়েবী খবর পরিবেশনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্র সাহায্য এবং বিজয় যখন আসবে, তখন দেখতে পাবে, মানুষ দলে দলে আল্লাহ্র ধর্মে প্রবেশ করছে।' রসুলেপাক স. এই দুনিয়া থেকে প্রস্থানের প্রাক্কালে, আরব দেশসমূহের এমন কোনো স্থান বাকি ছিলো না যেখানে ইসলামের বিধান প্রবেশ করেনি। ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

গায়েবী খবর সরবরাহের দ্বিতীয় প্রকার বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন হাদীছ শরীফে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন হজরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রা.। বলেছেন, রসুলপাক স. একদিন খোতবা প্রদান করলেন। সে খোতবায় তিনি স. কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল

কিছুই জানিয়ে দিলেন। ওই সমস্ত কথা কারও কারও স্মরণে আছে। আবার কেউ ভুলে গেছেন। ভুলে যাওয়ার বিষয়গুলো এরকম, যেমন বাহ্যিকভাবে আমরা কোনো ব্যাপার ভুলে যাই। আবার সে বিষয়ের সামনাসামনি হলে স্মরণ হয়। যেমন কেউ কিছুকাল অনুপস্থিত থাকলে তার কথা ভুলে যাই। আবার সামনে এলে চিনতে পারি। হজরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি এরূপ মনে করি না যে, আমার সাথীগণ জেনে বুঝে ইচ্ছা করে ভুলে গেছেন। বরং আল্লাহ্র কসম! তাদেরকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই রসুলেপাক স. কিয়ামত পর্যন্ত ধর্মের মধ্যে যেসমস্ত ফেতনা দেখা দিবে তার পরিষ্কার বিষদ বর্ণনা দিয়ে গেছেন। এমনকি ফেতনাকারীর নাম, পিতার নাম এবং বাসস্থানের নাম পর্যন্ত বলে গেছেন।

তিনি বলেছেন, প্রাথমিক অবস্থায় ফেতনাবাজদের সংখ্যা তিনশ' পর্যন্ত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের অনুসারীদের সংখ্যা হবে অনেক। হজরত আবু যর রা. বলেন, রসুলেপাক স. এরকম সব বিষয়েরই আলোচনা করেছেন। এমনকি আকাশে যে পাখিটি পাখা মেলে উড়ে যায়, তার সম্পর্কেও আমাদেরকে জানিয়েছেন। দাজ্জালের আলোচনায় ইমাম মুসলিম হজরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে দশজন অশ্বারোহী রেসালতের দাবীদার হবে। তাদের নাম, তাদের বাপ দাদার নাম পর্যন্ত আমার জানা আছে। তাদের ঘোড়ার রঙ কী হবে, তাও আমি বলে দিতে পারি। পৃথিবীতে তারা উত্তম অশ্বারোহী হবে। হাদীছ শাস্ত্রের ইমামগণ এই বর্ণনা বিভিন্ন সহীহ্ হাদীছে করেছেন।

নবী করীম স. তাঁর উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন, তারা একদিন দুশমনদের উপর বিজয়ী হবে। মক্কা মুকাররমা, বাইতুল মুকাদ্দাস, ইয়ামন, শাম ও ইরাকে মুসলমানদের বিজয় সূচিত হবে এবং সেখানে এমন শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে যে, একজন রমণী একাকী হীরা থেকে মক্কা পর্যন্ত সফর করলে আল্লাহ্র ভয় ছাড়া তার মনে অন্য কোনোকিছুর সামান্যতম ভয় ও আশংকার উদ্রেক হবে না।

হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে, নবী করীম স. এক সময় মদীনায় অবস্থান করবেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর উম্মতকে বিজয় দান করবেন। কায়সার ও কেসরার ধনভাণ্ডার মুসলমানদের মধ্যে বণ্টিত হবে। তারা চলে যাওয়ার পর পুনরায় কোনো কেসরা এবং কায়সার হবেনা। কেসরার রাজত্ব ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিলো যেমন নবী করীম স. এর মোবারক পত্র সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিলো। কায়সার শাম থেকে পলায়ন করেছিলো এবং তার অধীনস্থ রাজ্যসমূহ ইসলামী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। মুসলমানগণ তার অধীনস্থ অন্যান্য রাজ্যগুলোও দখল করেছিলো। এসব হয়েছিলো হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. এর খেলাফতকালে।

রসুলেপাক স. খবর দিয়েছেন, মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ফেতনার উদ্ভব হবে। প্রবৃত্তিপূজারী হবে মুসলমানগণ। অতীতকালের ইহুদী নাসারাদের পদাংক অনুসরণ করে চলবে। উম্মতের মধ্যে তেহাত্তর ফেরকা হবে। তন্মধ্যে একটি মাত্র ফেরকা নাজাতপ্রাপ্ত হবে। মুসলমানেরা আরাম আয়েশ ভোগ বিলাসের পিছনে ছুটবে। সকাল সন্ধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন পোশাক পরিধান করবে। জমকালো পোশাক পরবে। ঘরের ভিতর ভালো ভালো ফরাশ

ব্যবহার করবে। ঘরের ছাদ বানাবে। দেয়ালে ঝুলাবে রঙ বেরঙের পর্দা। অহংকার ও দম্ভভরে চলাফেরা করবে। নানা প্রকারের আহার্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে। পারস্য ও রোম দেশের নারীদের মতো মুসলিম রমণীদের থেকে খেদমত গ্রহণ করবে।

তিনি আরও বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে যখন এগুলো বিস্তার লাভ করবে, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয়ে যাবে। নেককারদের স্থান দখল করে নিবে গোনাহ্গারেরা। এমতাবস্থায় আল্লাহ্তায়ালা নেককার লোকদেরকে তাদের ভিতর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি আরও বলেছেন, সে সময় অতিদ্রুত গতিতে চলবে। কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে এলেম উঠে যাবে এবং আহলে এলেম দুনিয়া থেকে চলে যাবে। ফেতনা প্রকাশিত হবে। গান বাজনা ও হাসি তামাশার উপকরণের ব্যাপক বিস্তার ঘটবে।

মুসায়লামা কাযযাবের ফেতনার খবর দেয়া হয়েছে এবং তার অনিষ্ট হতে সাবধান করা হয়েছে। এ মর্মে নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আরবদের জন্য আক্ষেপ, ফেতনার আলামত নিকটবর্তী। তিনি আরও এরশাদ করেছেন, পৃথিবীর পরিমণ্ডলকে একাকার করে আমাকে দেখানো হয়েছে। যে পর্যন্ত আমাকে দেখানো হয়েছে, সে পর্যন্ত আমার উম্মতের অধিকারই দেখেছি। দেখেছি মাশরিক মাগরিব ও তৎমধ্যবর্তী স্থানের ভারতের হুকুমতও ইসলামের ছায়াতলে সুদীর্ঘ হবে। তার দৈর্ঘ্য পূর্বের প্রান্ত থেকে নিয়ে বাহরে এজনা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, যার শেষে আর কোনো জনবসতি নেই।

অতীতের কোনো উম্মতের রাজ্য এতো বড় ও সুদীর্ঘ হয়নি। উত্তরেও নয়। দক্ষিণেও নয়। তিনি আরও বলেছেন, আরবরা সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত তারা হকের উপরেই থাকবে। আরবদের বলতে এখানে কতিপয় আরবীয় লোককে বুঝানো হয়েছে। কেনোনা আরব শব্দের অর্থ হচ্ছে বালতি। আরবরা বালতি দিয়ে পানি উঠিয়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম করতো বলে তাদেরকে আরব বলা হয়েছে। কেউ কেউ আবার আহলে আরব বলতে আরবের পাশ্চাত্য অঞ্চলকে বুঝিয়ে থাকেন। কেনোনা আরবের পশ্চিমা দেশগুলো অধিকাংশ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

কোনো কোনো বিবরণে আহলে মাগরেবও উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে, আহ্লে মাগরেবরা হকের উপরে থাকবে। এখানে আহ্লে মাগরেব বলতে কল্যাণকামী লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা কল্যাণকামী হবে, তারা সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে। হজরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেছেন নবী করীম স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবসময়ই একটি দল সত্যের উপরে থাকবে এবং দুশমনের উপরে প্রবল থাকবে। কেয়ামত এসে গেলেও তারা হকের উপরেই থাকবে। সাহাবা কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এধরনের লোক কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, বাইতুল মুকাদ্দাসে।

নবী করীম স. বনু উমাইয়ার হুকুমত এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনের খবর দিয়েছেন। এরশাদ করেছেন, হে মুয়াবিয়া! শুনে রাখো, শেষ জীবনে তুমি আমার উম্মতের শাসক হবে। যখন শাসক হবে, তখন নেককারদের সাহচর্যে থেকো আর বদ

লোকদের সংসর্গ বর্জন করো। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়াতে উল্লেখ আছে, হজরত ইবনে আসাকের রা. বর্ণনা করেছেন নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, মুয়াবিয়া কখনও পরাজিত হবে না। হজরত আলী মুর্তজা রা. সিফফীনের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, আমি এই হাদীছ আগে জানলে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতাম না। আল্লাহ্‌পাকই ভালো জানেন।

নবী করীম স. একদা হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর মাকে বলেছিলেন, তোমার গর্ভে পুত্রসন্তান রয়েছে। সে জন্মগ্রহণ করলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পর রসুলেপাক স. এর কাছে আনা হলো। রসুলেপাক স. তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত দিলেন এবং মুখের লালা মোবারক শিশুর মুখে দিলেন। তারপর তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ এবং বললেন এ শিশু আবুল খোলাফা হবে।

আরবেরা তুর্কিদের উপর বিজয়ী হবে— এ খবরও তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, বনু আব্বাস গোত্র কালো পতাকা নিয়ে বের হবে, তারা বহু এলাকা অধিকার করবে। আহলে বাইতকে দেখামাত্র হত্যা করবে এবং তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার চালাবে।

সাইয়্যেদুনা আলী মুর্তযা রা. এর শাহাদতের খবরও তিনি দিয়ে গেছেন। বলেছেন, কওমের মধ্যে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বদবখত্ যে তার মাথা ও দাড়িকে রক্তে রঞ্জিত করবে। তিনি আরও বলেছেন, আলী মুর্তযা জান্নাত জাহান্নাম বণ্টনকারী হবে। সে তার দোস্তদেরকে জান্নাতে আর দুশমনদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। আশশেফা কিতাবে বলা হয়েছে, হজরত আলী মুর্তযা রা. এর দুশমন দুটি সম্প্রদায়– একটি খারেজী, অপরটি নাসেবী। আর রাফেযীদের ওই দলটিও, যারা নাসেবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। আলেমগণ এদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছেন। হজরত আলী রা. এর মর্যাদা সম্পর্কে এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হজরত ঈসা আ. ও মরিয়ম আ. এর সঙ্গে হজরত আলী রা. এর এক ধরনের মিল রয়েছে। ইহুদীরা হজরত ঈসা আ. এর সঙ্গে শত্রুতা করতো এবং তাঁর মাতা হজরত মরিয়ম আ.কে অপবাদ দিতো। অপরপক্ষে নাসারারা তাঁর প্রতি বিকৃত মহব্বতের কারণে তাঁকে এমন মর্যাদা দিতো, যা তিনি নন।

হজরত আলী রা. বলেছেন, আমার ব্যাপারে দুধরনের লোক ধ্বংস হয়ে যাবে। এক, আমার অতিরঞ্জিত প্রেমিক। আমার সীমাহীন প্রশংসা করে করে তারা আমাকে এমন স্থানে নিয়ে যাবে, যা আমার মধ্যে নেই। দ্বিতীয়, যারা অযথা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, শত্রুতা করে এবং আমাকে মিথ্যা অপবাদ দেয়।

রসুলেপাক স. হজরত ওছমান রা. এর শাহাদতের খবর দিয়েছেন। বলেছেন, ওছমান কোরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় শহীদ হবে। তাঁর শাহাদতের সময় কোরআনে করীমের আয়াতের উপর তাঁর রক্ত ঝরে পড়েছিলো। তাই দেখে লোকেরা মন্তব্য করেছিলো, অবশ্যই তাঁকে যুলুম করে শহীদ করা হয়েছে।

হজরত ওছমান রা. এর খেলাফত সম্পর্কে নবী করীম স. আরও খবর দিয়েছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা ওছমানকে একটি কামীয পরিধান করাবেন, অথচ লোকেরা সে কামীয খুলে ফেলতে চাইবে। কামীয পরিধান করানোর অর্থ খেলাফত প্রদান করা। এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম স. হজরত ওছমান রা.কে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে কামীয

পরিধান করাবেন। কামীযটি খুলো না। তিনি তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং তিনি যে পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন, সে সম্পর্কে তাঁকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি স. আরও বলেছিলেন, যতক্ষণ ওমর জীবিত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেতনার উদ্ভব হবে না। হজরত ওমর রা. শহীদ হবেন বলেও তিনি খবর জানিয়েছিলেন। হজরত আলী রা. এর সঙ্গে হজরত যুবায়ের রা. এর যুদ্ধ হবে এবং সে যুদ্ধের পর হজরত যুবায়র রা. অনুতপ্ত হবেন এ সম্পর্কেও খবর জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের একজন সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি যখন মক্কা ও বসরার মধ্যবর্তী হাওয়াব নামক স্থানে পৌঁছবেন, তখন কুকুরদেরকে আওয়াজ করে কিছু বলতে শুনবেন এবং সেখানে নিহতদের স্তূপ হয়ে যাবে।

জঙ্গে জামালের সময় হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. যখন মক্কা থেকে বসরার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন উক্ত স্থানে ওই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার রা. কে খবর দিয়েছিলেন, তাঁকে বিদ্রোহীরা শহীদ করবে। হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সাথীরা তাঁকে শহীদ করেছিলো। এ খবর মুতাওয়াতিরের কাছাকাছি।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. কে বলেছিলেন, তোমার ব্যাপারে লোকেরা আক্ষেপ করবে আর তুমিও লোকদের তৎপরতায় আক্ষেপ করবে। হাজ্জাজের নির্দেশে তাঁর সাথে সেরকম আচরণই করা হয়েছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস রা. কে বলেছিলেন, তোমার দৃষ্টিশক্তিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং কিয়ামতের দিন ফিরিয়ে দেয়া হবে। হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা রা., হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা. এর শাহাদতের ব্যাপারেও খবর দিয়েছিলেন তিনি। মুতার যুদ্ধে হজরত খালেদ রা. মুসলমানদের বিজয় ছিনিয়ে আনবেন এ খবরও তিনি দিয়েছিলেন।

কুরনান নামের এক ব্যক্তি সম্পর্কে রসুলেপাক স. একবার মন্তব্য করলেন, সে জাহান্নামী। লোকটি এক যুদ্ধে বিমোহিত করলো মানুষকে। পরিশেষে দেখা গেলো, সে যখমের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজের তলোয়ার দিয়ে নিজের জীবন শেষ করে দিলো। লোকেরা এই খবর রসুলেপাক স. এর কাছে পৌঁছালে তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রসুল।

রসুলেপাক স. এক দল সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। সেই দলে ছিলেন হজরত আবু হুরায়রা রা., হজরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. এবং হজরত হুযায়ফা রা.। রসুলেপাক স. বলেছিলেন, শেষোক্ত জনের মৃত্যু হবে দুনিয়াবী আগুনের মাধ্যমে। তিনজনের মধ্যে সর্বশেষে মৃত্যুবরণ করেছিলেন হজরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রা.। তিনি অতি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে এরকম দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর শরীরের উত্তাপ প্রায় ছিলোই না। শরীরকে গরম রাখার জন্য সব সময় তাঁকে আগুনের তাপ গ্রহণ করতে হতো। অবশেষে আগুনে পুড়েই তাঁকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছিলো।

উহুদের যুদ্ধে হানযালা রা. শাহাদতবরণ করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, হানযালাকে ফেরেশতারা এখন গোসল দিচ্ছে। ময়দানে তাঁর লাশ পাওয়া যাচ্ছিলো না। রসুলেপাক স. বললেন, তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো, কারণ কী। তাঁর স্ত্রী বললেন, তিনি জুনুবী ছিলেন, তাই তাঁর গোসলের প্রয়োজন ছিলো। হজরত হানযালা রা. যখন শুনলেন,

রসুলেপাক স. শক্ত যুদ্ধের সম্মুখীন, তখনই দৌড় দিয়েছিলেন যুদ্ধের মাঠে। গোসল করার ফুরসত পাননি। আর এ অবস্থায়ই তিনি শহীদ হয়েছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমি হানযালার মাথা থেকে পানির ফোঁটা টপ টপ করে পড়তে দেখেছি।

নবী করীম স. আরও খবর জানিয়েছিলেন, বনু ছাকীফ গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী আর একজন হন্তারক জন্ম নেবে। তাই হয়েছিলো। সে গোত্রে জন্ম নিয়েছিলো মিথ্যাবাদী মুখতার ইবনে ওবায়েদ এবং হন্তারক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। সাইয়্যেদুনা হজরত ইমাম হাসান রা. সম্পর্কে বলেছিলেন, আমার এ ফরযন্দ সাইয়্যেদ। তার মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানদের দুইটি দলের মধ্যে সন্ধি করাবেন। তাই হয়েছিলো হজরত আমীর মুয়াবিয়া রা. এর সঙ্গে সন্ধির মাধ্যমে। সাইয়্যেদা ফাতেমা রা. সম্পর্কে বলেছিলেন, আহলে বাইতের মধ্যে সকলের আগে আমার সঙ্গে মিলিত হবে ফাতেমা।

নবী করীম স. এর দুনিয়া থেকে প্রস্থানের আট বা ছয় মাস পর হজরত ফাতেমা রা. এর ইন্তেকাল হয়েছিলো। তিনি আরও বলেছিলেন, আমার স্ত্রীগণের মধ্যে সেই আমার সঙ্গে সর্বাগ্রে মিলিত হবে, যার হাত লম্বা। এ কথার দ্বারা তিনি উম্মুল মুমেনীন হজরত যয়নব রা.কে বুঝিয়েছিলেন। কারণ, তিনি খুব বেশী দান করতেন। পরবর্তীতে হয়েছিলোও তাই। সাইয়্যেদুনা হজরত ইমাম হুসাইন রা. সম্পর্কে বলেছিলেন, তফ নামক স্থানে তিনি শহীদ হবেন। সেস্থানের আলামতও তিনি বলে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, একটি বিষধর কুকুর তাকে শহীদ করবে। বিষধর কুকুর বলে তিনি যাকে বুঝিয়েছিলেন তার নাম ছিলো শীমার ইবনে যুল যুশন। রসুলেপাক স. নিজের মুঠির ভিতর থেকে কিছু মাটি বের করে দেখিয়ে বলেছিলেন, এ হচ্ছে তার হত্যাস্থলের মাটি। তিনি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আমার পর তিরিশ বৎসর খেলাফত বিদ্যমান থাকবে। তারপর রাজতন্ত্র এবং বাদশাহী চলবে।

এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ‘মুলকে আযুয’ চলবে। ইসলামী প্রশাসনের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে নবুওয়াত ও রহমত। তারপর খেলাফত ও রহমত। তারপর মুলুকে আযুয। তারপর উবুদ ও জাবারুত এবং তার সাথে ফেতনা ফাসাদ।

উক্ত স্তরগুলো আত্মপ্রকাশ করবে বলে তিনি খবর দিয়ে গেছেন। তারপর এক শিঙ বের হবে। খেলাফতের পর রাজতন্ত্র ও বাদশাহী হবে। সে সময়কার রাজা বা বাদশাহের আলামতও তিনি বলে গেছেন। তাদের পরিচয় হবে এই যে, তারা ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করবে না। বিলম্ব করে নামাজ পড়বে। তিনি আরও বলেছেন, আখেরী জামানায় আমার উম্মতের মধ্যে তিরিশটি দাজ্জাল ও কাজ্জাবের জন্ম হবে। তাদের মধ্যে চারজন হবে নারী। তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করবে। এ উম্মতের সমাপ্তি দাজ্জাল ও কায্যাবের মাধ্যমে হবে। এক বর্ণনায় এসেছে, তারা নবুওয়াতের দাবি করবে। নবী করীম স. আরও এরশাদ করেছেন, আমার যুগই সর্বোত্তম যুগ, অতঃপর যারা আমার যুগের লোকদেরকে পেয়েছে, অতঃপর যারা তাদেরকে পেয়েছে, অতঃপর যারা তাদেরকে পেয়েছে, অতঃপর তারা যাদেরকে পেয়েছে। এ দ্বারা সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের যুগকে বুঝানো হয়েছে। বোখারী শরীফের এক বর্ণনায় বর্ণনাকারী সন্দিগ্ধাবস্থায় ‘ছুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম’ চারবার বলা হয়েছে।

অতঃপর নবী করীম স. বলেছেন, এরপর মিথ্যাচার বিস্তার লাভ করবে। এক বর্ণনায় আছে, শেষ জামানার মানুষেরা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা না হলেও নিজে থেকে যেচে এসে সাক্ষী প্রদান করবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে। আমানতের খেয়ানত করবে এবং ওয়াদা করে ওয়াদা পূরণ করবে না। তিনি আরও বলেছেন, আমার উম্মত কুরাইশের বাচ্চাদের হাতে হালাক হবে। এ দ্বারা তাঁর সহচরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

হজরত আবু হুরায়রা রা. যিনি এই হাদীছখানার বর্ণনাকারী, তিনি বলতেন, রসুল স. যাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন আমি ইচ্ছে করলে তাদের নাম ধাম বলে দিতে পারি। কিন্তু আমি এটা চাই না। হজরত আবু হুরায়রা রা. একথা বলে আল্লাহ্তায়ালার কাছে পানা চাইতেন, আমি ষাট হিজরীর হুকুমত থেকে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য চাই। ষাট হিজরী ছিলো এযীদের ক্ষমতা দখলের বৎসর। হজরত আবু হুরায়রা রা. তার পূর্বেই এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

রসুলেপাক স. আরও খবর দিয়ে গেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কদরিয়া, মুরজিয়া, রাফেযী ও খারেজী ইত্যাদি বাতেল ফেরকা আত্মপ্রকাশ করবে। খারেজীদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এরা উত্তম একটি দল থেকেই বের হবে। উত্তম দল বলতে হজরত আলী রা. এর সাথীগণের দলকে বুঝানো হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, সে দলটির আলামত এই যে, তাদের দলে কালো বর্ণের একটি লোক থাকবে, যাকে মানুষ যুছছাদিয়া বা স্ত নওয়ালা বলে ডাকবে। তার একটি বাজু রমণীদের স্তনের মতো হবে, যাকে সে নাড়াচাড়া করবে। এদিক সেদিক ঘুরাবে। তার মস্তক মুণ্ডিত থাকবে। তার সঙ্গে আলী যুদ্ধ করবে।

এক বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম স. বলেছেন, আমি যদি ওদেরকে পেতাম তাহলে আদ ছামুদ জাতির মতো ধ্বংস করে দিতাম। তিনি আরও জানিয়েছেন, উম্মতের মধ্যে নবীনেরা প্রবীণদেরকে মন্দ বলবে। আধুনিকরা পূর্ববর্তীগণের সমালোচনা করবে। রাফেজীরা সেরকমই করে থাকে। তিনি আরও বলেছেন, দ্বীনের সাহায্যকারী কমে যাবে। তাদের সংখ্যা খুব কম হবে, আটার মধ্যে লবণের পরিমাণ যে রকম হয়। উম্মতের মধ্যে সর্বদাই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা বিরাজ করবে। এ বিভেদ ও ফেরকাবাজী থেকে কোনো দলই বাঁচতে পারবে না। শাসকেরা মানুষের উপর জুলুম করবে, কঠোরতা করবে। শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা দখল করে নেবে। নিজেদের লোকদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করবে, অন্যদের সাথে সেরূপ আচরণ করবে না।

নবী করীম স. আরও খবর দিয়েছেন, আখেরী জামানায় মানুষ চূড়ান্ত সীমার নিকৃষ্ট হবে। তারা বকরী চরাবে খালি পায়ে। চলাফেরা করবে খালি শরীরে। গগণচুম্বী ইমারত অট্টালিকা প্রস্তুত করবে। তার মধ্যে বিভিন্ন কামরা আর জানালার সমাহার ঘটাবে। এগুলো অধিক সম্পদ ও আরাম আয়েশের ইঙ্গিত। তিনি স. আরও বলেছেন, কুরাইশরা রসুলুল্লাহ্র সঙ্গে কখনও যুদ্ধ করবে না। কেনোনা তিনি তো কুরাইশদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আর তা সংঘটিত হয়েছে খন্দকের যুদ্ধে। এরপর আর কুরাইশরা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখেনি। বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের পর মুতান সর্ম্পকেও খবর দিয়েছেন। মুতান শব্দের অর্থ হচ্ছে তাউন বা প্লেগ রোগ। প্লেগরোগের উৎপত্তি অধিকাংশ সময় ইঁদুরের মৃত্যু থেকে হয়ে থাকে।

হাদীছের জাহেরী অর্থ হিসেবে ওই প্লেগ রোগকে বুঝানো হয়েছে, যা আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. এর জামানায় বিস্তার লাভ করেছিলো। কথিত আছে, সেসময় তিন দিনে সত্তর হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বসরা আবাদ হওয়া সম্পর্কেও তিনি বলেছিলেন। এক সাহাবীকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন, সিংহাসনে সমারূঢ় বাদশাহ্দের মতো তিনি সমুদ্রপথে যুদ্ধযাত্রা করবেন। তাই হয়েছিলো, আমীরুল মুমেনীন হজরত ওছমান রা. এর সময়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। নবী করীম স. আরও তথ্য দিয়েছেন, দ্বীন যদি ছুরাইয়া তারকার মতো দূরত্বে ঝুলন্ত থাকে, তবুও পারস্যের সন্তানরা সেই দ্বীনের সন্ধান পাবেই। কেউ কেউ বলে থাকেন, এর দ্বারা হজরত সালমান ফার্সী রা. এর ইসলাম গ্রহণকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, হজরত ইমাম আবু হানীফা র. ও তাঁর সাগরেদগণকে বুঝানো হয়েছে। কেনোনা তাঁরা ছিলেন পারস্য সন্তান। এক বর্ণনায় এসেছে, পারস্যের একজন প্রকৃত পুরুষের কাছে দ্বীন পৌঁছে যাবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. মদীনা মুনাওয়ারার একজন আলেম সম্পর্কে বলেছিলেন, আলেমগণের একটি দল তাঁর অনুসরণ করবে। উলামা কেরাম বলেন, আলেম বলতে ইমাম মালেক র. কে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, আলেম বলতে একথা বুঝানো হয়েছে যে, মদীনা মুনাওয়ারার আলেমগণের নিকট মানুষ তাদের দ্বীনী প্রয়োজনে যেতে বাধ্য হবে। শেষোক্ত ব্যাখ্যা নবী করীম স. এর জামানার জন্য প্রযোজ্য হবে। সব সময়ের জন্য নয়। হাদীছের পূর্বাপর ভাব দৃষ্টে তাই প্রতীয়মান হয়।

নবী করীম স. কুরাইশদের আলেম সম্পর্কেও বলেছেন। যেমন হজরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে। নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, 'তোমরা কুরাইশদেরকে গালি দিও না। কেনোনা কুরাইশ বংশের একজন আলেম সমস্ত জাহানকে এলেমে ভরপুর করে দিবে। ইমাম আহমদ প্রমুখ আলেমগণ মনে করেন, উক্ত আলেম বলতে ইমাম শাফেয়ী র.কে বুঝানো হয়েছে। যুরকানী র. হজরত আনাস রা. থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন যাতে নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম হবে আবু হানীফা, সে আমার উম্মতের আলোকবর্তিকা হবে। তানযীহুশ শরীয়ত পুস্তকে বলা হয়েছে, ইমাম আহমদ র. কুরাইশ বংশের আলেম বলতে ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে যে মত পেশ করেছেন, তার সমর্থনে তিনি একটি হাদীছও বর্ণনা করেছেন, তার সূত্রশৃংখলের (সনদের) একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন ইয়াবারী। তিনি বর্ণনা করেছেন মামুন সালমী থেকে। এই দুইজন বর্ণনাকারীর কোনো একজন হাদীছটি বানিয়েছেন। কাজেই এটি মওযু হাদীছ। আর আবু হানীফা সম্পর্কিত হাদীছ সম্পর্কে সুফরুস সাআদত পুস্তকের লেখক বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু হানীফার ফাযায়েল ও তাঁদের নাম সম্পর্কে কোনো হাদীছ সহীহ এর স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি। এ সম্পর্কিত সকল বর্ণনা মওযু ও মুনকার। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

তিনি স. আরও বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হকের উপর কায়েম থাকবে। কেয়ামত পর্যন্ত এরকমই চলবে। আরও বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে একজন মোজাদ্দেদ প্রেরণ করবেন, যিনি দ্বীনের তাজদীদ বা সংস্কার করবেন।

এক ব্যক্তির একটি চাদর চুরি হয়েছিলো। নবী করীম স. বলে দিয়েছিলেন, এটা অমুক ব্যক্তি নিয়েছে। অবশেষে সে চাদর উক্ত ব্যক্তির মালপত্রের ভিতর থেকেই বের হয়েছিলো। নবী করীম স. এর উটনী এক সময় হারিয়ে গিয়েছিলো। তিনি স. বলে দিয়েছিলেন, অমুক মরুভূমিতে একটি গাছের সঙ্গে তার রশি পেঁচ লেগে গেছে। তারপর তাকে সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয়। একদা নবী করীম স. বললেন, একজন মহিলা মক্কায় কুরাইশদের লিখিত একটি পত্র নিয়ে দুশমনদের কাছে যাচ্ছে। মহিলাটির সমস্ত আলামত জানিয়ে দিয়ে রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা পত্রটি উদ্ধার করে আনো। হজরত আলী রা. দু একজন সাথী সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নবী করীম স. যে স্থানের কথা বলে দিয়েছিলেন, তাঁরা তাকে সেখানেই পেয়ে গেলেন। হাদীছের পুস্তকে এই ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। সুরা মুমতাহেনাহ নাযিল হওয়ার পটভূমি এটাই।

নবী করীম স. আপন চাচা হজরত আব্বাস রা. এর ওই সম্পদের খবর বলে দিয়েছিলেন, যা তিনি বদর যুদ্ধে আসার সময় তাঁর স্ত্রী উম্মুল ফজলের নিকটে দিয়ে এসেছিলেন। সেই সম্পদের খবর তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানতো না। এই ঘটনার পর হজরত আব্বাস রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বিস্তারিত বর্ণনা বদর যুদ্ধের বিবরণে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

হজরত সায়াদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. একসময় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মনে হচ্ছিলো, তিনি বাঁচবেন না। কিন্তু নবী করীম স. তাঁকে দেখে বলেছিলেন, সম্ভবত তুমি রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। তোমার দ্বারা একটি কওম উপকার লাভ করবে। আর আরেকটি কওম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ তোমার দ্বারা মুসলমানদের লাভ হবে, আর কাফেরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একথায় তাঁর দীর্ঘজীবন লাভের সুসংবাদ রয়েছে। আশারা মুবাশ্শারাগণের মধ্যে তিনিই সকলের শেষে ইনতেকাল করেছিলেন। পঞ্চাশ বা সাতান্ন অথবা কারও মতে আটান্ন হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়েছিলো।

উমাইয়া ইবনে খালফ সম্পর্কে বলেছিলেন, সে আমার হাতে মারা যাবে। উতবা ইবনে আবু লাহাব সম্পর্কে বলেছিলেন, আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রাণী তাকে ভক্ষণ করবে। তাকে বাঘে খেয়েছিলো।

বদর যুদ্ধের সময় স্থান চিহ্নিত করে তিনি বলে দিয়েছিলেন, অমুক অমুক কাফের অমুক অমুক স্থানে নিহত হবে। যুদ্ধশেষে দেখা গেলো, রসুলেপাক স. কর্তৃক চিহ্নিত স্থানে তারা মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

হজরত নাজ্জাশীর ইনতেকাল হলে রসুলেপাক স. বলেছিলেন, নাজ্জাশী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। সাহাবীগণকে নিয়ে তিনি চার তকবীরের সাথে তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেছিলেন। ফিরোজ দায়লানী পারস্যের বাদশাহ্র দূত হয়ে এলে নবী করীম স. তাকে বলেছিলেন, বাদশাহ্র মৃত্যু হয়েছে। ফিরোজ দায়লানী পরে একথা সত্য জানার পর মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। হজরত আবু যর গিফারী রা. কে বলেছিলেন, মদীনার লোকেরা তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের করে দেবে।

হজরত আবু যর গিফারী রা. একদিন মসজিদে নববীতে শুয়েছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে বললেন, হে আবু যর! সেদিন তোমার কী অবস্থা হবে যেদিন লোকেরা তোমাকে এই মসজিদ থেকে বের করে দেবে।

তিনি বললেন, তাহলে আমি মসজিদে হারামে আশ্রয় নেবো। তিনি বললেন, সেখান থেকেও যদি বের করে দেয়। হাদীছের শেষের দিকে রয়েছে, নবী করীম স. বললেন, এমতাবস্থায় তোমাকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হবে এবং ওই অবস্থায়ই তোমার ইনতেকাল হবে।

হজরত আবু যর গিফারীর অন্তিম জীবনের ঘটনা আবু যর অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

নবী করীম স. একদিন হজরত সারাকাহ রা.কে বলেছিলেন, সেদিন তোমার মানসিক অবস্থা কেমন হবে, যেদিন তুমি পারস্যের বাদশাহ্‌র হাতের স্বর্ণের চুড়ি পরিধান করবে।

হজরত ওমর রা. এর খেলাফতের সময় পারস্যবিজয় হলো। গনিমতের মালের মধ্যে বাদশাহ্‌র স্বর্ণের চুড়ি দুটিও ছিলো। হজরত ওমর ফারুক রা. হজরত সারাকাহ রা. এর হাতে স্বর্ণের চুড়ি দুটি পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ্‌তায়ালার, যিনি পারস্যের বাদশাহ্‌র স্বর্ণের চুড়ি পরিয়ে দিলেন সারাকাহর হাতে।

দজলা ও দজীলের মধ্যবর্তীস্থানে এক শহর আবাদ হবে বলেও তিনি খবর দিয়েছিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক বাগদাদ নগরী গড়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেছিলেন, আমার এই উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির জন্ম হবে। তার নাম হবে ওলীদ। উম্মতের মধ্যে সে একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তি হবে। হবে এই উম্মতের ফেরআউন। তিনি স. আরও বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত হবে না, যতক্ষণ না দুটি দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হবে একই দাবি নিয়ে অর্থাৎ উভয়েরই দাবী হবে ইসলাম।

উলামা কেরাম বলেন, নবী করীম স. এর দ্বারা সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবীর মতে ইসলামে আকস্মিকভাবে সেই অভ্যন্ত রীণ দুর্যোগ নেমে এসেছিলো। ইমাম কুরতুবীর মতে, রসুলে করীম স. এর পর সর্বপ্রথম দুর্ঘটনা ছিলো হজরত ওমর রা. এর শাহাদত। রসুলে করীম স. এর দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর ওহীর ধারা বন্ধ হলো। সাথে সাথে আরব ও অন্যান্য অঞ্চলে মুরতাদ হওয়ার ফেতনা সৃষ্টি হলো। হজরত ওমর রা. এর শাহাদতের মাধ্যমে সে ফেতনার তরবারী কোষমুক্ত হয়ে গেলো। তারপর হজরত ওছমান রা. শহীদ হলেন।

সুহায়ল ইবনে আমর কুরাইশদের একজন সরদার ছিলেন। তিনি ছিলেন সুবক্তাও। তিনি নবী করীম স. এর সাহাবা কেরামের নিন্দাবাদ করতেন, তাঁদেরকে গালিগালাজ করতেন। বদর যুদ্ধে তাকে বন্দী করা হলে হজরত ওমর ফারুক রা. বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এর দাঁতগুলো ভেঙে দেই।

একথা শুনে রসুলেপাক স. বললেন, হে ওমর! অচিরেই সে এমন অবস্থায় পৌঁছবে, যা দেখে তুমিও খুশি হয়ে যাবে। সেরকমই হয়েছিলো। তিনি ইসলাম গ্রহন করে মক্কা মুকাররমাতেই বসবাস করতে লাগলেন। অতঃপর রসুলেপাক স. এর ওফাত ও হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর খেলাফত লাভের খবর যখন মক্কায় পৌঁছলো, তখন তিনি

বিশেষ ভাষণ দিয়ে মুসলমানদের মনে শান্তি ও দৃঢ়তা এনে দিয়েছিলেন। সেই ভাষণের মাধ্যমে তিনি তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন।

হজরত ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শামাস রা. কে বলেছিলেন, এতোদিন তো নিরুপদ্রব জীবন অতিবাহিত করলে, এখন শাহাদতের জন্য প্রস্তুতি নাও। তিনি ভণ্ড নবী মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইয়ামামাতে শহীদ হয়েছিলেন।

নবী করীম স. হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ রা.কে উকায়দার নামক এক নাসারার কাছে পাঠিয়ে বললেন, তুমি তাকে নীল গাভী শিকারে দেখতে পাবে।

রসুলেপাক স. এরকম বহু অদৃশ্য বিষয় ও ভবিষ্যতের খবর প্রদান করেছেন। মুনাফেকদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন। মুমিনদের ব্যাপারেও বলেছেন যা তাঁদের জীবদ্দশায় সাংঘটিতব্য ছিলো। আবার তাঁদের ওফাতের পর যা ঘটবে, সে সব ব্যাপারেও তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন।

আরেকটি ঘটনাঃ রসুলেপাক স. কে লাবীদ ইবনে আসাম নামক এক ইহুদী যাদু করেছিলো। রসুলেপাক স. এর মাথার চুলে গিরা লাগিয়ে সে যাদু করেছিলো। তিনি স. তার নাম ধাম ও যাদুর উপাদান ও তার অবস্থান, সবকিছুই বলে দিয়েছিলেন।

আখেরী জামানায় উম্মতের মধ্যে মন্দ কাজের প্রসার ঘটবে। এ সম্পর্কে তিনি স. বলেছেন, আমানতদারী থাকবে না। শয়তানের শিঙ বের হবে। খেয়ানত ব্যাপকতর হবে। সমসাময়িকদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষের জন্ম হবে। পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে। নারীদের সংখ্যা বাড়বে। সম্পদ কমে যাবে। ফেতনা বৃদ্ধি পাবে। মানুষে মানুষে মিল থাকবে না। ভূমিকম্প হবে এবং হেজায থেকে অগ্নি বের হবে। এ সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে তারিখে মদীনা মুআযযামা গ্রন্থে।

কিয়ামতের আলামত, হাশর নশর, কিয়ামত ও আখেরাতের অন্যান্য ভয়াবহ বিষয়াদি সম্পর্কে তিনি যা বলে গেছেন, সেগুলো লিপিবদ্ধ করলে তো একটি স্বতন্ত্র পুস্তকই হয়ে যাবে। এখানে তাঁর নবুওয়াত, নবুওয়াতের সত্যতা এবং মোজেজা প্রকাশের সাথে সম্বন্ধিত বিষয়গুলোরই অবতারণা করা হয়েছে। সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

নবী করীম স. কে আল্লাহ্তায়ালার হেফাজত প্রদান

নবী করীম স. এর মাধ্যমে যে সমস্ত মোজেজা প্রকাশ পেয়েছে তার অন্যতম একটি দিক হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে হেফাজত ও নিরাপত্তা লাভ। দ্বীনের দুশমনদের কৌশল ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সর্বোতভাবে হেফাজত করেছেন। নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার দিয়ে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে মানুষের ক্ষতিসাধন থেকে হেফাজত করবেন। আরও এরশাদ করেছেন, আপনি আপনার প্রভুপালকের হুকুমের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করুন, কেনোনা আপনি আমার দৃষ্টির সম্মুখে।

আরও এরশাদ করেছেন, যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য ইলাহ সাব্যস্ত করে, তাদের মোকাবেলায় আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট। আরও এরশাদ করেছেন, ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন কাফেরেরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো। দ্বীনের দুশমনেরা যখন

নবী করীম স. এর ক্ষতিসাধন করার জন্য নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছিলো, তখন তিনি নিজে সাবধানে চলাচল করতেন এবং সাহাবা কেরামও তাঁকে পাহারা দিয়ে রাখতেন। কিন্তু যখন 'আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে মানুষের ক্ষতি সাধন থেকে হেফাজত করবেন' এই আয়াত নাযিল হলো, তখন তিনি তাঁবু থেকে বের হয়ে পাহারায় নিয়োজিত সাহাবীদেরকে বললেন, এখন থেকে আমাকে পাহারা দিতে হবে না। তোমরা চলে যাও। আমার আল্লাহ্তায়ালাই আমার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. একদিন কোনো এক সফরে একটি গাছের নীচে শায়িত ছিলেন। তাঁর পবিত্র অভ্যাস এরকম ছিলো যে, কোনো স্থানে পৌঁছলে সাহাবা কেরাম সেখানকার কোনো একটি বৃক্ষ নির্বাচন করতেন, রসুলেপাক স. যেনো তার নীচে শুয়ে দুপুরের নিদ্রা যাপন করতে পারেন। সেই অভ্যাস মোতাবেক তিনি উক্ত গাছের নীচে শুয়েছিলেন। হঠাৎ এক বেদুইন এসে তলোয়ার উঁচিয়ে বললো, তোমাকে এই মুহূর্তে আমার হাত থেকে বাঁচাবে কে? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্! একথা শুনে বেদুইন লোকটি কাঁপতে শুরু করলো। তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেলো। তখন 'আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে মানুষের ক্ষতি থেকে হেফাজত করবেন' এই আয়াত নাযিল করলেন।

রসুলেপাক স. বেদুইন লোকটিকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। লোকটি তার কাওমের কাছে ফিরে গিয়ে বলেছিলো, আমি এক উত্তম কাওমের নিকট থেকে এসেছি। অন্য এক হাদীছে এই ঘটনাই এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, রসুলেপাক স. বেদুইন লোকটির হাত থেকে তলোয়ার নিয়ে বললেন, বলো দেখি, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে? বেদুইনটি তখন রসুলেপাক স. এর কদম মোবারকে লুটিয়ে পড়েছিলো। বদরযুদ্ধের আলোচনাতেও এরকম এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। রসুলেপাক স. প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে সাহাবা কেরামের কাছ থেকে বেশ দূরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করছিলো এক মুনাফেক। পরের ঘটনা উপরোক্ত বর্ণনার অনুরূপ।

গাতফান যুদ্ধের দিনও এরকম ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কথা আছে। ঘটনাটি এই যে, হামলাকারী নওজোয়ানটি তার কওমের একজন বাহাদুর নেতাও ছিলো। পরে সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। মুসলমান হয়ে সে তার কওমের কাছে ফিরে যাওয়ার পর লোকেরা তাকে বললো, তোমার কী হলো। তুমি তাকে হত্যা করে ফেলবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আর তা তোমার পক্ষে সম্ভবও ছিলো, কিন্তু করলে না কেনো?

সে বললো, শুভ্রবর্ণের দীর্ঘকায় একটি লোককে দেখলাম। সে আমাকে আঘাত করলো। ফলে আমি পিছনের দিকে পড়ে গেলাম এবং আমার হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে গেলো। আমি বুঝলাম, যাকে দেখেছি সে মানুষ নয়, ফেরেশতা। তাই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।

অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, লোকটি তলোয়ার খাড়া করে যখন আক্রমণোন্মুখ হলো, তখন রসুলেপাক স. দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তোমার যদি মর্জি হয়, এর ক্ষতি থেকে আমাকে হেফাজত করো। লোকটির কোমরে ব্যথা আরম্ভ হলো এবং এক পর্যায়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তখন আল্লাহ্তায়ালা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করলেন।

আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ করেছেন, হে ইমানদারগণ! স্মরণ করো, যখন আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের উপর নেয়ামত বর্ষণ করছিলেন, সে সময় একটি কওম তোমাদের উপর তাদের হাত সম্প্রসারিত করেছিলো। এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ্তায়ালা মুমিনদেরকে সম্বোধন করেছেন। কেনোনা, রসুলেপাক স. এর লাভ বা ক্ষতি প্রকৃতপ্রস্তাবে মুমিনদের লাভ ক্ষতিরই নামান্তর।

আবু লাহাবের স্ত্রীর (লানাতুল্লাহ আলাইহা) নাম ছিলো উম্মে জামিলা। তার পিতার নাম ছিলো হারব। সে ছিলো হজরত আবু সুফিয়ানের বোন। হাম্মা লাতাল হাত্বব বা কাষ্ঠবহণকারিণী। নানা কটুক্তির মাধ্যমে সে নবী করীম স. এর মনে কষ্ট দিতো।

একদা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, উম্মে জামিলা আসছে। নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! মহিলাটি বড়ই বেহায়া, বেআদব এবং কটুভাষিণী। এখান থেকে চলে গেলে ভালো হয়।

রসুল স. বললেন, সে আমাকে দেখতেই পাবে না। উম্মে জামীলা এসে বললো, হে আবু বকর! তোমাদের নেতা আমার বদনাম করেছে। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বললেন, আমাদের নেতা কবিতাও বলেন না, কারও দোষও বলেন না। মালাউন রমণী ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলো। রসুলেপাক স. সেখানেই ছিলেন, কিন্তু সে দেখতে পায়নি। নবী করীম স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা একজন ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন, সে আমাকে তার পাখা দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলো। ইমাম বোখারী র. বলেন, তখন ওই দুষ্ট রমণীর হাতে একটি পাথর ছিলো। সে বলেছিলো, মোহাম্মদকে দেখতে পেলে এই পাথরের আঘাতে তার মুখ..... নাউযুবিল্লাহ।

আশশেফা কিতাবে আছে, মুগীরা গোত্রের এক ব্যক্তি রসুলেপাক স. কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এসেছিলো (নাউযুবিল্লাহ)। সে দুচোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিলো। রসুলেপাক স. এর কথা সে শুনছিলো, কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলো না। সে তার কওমের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও দেখতে পায়নি।

হিজরতের প্রাক্কালেও এরকম ঘটনা ঘটেছিলো। রসুলেপাক স. দলের ভিতর থেকে বাইরে চলে গেলেন। লোকদের সঙ্গে কথা বললেন। তাদের সামনে দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পেলো না। দেখে থাকলেও চিনতে পারলো না। তাদের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করার ঘটনা এক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছিলো। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা যথাস্থানে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেছেন, এক রাতে আমি আবু জাহাস ইবনে হুযায়ফার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলাম এবং দুজন একমত হলাম যে, আমরা রসুলুল্লাহ স. কে হত্যা করবো। এই উদ্দেশ্যে আমরা যখন তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন তাঁকে আল হাক্কাহ সুরা তেলাওয়াত করতে শুনলাম। আবু জাহাস আমার বাহুতে হাত রেখে বললো, আমাদের তো বাঁচতে হবে। তারপর আমরা দুজনে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম এবং আপাততঃ হত্যার চিন্তা স্থগিত রাখলাম। হজরত ওমর রা. এর এই ঘটনা তাঁর ইসলাম গ্রহণের সূচনা সৃষ্টি করেছিলো। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাতো এক বিস্ময়কর ঘটনা। তার বর্ণনা যথাস্থানে করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

নবী করীম স. যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন, তখন কুরাইশরা যারাকা ইবনে খাসআম নামক জনৈক ব্যক্তিকে রসুলেপাক স. এর অন্বেষণে পাঠিয়ে দিলো। তাঁকে যেখানেই পায়, যেনো ধরে নিয়ে আসে। লোকটি রসুলেপাক স. এর কাছাকাছি পৌঁছলে তার ঘোড়াটির পা মাটিতে দেবে গেলো।

রসুলেপাক স. তার জন্য দোয়া করলে ঘোড়ার পা মাটি থেকে বের হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সেখান থেকে ফিরে এলো। অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, হিজরতের সময় এক কুরাইশ রসুলেপাক স. এবং হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. কে দেখে ফেললো। লোকটি সংবাদ বলার জন্য দৌড়ে গেলো কুরাইশদের কাছে। কিন্তু মক্কা মুকাররমায় পৌঁছলে, তার মন থেকে উক্ত খেয়াল দূর হয়ে গেলো। কী উদ্দেশ্যে সে মক্কা অভিমুখে দৌড়ে এসেছিলো তা বিলক্ষণ ভুলে গেলো। শত চেষ্টাতেও সে কথা আর স্মরণে আনতে পারলো না। অবশেষে বাধ্য হয়ে ঘরে ফিরে গেলো।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও অন্যান্যগণ বলেছেন, একদিন রসুলে করীম স. সেজদায় ছিলেন। মালাউন আবু জাহেল হাতে করে একটি পাথর নিয়ে এলো। দ্বিতীয় আরেক মালাউন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। পাথর মেরে নবী করীম স.কে দুনিয়া থেকে বিদায় করার জন্য উদ্যত হলো সে। কিন্তু পাথর তার হাতে আটকে গেলো। হাত দুটি হয়ে গেলো শক্তিহীন। ফলে সে কিছুই করতে পারলো না। অগত্যা সে যখন মোড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে চললো, তখন রসুলেপাক স. দোয়া করলে তার হাত থেকে পাথর খসে পড়লো।

একবার আবু জাহেল একটি অত্যন্ত বড় উট দেখতে পেলো। এতো বড় উট সে আর কখনও দেখেনি। মুসলমানদের উট মনে করে তাকে ধরে যবেহ করে খেয়ে ফেলবে বলে সে মনস্থির করলো। কিন্তু ভয়ে তার কাছেই যেতে পারলো না। রসুলেপাক স. বলেন, উটের আকৃতিতে ছিলেন জিব্‌রাইল। কেউ তার কাছে গেলে নির্ঘাত মরতো।

একবার এক বদবখত ব্যক্তি একটি দেয়ালের উপর দাঁড়িয়েছিলো। রসুলেপাক স. নীচে দাঁড়িয়েছিলেন। লোকটি গম পিষবার চাক্কির এক অংশ উঠিয়ে রসুলেপাক স. এর মাথার উপর ফেলে দিতে উদ্যত হলো। কিন্তু ব্যর্থ হলো। কিছুই করতে পারলো না। রসুলেপাক স. স্বাভাবিকভাবে হেঁটে হেঁটে মদীনা শরীফের দিকে চলে গেলেন।

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, আবু জাহেল কুরাইশদের সঙ্গে এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলো যে, আমি যদি মোহাম্মদকে নামাজের মধ্যে পাই তবে নামাজরত অবস্থায় তার গর্দান পিষ্ট করবো। রসুলেপাক স. নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলে বদবখত্ লোকেরা আবু জাহেলকে খবর দিলো। খবর পেয়ে আবু জাহেল এলো। রসুলেপাক স. এর কাছে যেতে না যেতেই দুহাত থেকে কী যেনো সরাতে সরাতে দৌড়ে সেখান থেকে পালালো সে। লোকেরা এরকম করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো, নিকটে যেতেই আগুনের একটি গর্ত দেখতে পেলাম। দেখলাম, আমি যেনো সেই গর্তের ভিতর পড়ে যাচ্ছি। ভয়ানক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ। মনে হলো, সারা পৃথিবী থেকে সেই ভয়ানক আওয়াজ বের হচ্ছে।

রসুলেপাক স. বলেছেন, ওসব ছিলো ফেরেশতা। আবু জাহেল আরও কাছে গেলে তার দেহের জোড়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। তাকে টুকরা টুকুরা করে ফেলা হতো। তখন এই আয়াত নাযিল হয়েছিলো 'কক্ষণও নয় .... নিঃসন্দেহে মানুষ অবাধ্য।' বর্ণিত আছে, শায়খা ইবনে ওছমান জাদবীর কওম বাইতুল্লাহ শরীফের দারোয়ান ছিলো। কাবা গৃহের চাবি তাদের কাছেই থাকতো। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উক্ত শায়খা রসুলেপাক স. এর উপর হামলা করতে উদ্যত হয়ে বলতে লাগলো, আমার বাপ চাচাকে মোহাম্মদের চাচা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব মেরেছিলো। আজ তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবো মোহাম্মদের উপর! তার চাচা হামযা আমার বাপ চাচা দুজনের উপর অত্যাচার করেছিলো। সেই দুজনের অন্যায়ের প্রতিশোধ একজন থেকে উসুল করে নেবো। একথা বলে সেই নির্বোধ যখনই তরবারী উত্তোলন করলো, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দিতে দিতে সেখান থেকে দৌড়ে পালালো। সে বলেছে, আমি রসুলুল্লাহ্‌র কাছে গেলে দেখতে পেলাম, আগুনের একটি উল্কাপিণ্ড আমার উপর পড়ছে। তাই দেখে ভয়ে পালিয়ে আসি।

হজরত ফুযালা ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, মক্কাবিজয়ের সময় রসুলেপাক স. যখন তওয়াফে রত ছিলেন, তখন আমার মনে হয়েছিলো, তাঁকে শহীদ করে দেই। আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। তিনি বললেন, হে ফুযালা! মনে মনে তুমি কী ভাবছিলে? তুমি আল্লাহ্‌র রসুলকে শহীদ করে দিতে চেয়েছিলে, না? আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি এরকম চাইনি। রসুলেপাক স. আমার কথা শুনে মৃদু হাসলেন। আমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন এবং তাঁর পবিত্র হাতখানা আমার বুকে রাখলেন। মনে বড়ই প্রশান্তি অনুভব করলাম। আল্লাহ্‌র কসম! তাঁর হাতখানা বুকের উপর থেকে সরিয়ে নেয়ার আগেই, আমার মনে হলো, তাঁর চেয়ে প্রিয়জন পৃথিবীতে নেই।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে আমের ইবনে তুফায়ল ও আরবাদ ইবনে কায়সের ঘটনা। আমের আরবাদকে বললেন, আমি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মোহাম্মদের মনোযোগ তোমার দিক থেকে সরিয়ে আমার দিকে নিয়ে আসবো। তুমি তখন তলোয়ার দিয়ে অতর্কিতে তাঁর উপর হামলা করে বসবে। কিন্তু আমের দেখলেন, আরবাদ নির্বিকার বসে আছে। কিছুই করছে না। সেখান থেকে বের হওয়ার পর আমের আরবাদকে জিজ্ঞেস করলেন, আক্রমণ করলেনা কেনো।

আরবাদ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যখন তাঁকে আক্রমণ করার খেয়াল করলাম, তখন সেখানে তোমাকেই দেখতে পেলাম। এ অবস্থায় আক্রমণ করলেতো তোমাকেই হত্যা করতাম। আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ থেকে রসুলেপাক স. কে হেফাজত করার ঘটনা এতো বেশী যে, ইহুদী গণকেরাও কুরাইশদেরকে এ ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করতো। রসুলেপাক স. একদিন কুরাইশদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলবে এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারও করে দিতো এবং সেজন্য তাঁকে সময় থাকতেই দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করতো। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা সবসময়ই তাঁর হাবীব স. কে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছেন। দুশমনদের পক্ষ থেকে ক্ষতির আঁচ তাঁর গায়ে লাগতে

দেননি। এই মর্মে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'কাফেরেরা চায় আল্লাহ্র নূরকে ফুৎকারে নির্বাপিত করে দিতে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূরের পূর্ণতা প্রদানকারী। কাফেরেরা যদিও একে অপছন্দ করে।'(৬১ঃ৮)

রসুলেপাক স. এর এলেম ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ্তায়ালা রসুলেপাক স. এর পবিত্র ও পূর্ণ সত্তার মধ্যে উজ্জ্বল মোজেজা, সুস্পষ্ট নিদর্শন, এলেম ও মারেফতের ভাণ্ডার জমা করেছেন এবং ওই সকল বৈশিষ্ট্য ও পরিপূর্ণ আদর্শ দ্বারা তাঁকে বিশেষিত করেছেন। দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ ও মারেফতে এলাহী দ্বারা যা সমৃদ্ধ, যাকে শরীয়তের আহকাম, দ্বীনের ভিত্তি, রাষ্ট্রীয় শাসন এবং আপামর মানুষের কল্যাণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে অবহিত করেছেন পূর্ববর্তী উম্মতগণের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে, তাদের শরীয়ত, কিতাব, জীবনচরিত, ব্যক্তিগত কর্মধারা, তাদের মাযহাব ও মারেফত সম্পর্কে। দীর্ঘায়ু লাভকারী ব্যক্তিবর্গের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা সম্পর্কে, প্রত্যেক উম্মত কাফেরদের উপর যে দলীল প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেছে, আহলে কিতাবদের বিভিন্ন দল যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে সে সমস্ত বিষয়ে। যারা এলেম এবং রহস্যের কথা ও খবরসমূহ গোপন করেছে, যে সমস্ত জিনিস তারা পরিবর্তন করে ফেলেছে সে সমস্ত ব্যাপারেও আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে আরও এলেম দান করেছেন আরবদের ভাষা সম্পর্কে, দুষ্প্রাপ্য শব্দ ও তার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে, ফাসাহাত বালাগত সম্পর্কে, উপমা উদাহরণ দেয়া, বিশুদ্ধ প্রবাদ বলা ও তার মর্মার্থ উদ্ধার করা এবং প্রজ্ঞাময় বাণী চয়ন ইত্যাদি বিষয়ে। তাঁর পবিত্র শরীয়তে সুন্দর আখলাক, আদব, শালীনতা ও সৌজন্য, আত্মসংযমের নীতিমালা এসবের বর্ণনা রয়েছে, যা জ্ঞানীদের নিকট প্রশংসনীয়। এমনকি এসব বিষয় ওই সকল কাফের ও জাহেলদের নিকটও প্রশংসনীয়, যাদের মধ্যে রয়েছে সুস্থ চিন্তা ও ন্যায়পরায়ণতা। রসুলেপাক স. এর মধ্যে ছিলো জামেউল কালামের বিশেষত্ব। আবার সে জামে কালামও ছিলো বিভিন্ন বিষয়ের উপর। যেমন চিকিৎসা, ব্যবসা, ফারায়েয বা বণ্টন ব্যবস্থা ও হিসাব নিকাশ।

যে বিষয়গুলো সম্পর্কে বলা হলো, সেগুলোর জ্ঞান তো এমন একজন ব্যক্তির মধ্যেই থাকা স্বাভাবিক, যিনি শিক্ষার মধ্যে আত্মনিমগ্ন এবং যার রয়েছে বিভিন্ন পুস্তকাদি অধ্যয়নের অভ্যাস। অথবা যিনি শিক্ষিত লোকদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট চেষ্টা সাধনা করেছেন। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়াবলীর আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তিনি তো লিখতে বা পড়তে জানতেন না। লেখা পড়া জানা লোকদের সঙ্গে ওঠা বসাও করেননি। তিনি আপন কওম থেকে বাইরে কোথাও যানওনি যে, সে সুবাদে লেখাপড়া শিখে নিতে পারেন। আর আরবদের বিদ্যার দৌড় তো ছিলো সামান্যই। বংশধারা জানা, কিছু অতীত কাহিনী জানা এবং অতীত লোকদের কিছু কবিতার পঙ্ক্তি আওড়ানো পর্যন্তই ছিলো তাদের বিদ্যাবৃত্ত। এর বাইরে তারা তেমন কিছু জানতোও না। রসুলেপাক স. এর পরিপূর্ণ বিশাল জ্ঞানের তুলনায় সেগুলো কিছুই নয়।

নবী করীম স. এর নবুওয়াত ও রেসালতের দলীল ও আলামতসমূহের মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ রাহেব ও পাদ্রীদের স্বীকারোক্তি, তাদের ধারাবাহিক খবর, আহলে কিতাব আলেমদের নবী স. এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বর্ণনা, তাঁর উম্মতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বর্ণনা, তাঁর আলামত ও নিশানাসমূহের বর্ণনা। এসব ব্যাপারে হুলিয়া মোবারকের আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে।

মহরে নবুওয়াত ও অন্যান্য আলামত সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন পূর্ববর্তী কতিপয় তৌহিদবাদী কবি। যেমন কবি তুব্বা, সায়েম ইবনে সায়েদা এবং সায়েফ ইবনে এযীন প্রমুখ। কবি যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল তাঁর কবিতায় রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতের প্রশংসা করেছেন। এই কবিগণকে মুআহহেদায়ে জাহেলিয়াত অর্থাৎ জাহেলী যুগের তৌহিদবাদী বলা হয়। কবি ওয়ারাকা ইবনে নওফেলতো পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে নবী করীম স. এর খবর পেয়ে নির্জন ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে রসুলেপাক স. এর আলোচনা, ইহুদী আলেমদের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তাদের হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার পথ বেছে নেয়া সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। জ্বীনদের কাছ থেকে কথা শোনা গিয়েছিলো, মূর্তির মুখে কথা ফুটেছিলো, যবেহকৃত প্রাণীর মধ্যে এবং পাখির পেটের ভিতর তাঁর নাম মোবারক দেখা গিয়েছিলো, কবর ও পাথরের মধ্যে তাঁর রেসালতের সাক্ষ্যযুক্ত প্রাচীন লেখা পাওয়া গিয়েছিলো। এসব দেখার পর কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো— এসব ঘটনা দালায়েলুন নবুওয়াতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাছাড়াও তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সময় এবং বিভিন্ন সফর ও যুদ্ধের সময় যে সমস্ত আলামত ও নিশানা প্রকাশিত হয়েছিলো, তার বর্ণনা যথাস্থানে করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

নবী করীম স. এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অন্যতম একটি দিক হচ্ছে, জ্বীন ও ফেরেশতাদের দ্বারা তাঁকে সাহায্য প্রদান। জ্বীনেরা তাঁর আনুগত্য করেছে, বহু সাহাবী তা স্বচক্ষে দেখেছেন, যেমন বদর ইত্যাদি যুদ্ধে এরকম হয়েছে। এসবকিছু সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

যেমন একটি ঘটনা, জিব্‌রাইল আ. নবী করীম স. এর কাছে এলেন, ইমান, ইসলাম ও এহসানের অর্থ শিখানোর জন্য। জিব্‌রাইল আ. আকৃতি পরিবর্তন করে এসেছিলেন। সাহাবা কেরাম তাঁকে চাক্ষুষ দেখেছেন। তাছাড়া এক দিন হজরত ইবনে আব্বাস রা. ও হজরত ওছমান রা. হজরত জিব্‌রাইল আ.কে নবী করীম স. এর পাশে হজরত দাহিয়াতুল কালবী রা. এর আকৃতিতে বসে থাকতে দেখেছিলেন। তাঁর দেহের পোশাক ছিলো শাদা। কতিপয় সাহাবী দেখেছিলেন, ফেরেশতারা ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কতিপয় সাহাবী দেখেছেন, কাফেরদের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হচ্ছে।

হজরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছ রা. একদিন দেখতে পেলেন, শাদা পোশাক পরিহিত কিছু লোক শাদা কালো রঙের ঘোড়ার উপর বসে আছে। ঘোড়াগুলো রয়েছে আকাশ পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায়। ইমরান ইবনুল হুসাইন একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তাঁর সাথে ফেরেশতারা মুসাফেহা করেছিলেন। হজরত হামযা রা. রসুলেপাক স. এবং জিব্‌রাইল আ. কে কাবা শরীফের নিকট দেখেছিলেন। দেখে বেহুঁশ

হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. লাইলাতুল জ্বীনে এক জ্বীনকে দেখেছিলেন। জ্বীনদের কথাও শুনেছিলেন। এটাও রসুলেপাক স. এর মোজেজা।

কথিত আছে, হজরত মাসআব ইবনে ওমায়র রা. উহুদযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তখন এক ফেরেশতা তাঁর আকৃতি ধারণ করে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রেখেছিলেন। রসুলেপাক স. ডাক দিলেন, হে মাসআব! সামনে এসো। ফেরেশতা বললো, আমি মাসআব নই। নবী করীম স. তখন বুঝতে পারলেন, ইনি ফেরেশতা।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. বর্ণনা করেন, একদা আমি রসুল করীম স. এর খেদমতে হাজির ছিলাম। এক বৃদ্ধ এসে রসুলেপাক স. কে সালাম করলো। রসুলেপাক স. সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, জ্বীনের আওয়াজ মনে হচ্ছে। সালামের জবাব দেয়ার পর লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে বললো, আমি হাযা ইবনুল ইয়াম ইবনুল আকইয়াম ইবনে ইবলীস। হজরত নূহ আ. এর সঙ্গেও আমি সাক্ষাৎ করেছি। তারপর থেকে সমস্ত নবীগণের সঙ্গে মোলাকাত করে আসছি। রসুলেপাক স. তাকে কোরআনের সুরা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হজরত আবু হুরায়রা রা. একবার শয়তানকে দেখেছিলেন। ফেতরার কিছু মাল তাঁর দায়িত্বে দেয়া হয়েছিলো বণ্টনের জন্য। তিনি শয়তানকে তিন দিন দেখলেন সেই মালের কাছে। দৈনিকই সে কিছু কিছু মাল সেখান থেকে চুরি করে নিয়ে যেতো। রসুলেপাক স. তখন হজরত আবু হুরায়রাকে আয়তুল কুরসী শিখিয়ে দিলেন। আল্লামা ওয়াকেদী র. বলেন, হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রা. উয্যা মূর্তিটি ভেঙেছিলেন, তখন তার ভিতর থেকে কালো বর্ণের এক উলঙ্গ রমণী বেরিয়ে এসেছিলো। তার মাথার চুল অগোছালো ছিলো। হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রা. তরবারী দিয়ে তাকে দু' টুকরো করে ফেললেন। রসুলেপাক স. বলেছেন, এটাই হচ্ছে উয্যা শয়তান। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এর নামাজ নষ্ট করার জন্য এক শয়তান দৌড়াদৌড়ি করেছিলো। রসুলেপাক স. তাকে মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন এবং জ্বীন বশীকরণের সুলায়মানী দোয়া স্মরণ করেছিলেন। পরে অবশ্য শয়তানকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো।

মোজেজা সম্পর্কে আরও কিছু কথা

রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ জন্মক্ষণে, দুগ্ধপানের সময়ে, বাল্যকালে এবং নবুওয়াত প্রকাশের জামানায়, সমস্ত জীবনে যে সব মোজেজা প্রকাশ পেয়েছিলো, তার কিছু কিছু আলোচনা করা হলেও সমস্ত জীবনের সকল মোজেজার পুরো বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্তায়ালার মর্জি হলে যথাস্থানে আরও কিছুর আলোচনা করা যাবে। কাযী আবুল ফযল আয়াস মালেকী র. বলেন, রসুলেপাক স. এর উজ্জ্বল মোজেজাসমূহ থেকে এই অনুচ্ছেদে কিছু মোজেজার আলোচনা করবো, যা তাঁর সমগ্র মোজেজাসমূহের তুলনায় বিন্দুতুল্য। ওটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট। প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের পয়গম্বর সরওয়ারে কায়েনাত স. এর মোজেজাসমূহ অন্যান্য পয়গম্বরগণের মোজেজা থেকে অধিক পূর্ণ ও অধিক উজ্জ্বল। কোনো কোনো মোজেজা এমন যে, সেরকম মোজেজা অন্য কোনো পয়গম্বরকে দেয়াই হয়নি। অন্যান্য আম্বিয়া কেরামকে যত মোজেজা দেয়া হয়েছিলো,

আমাদের নবী স. এর মোজেজা হয় তার সমান, না হয় তার চেয়ে অধিক পূর্ণ। মোজেজাগুলোর মধ্যে কোরআন মজীদ অন্যতম। গোটা কোরআনই মোজেজায় ভরপুর। কোরআন মজীদ মোজেজা হওয়ার যতগুলো দিক রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সুরা ইন্না আ'ত্বইনাকাল কাউছার। কোরআন মোজেজা হওয়ার ব্যাপারে পূর্বে যা আলোকপাত করা হয়েছে, তা দুই ধরনের। প্রথমটি ফাসাহাত বালাগতের দিক দিয়ে। আর দ্বিতীয়টি ছন্দ ও মিলের দিক দিয়ে।

রসুলেপাক স. এর মোজেজাসমূহ অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের যাবতীয় মোজেজা থেকে বেশী— এই প্রসঙ্গে একটু আলোকপাত করা যাক। যে জামানায় যে বিদ্যা ও জ্ঞান অধিকতর পূর্ণ ছিলো, সে জামানার নবীকে সেই বিদ্যা বা জ্ঞানের আলোকেই মোজেজা দেয়া হয়। যেমন হজরত মুসা আ.কে সেই বিদ্যা বা জ্ঞানের আলোকেই মোজেজা দেয়া হয়েছিলো। তাঁর জামানায় বিদ্বানদের জ্ঞানের চূড়ান্ত ছিলো যাদুবিদ্যা। তাই আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসা আ. কে যাদুর মোজেজা দিয়েছিলেন। যাদুর উপর সে জামানার লোকদের পূর্ণ দখল রয়েছে বলে যখন তারা দাবি করলো, তখন হজরত মুসা আ. তাদের দাবিকৃত শক্তিকে ধ্বংস করে দিলেন।

হজরত ঈসা আ. এর জামানায় চিকিৎসাবিদ্যার যথেষ্ট মর্যাদা ও প্রভাব ছিলো। আর সে সময় চিকিৎসাবিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জনকারীরা গৌরববোধ করতো এবং দর্প প্রকাশ করতো। তাই ঈসা আ. এমন মোজেজা প্রদর্শন করলেন, যা ছিলো তাদের শক্তিবহির্ভূত। তিনি এমন কিছু পেশ করলেন, যার ধারণা ও কল্পনা তারা করতেই পারে না। যেমন মৃতকে জীবিত করা, অন্ধকে চক্ষুদান করা এবং কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করে দেয়া ইত্যাদি। অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের মোজেজাসমূহের অবস্থা এরকমই বুঝে নিতে হবে। সবশেষে সাইয়্যেদে আলম মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে প্রেরণ করলেন আল্লাহ্তায়ালা। তিনি যখন আবির্ভূত হলেন, তখন আরবদের মধ্যে চারটি বিদ্যা ছিলো প্রধান। ১. ফাসাহাত বালাগত ২. কবিতা, ৩. কাহিনী ৪. জ্যোতির্বিদ্যা।

আল্লাহ্তায়ালা রসুলেপাক স. এর উপর কোরআন নাযিল করলেন, যা উপরোক্ত চারটি বিষয়ের প্রকৃত রূপকার। কোরআনে করীম এমন ফাসাহাত বালাগত, সংক্ষেপণ রীতি, সূক্ষ্ম রচনাশৈলী ও বিস্ময়কর পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ ছিলো, যা ছিলো তাদের শৈলী বহির্ভূত। এর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি তারা। ধ্বনি ও ছন্দমিলের রীতি, ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিষয়ের সংবাদ প্রদান, গোপনভেদ ও অন্তর্জগতের বিষয় সম্পর্কিত বর্ণনা ইত্যাদি যেরকম কোরআনে করীমে বিবৃত হয়েছে, হুবহু তাই বাস্তবায়িত হয়েছে। এসকল দিক দিয়ে তাদের জাগতিক বিদ্যা ও জ্ঞান কোরআনের জ্ঞানের নিকটবর্তী হতে পারেনি। কোরআনের এ কৃতিত্বকে সকলেই নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছিলো। জ্যোতির্বিদ্যা বাতেল বলে স্বীকৃত হয়েছিলো। কেনোনা জ্যোতির্বিদ্যা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের একটি সত্য হলেও দশটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতো। যেসব শয়তান জ্যোতির্বিদদের কানে চুপিসারে খবর পৌঁছিয়ে দিতো, সে শয়তানদেরকে উল্কাপিণ্ড মেরে আকাশ থেকে বিতাড়িত করা হতো। কোরআন মজীদের মাধ্যমে অতীত জামানা, পূর্ববর্তী উম্মত ও নবীগণ, অতীতকালের ঘটনাসম্ভার ও অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের কাহিনী এমন এক ভঙ্গিমায় প্রকাশ করা হয়েছে, যা কোরআন

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ করতে পারেনি। তারপরও এই কোরআন মজীদ যাবতীয় মোজেজা সহকারে কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছে এবং থেকে যাবে, যাতে করে পরবর্তী সময়ের পৃথিবীর মানুষ কোরআনের অলৌকিকত্ব ও অবিসংবাদিতা নিয়ে চিন্তাগবেষণা করার প্রয়াস পায়।

পৃথিবীর প্রত্যেক যুগেই কোরআনে বর্ণিত বিজ্ঞপ্তিসমূহের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ফলে মানুষের ইমান উত্তরোত্তর সতেজ ও সজীব হয়েছে। প্রাপ্ত সংবাদ দৃশ্যমান ঘটনার সমতুল্য নয়। যা বলা হয়েছে, তা দৃশ্যমান হয়েছে। আর বিশ্বাসবৃদ্ধির ক্ষেত্রে চাক্ষুষ দর্শন যথেষ্ট প্রভাবশালী। এলমুল একীনের পাশে আইনুল একীন পাওয়া গেলে অন্তরের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়, যদিও সর্বাবস্থায়ই কোরআনের মাধ্যমে একীন সৃষ্টি হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী নবীগণের সমস্ত মোজেজা তাঁদের নবুওয়াতের সময়সীমা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের পয়গম্বর সরওয়ারে কায়েনাত স. এর মোজেজা শেষ হয়নি, বিচ্ছিন্ন হয়নি, অকার্যকরও হয়নি।

আমাদের পয়গম্বর সাইয়্যেদে আলম স. এর মোজেজাসমূহ স্থায়ী হওয়ার অন্যতম কারণ এই যে, তাঁর মোজেজা তাঁর উপর নাযিলকৃত ওহী বা আল্লাহ্‌র কালামের কারণে হয়েছে। কালাম স্থায়ী। তাই মোজেজাও স্থায়ী। যেহেতু কালাম আল্লাহ্‌তায়ালার, তাই তার মধ্যে কোনোরূপ কল্পনা, টালবাহানা, বিকল্প উপায় অবলম্বন এবং হেঁয়ালী কিংবা অযথার্থ উপমার অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়।

তিনি ব্যতীত অন্যান্য নবীগণের মোজেজার বেলায় দেখা যায়, বিরুদ্ধবাদী দুশমনেরা মোজেজা তলব করেছিলো। দুর্বল চিন্তা, খেয়াল অনুসারে যেরকম মোজেজায় অভিলাষী তারা হতো, সেরকম মোজেজাই তাদেরকে দেখানো হতো। যেমন ফেরাউনের যাদুকরেরা রশিকে সাপ বানিয়ে দিলো। সাপগুলো ময়দানে দৌড়াতে লাগলো। মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তারই অনুরূপ মোজেজা সৃষ্টি করে দিলেন হজরত মুসা আ. এর লাঠির মধ্যে। লাঠি অজগর সাপ হয়ে তাদের সাপগুলো খেয়ে ফেললো।

কোরআন নামক যে মোজেজা রসুলেপাক স. কে দেয়া হলো, তার মধ্যে যাদুর কোনো অবলম্বন নেই। তদুপরি কোরআনে করীমে নিছক কল্পনার প্রতিফলন এবং সাদৃশ্য বা অনুকরণেরও অবকাশ নেই। যেমন কোনো ব্যক্তির মধ্যে কবিত্বের অথবা বক্তৃতা প্রদানের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সে অন্য কবি বা বক্তার অনুকরণে চেষ্টাসাধ্য করে কোনো উপায় বের করে কবিতা রচনা করতেও পারে অথবা বক্তৃতা দিতে পারে। কিন্তু কোরআনে করীমের বেলায় এরকম হয় না। আহলে সুন্নাতওয়াল জামাতের বিশ্বাস এই যে, কোরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করা কারও ক্ষমতা ও সাধ্যের আওতাভূত নয়। হলে কেউ না কেউ সক্ষম হতো। এ সম্পর্কে মুতাযেলাদের মত এই যে, কোরআনের অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করা বান্দার ক্ষমতার অন্তর্ভূত। কিন্তু সে ক্ষমতা অনুসারে বান্দা যখন কিছু করতে উদ্যত হয়, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তার সাহস, শক্তি ও সংকল্প অকার্যকর করে দেন। ফলে সে অক্ষম হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত মতটিই যথার্থ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রোগীর সেবা

রসুলেপাক স. এর পবিত্র অভ্যাস ছিলো রোগী দেখা। কারো অসুস্থতার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি তাকে দেখতে যেতেন। রোগীর শিয়রে বসতেন। হাল অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন এবং রোগীর কপালে হাত রাখতেন। কখনও যন্ত্রণার স্থানে হাত রেখে তার অবস্থা কেমন তা জিজ্ঞেস করতেন। বিসমিল্লাহ্ শরীফ পাঠ করতেন। বিসমিল্লাহ্ শরীফ পাঠ করাও এক প্রকারের চিকিৎসা। এতে রোগীর দেহে প্রশান্তি ও আনন্দকর অনুভূতি সৃষ্টি হয়। রোগীর রোগমুক্তি এবং যন্ত্রণা লাঘবের ক্ষেত্রে আনন্দকর অনুভূতি, মানসিক প্রশান্তি ও সান্ত্বনা প্রদান ইত্যাদির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এর দ্বারা মনোবল বৃদ্ধি পায়, সাহস সঞ্চার হয়, আত্মপ্রত্যয় জন্মে এবং যন্ত্রণা দূর হয়। বিশেষ করে প্রিয়জন, বন্ধুবান্ধব ও বুযুর্গ লোকদের উপস্থিতি এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখে। আর এরূপ ক্ষেত্রে একটি প্রবাদ রয়েছে, বন্ধুর সাক্ষাৎ রোগমুক্তির ওসিলা। এক ইহুদী যুবক রসুলেপাক স. এর খেদমত করতো। হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। রসুলেপাক স. তার খোঁজখবর নেয়ার জন্য গেলেন। কাছে বসে সালাম দিলেন। আর এতে খুশি হয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেলো। রসুলেপাক স. বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি একে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ দান করলেন।

হজরত জাবের রা. বলেন, একবার আমি রোগাক্রান্ত হয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলাম। তখন রসুলেপাক এলেন এবং অজু করে অজুর পানির ছিটা দিলেন আমার শরীরে। তৎক্ষণাৎ আমার হুঁশ ফিরে এলো। আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমার মুখের উপর পানি ছিটিয়ে দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। রসুলেপাক স. বললেন, তোমরা রোগীর শুশ্রূষা করো। রসুলেপাক স. সাধারণভাবে সব রোগীর সেবা করার জন্যই বলেছেন।

আবার কেউ কেউ এ হুকুমকে আম হুকুম মনে করেন না। তাঁদের মতে চোখ উঠা, ফোঁড়া হওয়া এবং দাঁত ব্যথা এ তিনটি রোগ এ হুকুমের বাইরে। ইমাম বায়হাকীও এরূপ একটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত মতটিই বিশুদ্ধ। অর্থাৎ সকল রোগীর সেবা করার জন্য রসুলেপাক স. হুকুম করেছেন। শনিবার দিন রোগীর সেবা করা নিষেধ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এটিও ঠিক নয়। এই বর্ণনা সুন্নতের পরিপন্থী। এ খারাপ আচারটি আবিষ্কার করেছে এক ইহুদী চিকিৎসক।

এক বাদশাহ্ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। উক্ত বাদশাহ্ চিকিৎসককে হুকুম করলো, দিনরাত সবসময় তুমি আমার খেদমতে হাজির থাকবে। ইহুদী চিকিৎসক ফন্দীফিকির করে এই কঠিনদায়িত্ব থেকে একটু অব্যাহতি পেতে চাইলো। তাই সে কাল্পনিক কথাটি এক্ষেত্রে বিধানরূপে প্রকাশ করলো যে, শনিবার দিন কোনো রোগীর চিকিৎসা করা ঠিক নয়। আর তারপর থেকেই এটা মানুষের কাছে প্রচার হয়ে গেলো।

কেউ কেউ বলে থাকেন, শীতকালে রাতের বেলায় আর গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় রোগীর সেবা করা মোস্তাহাব। শীতকালে রাত লম্বা আর গ্রীষ্মকালে দিন লম্বা হয়ে থাকে। দ্বীনের দুশমন ও বাতিল ফেরকার লোকদের শুশ্রূষা করা মাকরুহ। তবে বিশেষ কঠিন

পরিস্থিতিতে তাদেরও সেবা করা মোস্তাহাব। এ ব্যাপারে বহু হাদীছ রয়েছে। তবে এ শ্রেণীর লোকদের শুশ্রূষা করার আদব মাসআলার কিতাবে রয়েছে।

জেনে রাখা দরকার, রোগ দুই প্রকারের। মনের রোগ এবং দেহের রোগ। মনের রোগের চিকিৎসা রসুল করীম স. এর বৈশিষ্ট্য। কেবল তিনি এবং তাঁর প্রকৃত অনুসারী ছাড়া অন্য কারও দ্বারা মনের রোগ সারানো সম্ভব নয়। দৈহিক রোগের চিকিৎসা করা অন্য লোকের পক্ষেও সম্ভব। তবে রসুলে করীম স. থেকে দৈহিক রোগের চিকিৎসাও পাওয়া যায়। তাঁর আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্তরের রোগের চিকিৎসা করা। দেহের বিষ থেকে বিষের প্রতিক্রিয়া যেমন বিভিন্ন ধরনের হয় এবং তার চিকিৎসাও বিভিন্নভাবে করা হয়ে থাকে, ঠিক তদ্রূপ গোনাহ্‌র ক্ষতি, ব্যাধি ও ক্ষতের সৃষ্টি হয় বিভিন্ন প্রকারের গোনাহ্‌র কাজ দ্বারা, আর তার দূরীকরণ প্রক্রিয়াও তদ্রূপ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বান্দা দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কিত যে সমস্ত ক্ষতি ও লোকসান দ্বারা আক্রান্ত হয়, তার অধিকাংশই গোনাহ্‌ ও নাফরমানির কারণে হয়ে থাকে। গোনাহ্‌র প্রতিক্রিয়া অন্তরের মধ্যেও পড়ে। দেহের মধ্যেও পড়ে। আর তার একাধিক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে, এলেম থেকে বিমুখ থাকা। কেনোনা এলেমের নূর গোনাহ্‌র তমসার সাথে মিশ্রিত হয় না। এমর্মে ইমাম শাফেয়ী র. এর শেরখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, আমি আমার উস্তাদের কাছে আমার স্মরণশক্তির ব্যাপারে অনুযোগ করলাম। তিনি উপদেশ দিলেন, গোনাহ্‌র কাজ বর্জন করো। আরও বললেন, জেনে রেখো, এলেম হচ্ছে এক প্রকার নূর। আর আল্লাহ্‌র নূর তো গোনাগাহ্‌রকে দেয়া হয় না। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, প্রকৃত রিযিক থেকে বঞ্চিত হওয়া। হাদীছ শরীফে এসেছে, বান্দার গোনাহ্‌র কারণে তাকে ওই রিযিক থেকে বঞ্চিত করা হয়, যা দ্বারা সে তাকওয়া অর্জন করতে পারে। তার পরিবর্তে সে তাকওয়াবিরোধী অধিক সম্পদ লাভ করে থাকে। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ ফরমান, গ্রামবাসীরা যদি ইমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের উপর আসমান ও যমীনের বরকতের দ্বারসমূহ খুলে দিতাম। এক্ষেত্রে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। যেমন বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক গোনাহ্‌গার লোক এক সময় যে ভিখারী ছিলো, সে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক গোনাহ্‌গার হওয়া সত্ত্বেও এখন বেশ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী। এর উত্তর এই যে, এহেন হুঁশিয়ারী তো উচ্চারণ করা হয়েছে ইমানদারদের জন্য। কাফেরদের জন্য নয়। তবে উপরোক্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারীদের জন্য রয়েছে মারাত্মক আশংকা। হতে পারে এমতাবস্থায় ইমানের বীজটি তাদের অন্তরের মাটিতে আর নেই। অথবা বাহ্যিকভাবে যা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে, প্রকৃত অবস্থা তা নয়। তারা একটি ধোঁকায় নিমজ্জিত রয়েছে। কেনোনা গোনাহ্‌র কারণে তাদের অন্তরে এক ধরনের তমসা এবং পাশবিকতার জন্ম হয়। ফলে তাদের প্রকৃত অনুভূতি লোপ পায়। কখনও কখনও এমন হয় যে, গোনাহ্‌র বদনসিবীর আলামত কৃষ্ণতা তাদের চেহারাতেও বিস্তার লাভ করে।

সঠিক অনুভূতিও ইমানের একটি শাখা। মন এবং দেহের অসুস্থতাও গোনাহ্‌র আলামতসমূহের মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া গোনাহ্‌র কাজ মানুষের হায়াতকেও কমিয়ে দেয়। যেমন ইবাদতের দ্বারা মানুষের হায়াত বাড়ে।

গোনাহ্‌র দ্বারা হায়াত কমে যায়— এর ব্যাখ্যা কেউ কেউ এভাবে করেছেন যে, এদ্বারা খায়ের ও বরকত কমে যায়। কেনোনা গোনাহ্ দ্বারা মানুষের জীবনে অখ্যাতি, বিবেকহীনতা, সুখ ও নেয়ামতবিচ্ছিন্নতা এবং হতভাগ্যতা ইত্যাদি নেমে আসে। যেমন মানুষের শারীরিক সুস্থতা এবং স্মৃতিশক্তির যথার্থতা বিরাজ করে গোনাহ্ এবং তার উপকরণাদি বর্জনের মাধ্যমে। অন্তরের অবস্থাও তদ্রূপ। অন্তরের বর্জন কার্যটি হাসিল হয় তওবার মাধ্যমে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে সরিয়ে রাখার মাধ্যমে।

হজরত আনাস রা. বলেছেন, নবী করীম স. একদিন বললেন, আমি কি তোমাদের যন্ত্রণা এবং তার ঔষধ সম্পর্কে বলবো না। তোমাদের যন্ত্রণা হচ্ছে তোমাদের গোনাহ্। আর তার ঔষধ হচ্ছে এসতেগফার। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায়, অন্তর্ব্যাধির পরিচিতি ও তার চিকিৎসা পাওয়া যাবে রসুলেপাক স. এর কাছ থেকেই। অন্তর্ব্যাধির পরিচিতি ও তার চিকিৎসা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার দিকেই ধাবিত হয়েছে। ওহীর মাধ্যমেও হয়েছে। যেমন সফর ও রুগ্নাবস্থায় রোজাভঙ্গ করার অনুমতি, ভয়, অসুস্থতা বা পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম করার বিধান ইত্যাদি শরীয়তের মাসআলাগুলো তার প্রমাণ। তাছাড়া যে সকল চিকিৎসা ওহীর মাধ্যমে জাহের হয়েছে, সেগুলোর অস্তিত্ব যদি রসুলে করীম স. এর অভিজ্ঞতা ও কিয়াস দ্বারাও ধরা হয় তবু তা সুদূরপরাহত হবে না। কেনোনা চিকিৎসা সাব্যস্ত করা, কারণ নির্ধারণ করা এগুলো তাওয়াক্কুলের (আল্লাহ্ নির্ভরতার) পরিপন্থী নয়। যেমন খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে ক্ষুধা ও পিপাসা দূর করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

অসুস্থ হলে চিকিৎসা করার বৈধতা রসুলেপাক স. এর অবস্থা দ্বারা প্রমাণিত। কেনোনা তিনি চূড়ান্ত তাওয়াক্কুলের সাথে ঔষধ ব্যবহার করতেন এবং রোগের কারণ ও উপসর্গের প্রতি খেয়াল রাখতেন। এ মর্মে রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এমন কোনো ব্যাধি সৃষ্টি করেননি, যার ঔষধ নেই। এক বর্ণনায় আছে, মৃত্যুরোগ ছাড়া সকল রোগের নিরাময় আছে। কোনো কোনো বর্ণনায় রোগের চিকিৎসা করারও হুকুম রয়েছে এবং সেখানে ইঙ্গিতও দেয়া হয়েছে যে, চিকিৎসা করার সময় আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম ও তকদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এবং ঔষধকেই একমাত্র রোগ নিরাময়কারী মনে করা যাবে না। তবে চিকিৎসা করার জন্য যে হুকুম রয়েছে, তা দ্বারা চিকিৎসা করা ওয়াজেব এটা বুঝায় না। এ ব্যাপারে সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে। বরং রোগের চিকিৎসা করা সুন্নত বা মোস্তাহাব। তকদীরে এলাহীর উপর ভরসা রাখলে চিকিৎসা করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী হবে না।

অবশ্য কোনো কোনো সময় অবস্থা বাস্তবায়ন ও মাধ্যম অর্জনের জন্য আসবাব বা চিকিৎসা বর্জনও করা যেতে পারে। এ কথার দিকে ইঙ্গিত করে রসুলেপাক স. এর এই হাদীছখানা, আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে। আর তারা হলো ওই সকল লোক, যারা রোগের চিকিৎসা করবে না এবং বদফালিতে বিশ্বাস করবে না। তারা আপন রবের উপর তাওয়াক্কুলকারী হবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তারা কাপড় পরিধান করবে না। হাদীছের ব্যাখ্যায় উলামা কেরাম বলেন, চিকিৎসার উপর তারা বিশ্বাস রাখবে না এবং তার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হবে না, আর বদফালির উপর কোনোরূপ বিশ্বাস রাখবে না। উত্তম কাপড় পরিধান করবে না। কোনো তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তি কী চিকিৎসা গ্রহণ করবে, এ মর্মে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে হজরত হারেছ ইবনে মাহাসেবী থেকে একখানা হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, চিকিৎসা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। কেনোনা এর অস্তিত্ব রসুলেপাক স. এর আমলের মধ্যে পাওয়া যায়। অতঃপর হজরত হারেছ রা.কে জিজ্ঞেস করা হলো, রসুলেপাক স. বলেছেন, যে ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করে এবং দেহের মধ্যে দাগ লাগায়, সে তাওয়াক্কুলের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়— এই হাদীছের তাৎপর্য তবে কী?

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এ হাদীছের তাৎপর্য এটাই, যা ওই হাদীছেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ চিকিৎসা গ্রহণ না করলে এবং দাগ না লাগালে বিনা হিসাবে সে বেহেশতে যাবে। আর করলে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, তাওয়াক্কুলের বিভিন্ন স্তর ও সোপান রয়েছে, যা একটি অপরটি থেকে উত্তম। সুতরাং চিকিৎসা গ্রহণ করলে উত্তম স্তর থেকে বের হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে তামহীদ কিতাবের লেখক বলেছেন, তাওয়াক্কুলের গণ্ডি বহির্ভূত তখনই ধরা হবে, যখন শরীয়তের চিকিৎসা গ্রহণ করা হবে না। আর দাগ লাগানোর ব্যাপারে যদি এরকম বিশ্বাস হয় যে, রোগমুক্তি এটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এমতাবস্থায় যদি সে আল্লাহ্র কুদরতের উপর থেকে বিশ্বাস নষ্ট করে দেয়, তখন সে তাওয়াক্কুলের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। আর যদি এই ধারণা রাখে যে, রোগমুক্তি আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকেই হয়ে থাকে, তাহলে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে। তার দলীল হচ্ছে কোরআনে পাক ও সুরা ফাতেহা দ্বারা চিকিৎসা করার রীতি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সামনে প্রদান করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

রোগমুক্তির জন্য গ্রহণযোগ্য আসবাব বা উপকরণ তিন প্রকার। ১. আসবাবে একীনিয়া যা আল্লাহ্তায়ালার বিধান। এগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া ওয়াজিব। যেমন খানা খাওয়ার সময় ভালো করে চিবিয়ে খাওয়া। পেয়ালায় মুখ লাগিয়ে চুমুক দিয়ে পানি পান করা। এ জাতীয় আসবাব পরিত্যাগ করার নাম তাওয়াক্কুল নয়। বরং পরিত্যাগ করলে গোনাহ্ হবে। ২. আসবাবে যন্নিয়া— অভিজ্ঞতার আলোকে যা বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত। এটাও তাওয়াক্কুলের অন্তর্গত। যেমন, গরম অবস্থায় শীতল ঔষধ এবং ঠাণ্ডা অবস্থায় গরম ঔষধ ব্যবহার করা। এ জাতীয় উপকরণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়াও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তবে হ্যাঁ, নফসের অবস্থা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে, মাকাম হাসিলের বেলায় এ জাতীয় উপকরণ বর্জন প্রশংসনীয় কাজ বটে। ৩. আসবাবে ওয়াহামিয়া— এটা একীনীও নয় যন্নীও নয়। অর্থাৎ এ জাতীয় আসবাব আল্লাহ্র বিধান বা অভিজ্ঞতা কোনোটির দ্বারাই সাব্যস্ত নয়। কেবল ধারণা এবং খেয়ালই এটাকে উপকরণ হিসেবে ধরে নিয়েছে। এ জাতীয় উপকরণ ব্যবহার করা সর্বসম্মতভাবে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী।

রসুলেপাক স. এর চিকিৎসা তিন প্রকারের ছিলো। ১. তবয়ী দাওয়া যা, উদ্ভিদ ও প্রাণীজ বস্তুর সাহায্যে করা হতো। ২. রূহানী দাওয়া যা, বিভিন্ন দোয়া, যিকির আযকার ও কোরআনের আয়াতের সাহায্যে করা হতো। ৩. মুরাক্কাব বা যৌগিক

যা উপরোক্ত দুপ্রকারের সংমিশ্রণে করা হতো। অর্থাৎ দোয়া এবং দাওয়া দুয়ের মাধ্যমেই করা হতো। কোরআন করীমের চেয়ে অধিক ব্যাপক, উপকারী এবং বড় কোনো চিকিৎসাই নাযিল করা হয়নি। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন কোরআন মজীদের কিছু অংশ মুমিনদের জন্য শেফা এবং রহমত। রূহানী ব্যাধির জন্য কোরআন মজীদ পরিপূর্ণ নিরাময়। এই ব্যাধি নষ্ট আকীদাগত হোক বা মন্দ স্বভাবজাত অথবা দুষ্কর্মই হোক। কোরআনে করীমে বিশুদ্ধ বিশ্বাস, প্রশংসানীয় চরিত্র এবং উত্তম আমলের সুস্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। এখন কথা হলো, দৈহিক ব্যাধির ক্ষেত্রে কোরআন করীম শেফা হতে পারে কেমন করে।

হ্যাঁ, দৈহিক রোগ ব্যাধি সারানোর জন্যও কোরআন করীম ভূমিকা রাখতে পারে। কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা বরকত ও প্রশান্তি হাসিল হয়, যা অনেক রোগ ও উপসর্গের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, অচেনা যাদুমন্ত্র ঝাড় ফুঁক যার অর্থ ও ভাব কিছুই বোধগম্য হয় না, তাও আবার ফাসেক ফাজের লোকেরা করে থাকে, যারা অপরিচ্ছন্নতায় নিমজ্জিত— তাদের এ ধরনের যাদুমন্ত্র ও ঝাড় ফুঁক দ্বারা উপকারও পরিলক্ষিত হয়। তাহলে কোরআনে করীম যার মধ্যে রয়েছে জালাল ও কিবরিয়া, আল্লাহ্‌তায়ালার নাম, বারী তায়ালার যাত ও সিফাতের নাম। তাও ব্যবহৃত হয় এমন লোকদের দ্বারা যারা পাক, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, যারা আযমত ও কামালিয়াতওয়ালা। আর স্বয়ং কোরআন মজীদ একটি জ্বলন্ত মোজেজা, তাহলে তার মাধ্যমে মানুষ আরোগ্য লাভ করবে না কেনো ?

নবী করীম স. বলেছেন, কোরআন দ্বারা যার রোগারোগ্য হয়নি, আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে নিরাময় করবেন না। হাদীছ শরীফে আছে, ফাতেহা শরীফ সকল রোগের দাওয়া। বিষাক্ত জানোয়ারের দংশনের বিষ, পাগল ও মূর্ছাগ্রস্ত লোকের ক্ষেত্রে সুরা ফাতেহার মাধ্যমে চিকিৎসা করা হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদুনা আলী মুর্তযা রা. এর হাদীছ যা ইবনে মাজা র. মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তাতে বর্ণিত হয়েছে, উত্তম দাওয়া হচ্ছে কোরআন মজীদ। তাফসীরে বায়যাবীর লেখক তাঁর উক্ত তাফসীর গ্রন্থ 'ওয়া নুনাযযিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফা' এবং এ জাতীয় আয়াতে করীমাকে রোগমুক্তির আয়াত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ যেমন মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া ইত্যাদিতে আয়াতে শেফা সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইমামে তরীকত আল্লামা আবুল কাসেম কুশাইরী র. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর একটি বাচ্চা রোগাক্রান্ত হয়েছিলো। তার রোগ এতো প্রকট আকার ধারণ করেছিলো যে, মৃত্যু প্রায় হয় হয়। তিনি বলেন, আমি তখন রসুল করীম স. কে স্বপ্নে দেখলাম। রসুলে করীম স. এর খেদমতে আমার বাচ্চার কথা বললাম। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি আয়াতে শেফা থেকে দূরে কেনো? আয়াতখানির আমল করে তার মাধ্যমে রোগমুক্তি চাচ্ছো না কেনো? আমি জেগে উঠলাম এবং এ ব্যাপারে চিন্তা করতে লাগলাম। গোটা কোরআন মজীদের ছয় জায়গায় আয়াতে শেফা পেলাম।

আয়াতে শেফা

وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ - وَشِفَاءٌ لِمَا فِيْ الصُّدُوْرِ-
يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ -
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ - وَاِذَا
مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ - قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًا وَّشِفَاءٌ -

আমি এ আয়াতসমূহ লিখে পানিতে ভিজিয়ে বাচ্চাকে পান করিয়ে দিলাম। আমার বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে গেলো। তার অবস্থা এমন হলো, যেনো রুগ্নাবস্থায় তার পায়ে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। আর আয়াতগুলো পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের বাঁধন খুলে গেলো। শায়েখ তাজুদ্দীন সুবকী র. যিনি শাফেয়ী মাযহাবের একজন বড় আলেম ছিলেন, তিনি বলেন, আমি বহু মাশায়েখকে রোগমুক্তির জন্য আয়াতে শেফার আমল লিখতে দেখেছি।

এই কিতাবের লেখকও শায়েখ আবদুল ওহাব মুত্তাকী র. কে উক্ত আমল করতে দেখেছেন। এক্ষেত্রে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে জেনে নেয়া দরকার যে, এ সমস্ত আয়াত বা দোয়া জিকির কি স্বয়ং নিরাময় করতে পারে? নাকি যোগ্যতার, আমল প্রদানকারীর শক্তি, হিম্মত এবং তার তাছির– এগুলো আমলের ক্ষেত্রে শর্ত? এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, শেফা লাভের মধ্যে তারতম্য হয়। অর্থাৎ কেউ শেফা পেয়ে থাকে, আবার কেউ পায় না। এক্ষেত্রে বুঝে নিতে হবে যে, এখানে আমল প্রদানকারীর তাছির বা হিম্মতের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। অথবা এখানে এমন কোনো শক্ত বাধা রয়েছে, যার কারণে আমল প্রদানকারীর শক্তি ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাছির হচ্ছে না। তবীয়ত যখন দাওয়াকে ভালোভাবে কবুল করে নেয় এবং হজম করে, তখন তার দ্বারা পূর্ণ ফায়দা হয়। তেমনি মন যখন শেফার দোয়া বা তাবীযকে পুরোপুরি গ্রহণ করে এবং আমল প্রদানকারীর তরফ থেকে হিম্মতও সুদৃঢ় হয়, তখন তার দ্বারা রোগ দূর করার বিশেষ আছর পাওয়া যায়। এভাবে রোগ দূর করা, বালা মুসিবত দূর করা এবং উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার ক্ষেত্রে দোয়া শক্তি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু কোনো কোনো সময় তার ক্রিয়া বিপরীত হয়ে থাকে। সেটা দোয়াকারীর নিজের দুর্বলতার কারণে হতে পারে।

যেমন কেউ দোয়া করছে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা এটা তার জন্য উত্তম বলে মনে করছেন না। হতে পারে তা কবুল হলে হক্কানিয়াত ও ইনসাফের সীমা থেকে সে বেরিয়ে যাবে। অথবা এমন দুর্বলতার কারণে হতে পারে, যা দোয়াপ্রার্থীর অন্তরে বিদ্যমান। যেমন দোয়ার সময় পূর্ণ মনোনিবেশ না করে খামখেয়ালির সাথে দোয়া করছে। অথবা এমনও কারণ থাকতে পারে যে, মকসুদ

হাসিলের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন হারাম খাওয়া। গোনাহ্র তমসা থাকা। অন্তরে অমনযোগিতা বা চপল চিন্তা ও কল্পনা দ্বারা হৃদয় ভরপুর থাকা ইত্যাদি।

হাদীছ শরীফে আছে, অনর্থক চিন্তা ও কাজের প্রতি মশগুল এবং জিকির থেকে গাফেল ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ্তায়ালা কবুল করেন না। দোয়া হচ্ছে বালা মুসিবতের দুশমন। দোয়া তার দুশমনকে দূর করে দেয়। সংশোধন করে দেয় এবং বালা মুসিবতের প্রতিবন্ধক হয়। বিপদ অবতীর্ণ হলে তাকে দূরীভূত করে। আর না হয় হালকা করে দেয়। দোয়া মুমিন ব্যক্তির হাতিয়ার।

যদি হুজুরে কলব এবং নিবিষ্টচিত্তে নির্দিষ্ট লক্ষ্যসহ, বিনয়, ভক্তি ও কাকুতিমিনতিসহ দোয়া করা হয়, পবিত্র হয়ে দুহাত তুলে তওবা এস্তেগফারের পর আল্লাহ্পাকের প্রশংসা ও দরূদ শরীফ আদায় করার পর আল্লাহ্তায়ালার যাতী ও সিফতী নামসমূহের ওসিলা দিয়ে রসুলেপাক স. এর তাওয়াজ্জুহের খেয়াল করে দোয়া করলে ওই দোয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে তীরের মতো। পূর্ণালোকিত দিবস, পূর্ণশক্তি সম্পন্ন বাহু, লক্ষ্যবস্তু সামনে এবং তার আদব ও শর্তও রপ্ত করা আছে– এ ধরনের তীরন্দাজের তীর যেমন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, উক্ত দোয়াকারীর দোয়াও তেমনি ব্যর্থ হয় না।

মুআওয়াযাত ইত্যাদি ও আল্লাহ্তায়ালার নামসমূহের দ্বারা আরোগ্য অন্বেষণ করাও এক প্রকারের সফল রূহানী চিকিৎসা, যদি তা একজন নেককার, পরহেজগার, মুত্তাকী লোকের মুখের উচ্চারিত হয় এবং পূর্ণ হিম্মত ও মনযোগের সাথে যদি আমল করা হয়। কিন্তু আজকাল এ ধরনের মানুষ বিরল, তাই মানুষ উক্ত রূহানী চিকিৎসা বাদ দিয়ে জিসমানী চিকিৎসার দিকে দৌড়ে যায়।

মুআওয়াযাত বলতে তাই বুঝায়, যা হাদীছ শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. 'কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক' এবং 'কুল আউযু বিরব্বিন্নাস' পাঠ করে নিজের উপর দম করতেন। কেউ কেউ অবশ্য কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ এবং কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুনকেও শামিল করেন। তাছাড়া মুআওয়াযাত কোরআনে করীমের ওই সকল আয়াতকে বলে যার মধ্যে 'আউযু' শব্দ রয়েছে।

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يُحْضَرُوْنَ -

উলামা কেরাম তিনটি শর্ত সাপেক্ষে শেফার দোয়াকে জায়েয মনে করেন। প্রথম শর্ত এই যে, দোয়া আল্লাহ্পাকের কালাম এবং তাঁর ইসিম ও সিফাত থেকে হতে হবে। চাই আরবী ভাষাতে হোক বা অন্য কোনো ভাষাতে। আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষা থেকে হলে তার অর্থ জানা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয় শর্ত, এরকম

ধারণা রাখতে হবে যে, এ দোয়ার মধ্যে প্রকৃত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী আল্লাহ্তায়ালা। তৃতীয় শর্ত, দোয়ার ফলাফল সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ও তকদীরের উপর নির্ভরশীল হতে হবে।

হাদীছ শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি রসুলেপাক স. কে জিজ্ঞেস করেছিলো, আমরা যে আমল, দোয়া, ওযীফা ইত্যাদি করে থাকি, এগুলো দিয়ে কি আমাদের তকদীরের কোনো পরিবর্তন হয়? তিনি স. উত্তর দিয়েছিলেন, হলে তকদীরে এলাহী অনুসারেই হয়। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হজরত আউফ ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা জাহেলী যুগের বিভিন্ন মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করতাম। আমরা এ সম্পর্কে রসুলেপাক স. কে বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনার মত কী? তিনি স. বললেন, তোমাদের মন্ত্রতন্ত্রগুলো আমার সামনে পেশ করো। তার মধ্যে মন্দ কথা না থাকলে পড়তে পারো।

বিচ্ছুর বিষ নিবারণের দোয়া

হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম স. মন্ত্র পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। এরপর কিছু সংখ্যক সাহাবী রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা একটি মন্ত্র জানি, যা বিচ্ছু দংশন করলে পাঠ করা হয় এবং আমরা এ মন্ত্র পাঠও করে থাকি। তারপর তিনি উক্ত মন্ত্র পাঠ করে শোনালেন। রসুলেপাক স. বললেন, এতে কোনো দোষ নেই, পড়তে পারো। তিনি আরও বললেন, তোমরা যে যতটুকু পারো অপরের উপকার করো।

এই হুকুমের পরিপ্রেক্ষিতে একদল লোক প্রমাণ করেন যে, পরীক্ষিত ও উপকারী মন্ত্র ব্যবহার করা জায়েয, অর্থ বোধগম্য না হলেও। তবে সাবধানতা অবলম্বন করা ভালো। যার অর্থ জানা থাকবে না সে মন্ত্র ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। এই হুকুম হাদীছে উল্লেখিত দোয়া ছাড়া অন্য কিছুর বেলায়। আর দোয়া বা আমল হাদীছসম্মত হলে নিঃসন্দেহে জায়েয। যেমন বিচ্ছুর দংশনের দোয়া হাদীছ শরীফে উল্লেখিত হয়েছে।

بِسْمِ اللهِ وَشَجْبَةٍ وَقَرِيْنَةٍ لِلَّحَةٍ بَحْرٍ قِفَاطًا —

হজরত আউফ ইবনে মালেক রা. এর হাদীছ দ্বারা জানা যায়, যে আমলের মধ্যে শিরিক মিশ্রিত আছে, তার ব্যবহার বা প্রয়োগ নিঃসন্দেহে নাজায়েয। তদ্রূপ সুরইয়ানী ও ইব্রানী ভাষার দোয়াসমূহ যার অর্থ বোধগম্য নয়, তার আমলও না করা উচিত। কোনো এক মাশায়েখ থেকে এরকম একটি ঘটনার কথা উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তি একটি দোয়া পড়ছিলো। সেখানে আরেকজন উপস্থিত ছিলো। সে বললো, এ লোকটির কী হলো যে, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল স. কে গালি দিয়ে

যাচ্ছে। তার দোয়ার অর্থ এরকমই ছিলো। না জানার কারণে সে এ ধরনের কথা আওড়াচ্ছিলো। আল্লাহ্তায়ালা আমাদেরকে এজাতীয় মূর্খতা থেকে রক্ষা করুন।

ইবনে মাজা ও আবু দাউদের হাদীছে এসেছে এবং হাকিম হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনার মাধ্যমে তা বিশুদ্ধ বলে প্রত্যয়নও করেছেন যে, হাদীছটি তাতে বর্ণিত হয়েছে।

নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, রূকিয়া তামীমা এবং তাউলা এসতেমাল করা শিরক। রূকিয়া বলা হয় জাহেল যুগের মন্ত্রকে। তামীমা গলার মধ্যে শাদা কালো রঙের দানা ঝুলানোকে বলা হয়। আপদ বালা দূর করার উদ্দেশ্যে এগুলো ব্যবহার করা হয়। তাউনা যাদুটোনা ও টোটকা চিকিৎসাকে বলা হয়, যা সাধারণত নারী পুরুষ একে অপরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য করে থাকে। এ হচ্ছে এক প্রকারের যাদু। দোয়া হেযব বা রূকিয়া কাগজের টুকরাতে লেখা হয়। তাকেই তাবিয বলা হয়, যা গলায় বা বাহুতে ধারণ করা হয়। কোনো কোনো আলেম এটাও নিষেধ করেছেন। তবে যাঁরা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এবং হজরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে দু'খানা হাদীছ জেনেছেন, তাঁরা একে জায়েয মনে করেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. ভয়ভীতি, পেরেশানী এবং দুঃস্বপ্ন দূর করার জন্য এই দোয়া শিক্ষা দিতেন।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّتِ مِنْ غَضَبِه وَعِقَابِه وَشَرِّ عِبَادِه مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يُّحْضَرُوْنَ -

হজরত ইবনে মাসউদ রা.থেকে বর্ণিত হয়েছে, জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদেরকে রসুলেপাক স. উক্ত দোয়া শিখিয়ে দিতেন। আর যাদের জ্ঞান বুদ্ধি হয়নি, এমন বাচ্চাদের বেলায় তিনি কাগজের টুকরায় উক্ত দোয়া লিখিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দিতেন। তাবীয শব্দ হাদীছ শরীফে এসেছে যেমন তা'বিজুত্তিফলি বি কালিমাতিল্লাহি উম্মাতি। আবার হাদীছ শরীফে তাবিযাতুন্নবী– এরকম শব্দও এসেছে। তাবীয শব্দের অর্থ ভয়ভীতি ও অমঙ্গল থেকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট সাহায্য চাওয়া।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর স্ত্রী হজরত যয়নব রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হজরত আবদুল্লাহ আমার গলায় ঝুলন্ত একটি সুতা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী? আমি বললাম, এটি একটি গুণ্ডি বা পড়া সুতা। কিছু পাঠ করে এর উপর দম করে দেয়া হয়েছে। তখন তিনি এটি আমার কাছ থেকে নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়ে বললেন, আমার পরিবার শিরক থেকে মুক্ত। এখানে এসবের প্রয়োজন নেই। কেনোনা আমি রসুল করীম স. কে বলতে শুনেছি, তন্ত্র, মন্ত্র, গুণ্ডি, টোনা– এসবকিছুই শিরক।

হজরত যয়নব রা. বললেন, আপনি এ রকম বলছেন কেনো? আমার চোখে প্রচণ্ড ব্যথা হয়েছিলো। ব্যথার চোটে কোটর থেকে চোখ বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিলো। পুরো চোখ পানি ও ময়লা দ্বারা ভরে যাচ্ছিলো। তখন আমি অনন্যোপায় হয়ে অমুক ইহুদীর কাছে গেলাম। তিনি কিছু পাঠ করে আমার চোখে ফুঁক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের ব্যথা দূর হয়ে গেলো। আমি শান্তি লাভ করলাম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, তোমার চোখের ব্যথা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। সে তোমার চোখের উপর চোখ মেরেছিলো। ইহুদী মন্ত্র পাঠ করায় সে এ থেকে বিরত হয়েছে। এ কাজ না করে বরং তোমার উচিত ছিলো ওই দোয়া পড়া, যা রসুলেপাক স. শিখিয়েছেন।

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سُقْمًا –

বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ। গুণ্ডি বা পড়া সুতা গলায় ঝুলানোকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. শিরিকতুল্য মনে করেছেন। তার কারণ এই যে, জাহেলী যুগে এ জাতীয় বিশ্বাস রাখা হতো যে, এগুলোই তাদের মধ্যে কাজ করে থাকে। আল্লাহ্‌র উপর কোনোরূপ ভরসা রাখা হতো না এবং আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হতো না। সুতরাং যা আল্লাহ্‌র কালাম বা আল্লাহ্‌র নামের মাধ্যমে হবে, তা ব্যবহার করার মধ্যে শিরিক নেই। আর তা শিরিক হয় কেমন করে? যেহেতু বহু সহীহ্ হাদীছে তার প্রমাণ আছে। আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে পানা চাওয়া, কাকুতি মিনতি করা যে বৈধ, এ ব্যাপারে তো মতানৈক্য হতে পারে না। তা যে কোনো রূপেই বা যে কোনো স্থানেই হোক না কেনো? কেউ কেউ বলেন, যে সকল মন্ত্র জ্বীন সাধনাকারী ও ওঝারা পড়ে থাকে তা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। ওগুলোতে হক ও বাতিলমিশ্রিত বাক্য পাঠ করা হয়। আল্লাহ্‌র নাম ও সিফতের সাথে শয়তানের নামও উল্লেখ করা হয়। উভয়ের কাছ থেকেই নিরাপত্তা চাওয়া হয়। এর যৌক্তিকতা হিসেবে তারা বলে যে, জ্বীন স্বভাবগতভাবে মানুষের সাথে দুশমনি রাখে আর শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। তাই শয়তানের নামে মন্ত্র পাঠ করা হলে জ্বীনেরা খুশি হয় এবং তার আছরকৃত জায়গা থেকে সরে যায়। বিভিন্ন প্রাণী যে দংশন করে, তার অবস্থাও তদ্রূপ। কেনোনা জানোয়ারের দংশনও জ্বীনের আছর থেকেই হয়ে থাকে।

জ্বীনেরা সাপ বিচ্ছুর আকৃতি ধারণ করে। এ অবস্থায় শয়তানের নামে মন্ত্র পাঠ করা হলে সকল জানোয়ারের বিষ তাদের গায়ে মিশ্রিত হয়ে যায়। এভাবে মন্ত্র পাঠের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির উপকার সাধিত হয়। এ সকল কথা যাদু মন্ত্র করা ব্যক্তি বা ওঝারা তাদের আমলের সমর্থনে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে।

কিন্তু এ ব্যাপারে উলামা কেরামের সর্বসম্মত মত হচ্ছে, যে মন্ত্র কিতাবুল্লাহ্ বা আল্লাহ্তায়ালার নাম ও সিফত বহির্ভূত, তার আমল করা মাকরুহ। মন্ত্র সম্পর্কে হাদীছ ও ফেকাহ শাস্ত্রের বিখ্যাত আলেম আল্লামা কুরতুবী র. বলেছেন, মন্ত্র তিন প্রকার।

১. ওই মন্ত্র, যা জাহেলী যুগে পাঠ করা হতো এবং যার অর্থ বোধগম্য নয়। এ জাতীয় মন্ত্র থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব। এর দ্বারা শিরিক বা শিরিকের কাছাকাছি গোনাহ্ হয়ে যেতে পারে।

২. যে দোয়া কোরআন মজীদ থেকে নেয়া হয়েছে অথবা আল্লাহ্তায়ালার নাম ও সিফত দ্বারা তৈরী হয়েছে। সাধারণত এগুলোকে আমরা মন্ত্র বলি না। এ জাতীয় আমল বা দোয়া এবং দোয়া মাছুরা যা হাদীছ থেকে প্রাপ্ত, তার ব্যবহার মোস্তাহাব।

৩. ওই আমল, যা আল্লাহ্র নাম দ্বারা নয়, বরং ফেরেশতা বা আল্লাহ্র কোনো নেককার বান্দার নাম অথবা আল্লাহ্র কোনো সম্মানিত সৃষ্টি যেমন আরশ কুরসী ইত্যাদির নাম দ্বারা তৈরী হয়েছে। এ জাতীয় আমল বর্জন করা উত্তম। তার কারণ হচ্ছে হয়তোবা এর দ্বারা গায়রুল্লাহর কাছে পানা চাওয়া হয়ে যেতে পারে। গায়রুল্লাহর নামে কসম করাও যেমন জায়েয নেই, তেমনি গায়রুল্লাহর কাছে পানা চাওয়াও জায়েয নেই।

বান্দা মিসকীন শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী বলেন, আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় ব্যক্তিগণের এবং আল্লাহ্র নামসমূহের দ্বারা ওসিলা করা জায়েয। কেনোনা আল্লাহ্তায়ালার প্রিয়জন যাঁরা তাঁরা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দরবারে নৈকট্য এবং মর্যাদা লাভ করেছেন। আমরা যদি এঁদেরকে তাবীযও করি তবে তাতো এ কারণে যে, তাঁরা আল্লাহ্র বন্দেগী এবং রসুলুল্লাহ স. এর অনুসরণে সীমাহীন সাধনা করেছেন। সুতরাং তাকে গায়রুল্লাহর নামে কসম করার সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না। এঁদেরকে ওসীলা করা হয়, এঁদের মাধ্যমে শেফা চাওয়া হয়। আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে তো এঁদেরকে শরীক করা হয় না। আল্লাহুম্মা সল্লিআলা মোহাম্মদ ওয়া আলা আলি মোহাম্মদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

হজরত রবী র. থেকে কথিত আছে, তিনি ইমাম শাফেয়ী র. কে দোয়ার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাতে কোনো দোষ নেই, যদি তা কিতাবুল্লাহ থেকে হয়। অথবা আল্লাহ্তায়ালার নামসম্বলিত কোনো কিছু হয়, যার অর্থ বোধগম্য। তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো মুসলমান আহলে কিতাবের কাছ থেকে কোনো দোয়া বা মন্ত্রের আমল গ্রহণ করলে জায়েয হবে কি? তিনি বলেছিলেন, হাঁ, জায়েয হবে, যদি তার বাক্যসমূহ চেনা জানা হয় এবং কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহ্র নাম সম্পর্কিত হয়।

এখানে জেনে রাখা দরকার, কিতাবুল্লাহ বলতে কোরআন মজীদকেই বুঝতে হবে। অন্যান্য আসমানী কিতাবও আল্লাহ্‌র কিতাব। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং রূপান্তর সাধিত হয়েছে। এখন ওই সকল কিতাব থেকে দোয়ার আমল গ্রহণ করা যাবে না। তবে হাঁ, যদি তা কোরআনের মুত্তায়াফেক এবং হকের অনুকূলে হয়, তবে দোষ নেই। ইমাম মালেক তাঁর হাদীছগ্রন্থ মুওয়াত্তায় সাইয়্যেদুনা হজরত আবুবকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি একদা এক ইহুদী মহিলাকে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর জন্য তাদের কিতাব থেকে দোয়ার আমল এনে দেয়ার জন্য বলেছিলেন। ইমাম নববী বলেন, মুসলমানের জন্য ইহুদী বা নাসারা থেকে দোয়া আমল নেয়ার ব্যাপারে ইমাম মালেক র. এর বর্ণনাটির প্রসঙ্গে উলামা কেরামের মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী র. এর বৈধতার পক্ষে মত পোষণ করেছেন। ইবনে ওহাব ইমাম মালেক র. থেকে বর্ণনা করেছেন, লৌহজাতীয় কোনো জিনিস, লবণ এবং সুতাতে গুত্তি দিয়ে যে তাবিজের আমল দেয়া হয়, তা মাকরুহ। আর হজরত সুলায়মান আ. এর আংটি সম্পর্কিত তাবিজের আমল বেদাত।

অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ভ্রান্ত বিশ্বাসের মধ্যে আছে। তারা বাহ্যত দেখতে পায়, তন্ত্রমন্ত্র যাদু ইত্যাদি জাহেলী কর্মকাণ্ডের প্রভাব আছে। তারা এদেখে বিস্মিত হয়। মনে করে, শরীয়তসম্মত রাকিয়া বা শেফার আমলের মধ্যে এরকম প্রতিক্রিয়া নেই। এরকম পরিস্থিতিতে সর্বসাধারণের মধ্যে এক ধরনের অস্বীকৃতির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন হয়েছিলো হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর স্ত্রী হজরত জয়নব রা. এর বেলায়। তিনি বলেছিলেন, আমার চোখ যন্ত্রণায় ঠিক্‌রে বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, তখন আমি দিশেহারা হয়ে ইহুদী ওঝার কাছে যেয়ে মন্ত্র পড়িয়ে নিয়েছি এবং তাতে ফলও লাভ করেছি।

সাধারণের এতটুকুও জানা নেই যে, ওই মন্ত্রতন্ত্র নিষেধ করা হয়েছে হাদীছের বিভিন্ন বক্তব্যের দ্বারা। আর সেগুলোকে বাতিল ও অসার বলার কারণ হচ্ছে, মানুষকে শিরিক ও কুফুরীর গর্ত থেকে বের করে নিয়ে আসা।

সুতরাং যাঁর কদম সত্য ও ইমানের উপর সুদৃঢ়, সুপ্রতিষ্ঠিত– তিনি কখনও ওই জাতীয় আমলের শরণাপন্ন হতে পারেন না, পার্থিব জীবনে তিনি যতই বিপন্ন হোন না কেনো। তিনি সর্বদাই এই একীনের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম যে, চিরস্থায়ী জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করা সম্ভব কেবল রসুলেপাক স. এর হুকুম পালনের মাধ্যমেই। আর যাদের দৃষ্টি দুনিয়াবী জীবনেই সীমাবদ্ধ, তারা দৃঢ়তার মাকাম থেকে সরে যায় এবং কুফুরী ও গোনাহ্‌র গর্তে পতিত হয়। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

হাদীছ শরীফে প্রাপ্ত শেফার আমল

রসুলেপাক স. থেকে বিভিন্ন বিষয়ের শেফার আমল পাওয়া যায়। বিশেষ করে চোখের অসুখ এবং বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের ক্ষেত্রে। হাদীছ শরীফে বদনযর, বিষাক্ত প্রাণীর দংশন এবং ফোঁড়া-বাঘীর ক্ষেত্রে দোয়া পাঠ করে দম করার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে। এক হাদীছে এসেছে, দোয়া পাঠ করে ফুঁক দেয়ার অনুমতি আছে কেবল বদনযর এবং প্রাণীর দংশনের বেলায়। হেমা শব্দের অর্থ বিষাক্ত প্রাণীর দংশন। আর নাফায শব্দের অর্থ বদনযর বা নযর লাগা। অন্য আরেক বর্ণনায় লাদাগ (দংশন) শব্দটি অতিরিক্ত আছে। লাদাগ অর্থ দন্তবিশিষ্ট বিষাক্ত প্রাণীর দংশন। হাদীছের বাক্যে লা এবং ইন্না দ্বারা যে সীমা নির্দেশ করা হয়েছে, তদ্‌দ্বারা কেবল বক্তব্যের জোর প্রদান উদ্দেশ্য। এর অর্থ এই নয় যে, উল্লিখিত বিষয়েই কেবল রাকিয়ার আমল করা যাবে। অন্য কোনো রোগের ক্ষেত্রে নয়। বরং সর্বপ্রকারের রোগব্যাধি ও ব্যথা-বেদনার ক্ষেত্রে রাকিয়ার আমল করা শরীয়তসম্মত এবং সুন্নত।

বদনযর

নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, বদনযরের বাস্তবতা আছে। আল্লাহ্‌তায়ালা কারো কারো মধ্যে এরকম স্বভাব রেখেছেন যে, সে ব্যক্তি কোনোকিছুর প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলে সে বস্তুর, ব্যক্তির বা প্রাণীর ক্ষতি সাধিত হয়। নবী করীম স. আরও এরশাদ করেছেন, কোনো বস্তু যদি তকদীরকে হার মানাতে পারতো, তাহলে সেটা হতো বদনযর। উলামা কেরামের অধিকাংশের মত এটাই যে, বদনযরের বাস্তবতা আছে। বেদাতী লোক যেমন মুতাযিলা এবং যারা তাদের আকীদা বিশ্বাসকে পছন্দ করে তারা অবশ্য বদনযরের বাস্তবতায় সন্দেহ পোষণ করে। রসুলেপাক স. যিনি সত্য সংবাদদাতা, তিনি যখন এ ব্যাপারে খবর প্রদান করেছেন, তখন তার উপর বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব এবং তাকে অস্বীকার করা বাতিল। কেউ যদি এরকম মনে করে, সবকিছুই তকদীরে এলাহী অনুসারে হয়ে থাকে। সুতরাং বদনযর কোনো ধর্তব্য ব্যাপার হতে পারে না। উত্তর এই যে, বদনযরও তকদীরে এলাহী অনুসারেই হয়ে থাকে। দৃষ্টির প্রতিক্রিয়া কোনো মূল সত্তাগত বিষয় নয়। আর যারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের তরীকায় রয়েছে, তারা বলে থাকে, বদনযর একটি স্বভাবগত আমল। অর্থাৎ আদতে এলাহী এভাবেই জারী হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালে আল্লাহ্‌তায়ালা তার মধ্যে ক্ষতি ও অমঙ্গল সৃষ্টি করে দেন।

তবে এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর দৃষ্টিপাতের প্রতিক্রিয়া হতেও পারে নাও পারে। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের উপর দৃষ্টিপাতের প্রতিক্রিয়া

হবেই– একথা বলা যায় না। প্রকৃতিবাদীরা বলে থাকেন, দৃষ্টিপাতকারীর চোখ থেকে এক প্রকারের অদৃশ্য সূক্ষ্ম কণিকা উৎক্ষেপিত হয়ে প্রতিপক্ষের দেহে মিশে যায়। আর সে সূক্ষ্ম কণিকাগুলো বাইরের পরিচিত বস্তুর নামে দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর চোখে প্রবেশ করে। তখন আল্লাহ্তায়ালা নযরকৃত বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে ক্ষতি সৃষ্টি করেন। বিষপান করার পর যেমন শরীরে বিষের প্রতিক্রিয়া হয়। এই যে তথ্যটি একটি সম্ভাব্য তথ্য মাত্র। আর সম্ভাব্য কোনো তথ্যকে নিঃসন্দেহ এবং অকাট্য জ্ঞান করা ভুল। কোনো কোনো বদনযরকারী থেকে এরকম বক্তব্য পাওয়া গেছে, কোনোকিছু দেখতে খুব ভালো লাগলে অনুভব করি, আমাদের চোখ থেকে এক ধরনের উত্তাপ বেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ বলেন, বদনযরকারীর চোখ থেকে বিষাক্ত শক্তি প্রবল বেগে বেরিয়ে দর্শিত ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে মিশে যায়। আর সেই বিষাক্ত শক্তিটিই তার দেহের স্বাভাবিকতায় বৈকল্য সৃষ্টি করে।

সর্পদংশিত ব্যক্তির দেহে বিষ যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তেমনি এমন সরীসৃপ আছে যারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা দেহের বিষ দর্শিত স্থানে পৌঁছে দিতে পারে। মোটকথা কোনো তীক্ষ্ণ জিনিস যখন দৃষ্টিকারীর চোখ থেকে বের হয়ে দর্শিত স্থানে যায়, তখন দোয়া কলেমা, তাআউয ইত্যাদি পাঠ করলে আমলগুলো ঢাল হয়ে তাকে রক্ষা করে। আর আমলকারী যদি শক্তিশালী হয় তবে তীরের মতো সেটা ফিরে যায় প্রতিপক্ষের দিকেই।

নবী করীম স. এই বদনযরের চিকিৎসা করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর চিকিৎসা ছিলো সুরা ফাতেহা, কুলআউযু বি রব্বিলফালাক, কুলআউযুবিরব্বিন্নাস এবং আয়াতুল কুরসী। উলামা কেরাম বলেন, সবচেয়ে ভালো রাকিয়ার আমল হচ্ছে সুরা ফাতেহা, কুলআউযু বিরব্বিল ফালাক, কুলআউযু বিরব্বিন্নাস এবং আয়াতুল কুরসী। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সহীহ্ হাদীছে নবী করীম স. থেকে প্রাপ্ত আমলসমূহের মধ্যে অন্যতম

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَايُجَاوِزُ مِنْ بِرٍّ وَّلَا فَاجِرٍ وَّبِاَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمَا جَرَاَ وَمِنْ شَرِّ مَا يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَاَ فِي الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يُطْرَقُ بِخَيْرٍ يَّارَحْمَانُ -

বদনযর দূর করার জন্য এই দোয়াও পাঠ করতে হয়— মাশা আল্লাহু লা কুওয়াতাইল্লা বিল্লাহ। বদনযরকারী নিজে যদি আতঙ্কিত থাকে যে, তার বদনযরে তাছির না জানি তার কাছেই ফিরে আসে, তখন এই দোয়া পড়বে আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। এ সকল আমল করলে ইনশাআল্লাহ্ বদনযর দূর হয়ে যাবে।

এক হাদীছে এসেছে, হজরত আমের ইবনে রবিয়া রা. হজরত সাহল ইবনে হানীফ রা. কে গোসল করতে দেখলেন। তাঁকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিলো। হজরত আমের রা. তাঁর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এতো সুন্দর শরীর পর্দানশীন কোনো নারীরও দেখিনি। কেনো পুরুষেরও দেখিনি। একথা শুনে হজরত সাহল ইবনে হানিফ আনন্দাপ্লুত হয়ে যমীনের উপর পড়ে গেলেন। বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এ খবর রসুলেপাক স. এর কাছে পৌঁছলো।

তিনি স. বললেন, তোমরা কি কারও উপর অপবাদ দিচ্ছো? লোকেরা নিবেদন করলো, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমের তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তার প্রশংসা করেছিলেন। একথা শুনে রসুলেপাক স. হজরত আমের রা.কে ডেকে আনলেন এবং তাঁর উপর সন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করে বললেন, তোমার ভাইয়ের কোনো জিনিস যখন তোমার কাছে সুন্দর মনে হলো, তাকে দেখার পর তুমি যখন তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে গেলে তখন তুমি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি এই দোয়া পাঠ করলে না কেনো? তারপর রসুলেপাক স. তাঁকে বললেন, সাহল ইবনে হানীফের জন্য তোমার শরীর ধোয়া পানি দাও। তখন তিনি তাঁর চেহারা, দু'হাত কনুই পর্যন্ত, দু'পা রান পর্যন্ত এবং লজ্জাস্থান ধৌত করে এক পেয়ালা পানি দিয়ে দিলেন। তারপর সেই পানি হজরত সাহল রা. এর মাথা এবং পিঠে ঢেলে দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুস্থ হয়ে অন্যান্য লোকের সঙ্গে হেঁটে চলে গেলেন। মনে হলো যেনো তাঁর কোনো অসুবিধাই হয়নি।

হজরত ইবনে কাছীর র. এর বর্ণনার মাধ্যমে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে অঙ্গ ধৌত করার পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে তৎকালীন সময়ে মানুষের মধ্যে এই দস্তুর ছিলো যে, কারও বদনযর লাগলে, ডানদিক দিয়ে পানি শরীরে প্রবাহিত করার পর কুলি করা হতো। কুলি করা পানি কোনো পাত্রে জমা করা হতো। চেহারা ধৌত করা হতো। তারপর বাম হাত বরতনে দিয়ে পানি নিয়ে শরীরে ঢেলে দেয়া হতো এবং ডান হাতেও পানি দেয়া হতো। তারপর আবার ডান হাত পানিতে দিয়ে বাম হাতে পানি প্রবাহিত করা হতো। তারপর বাম হাত পানিতে দিয়ে পানি নিয়ে ডান হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা হতো। তারপর বাম হাত পানিতে দিয়ে পানি নিয়ে ডান হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা হতো। তারপর বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা হতো। তারপর বাম হাত দিয়ে পানি নিয়ে ডান পা ধৌত করা হতো। তারপর ডান হাত দিয়ে পানি নিয়ে বাম পা ধৌত

করা হতো। তারপর বাম হাত দিয়ে পানি নিয়ে ডান রানে পানি দেয়া হতো। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম রানে পানি প্রবাহিত করা হতো। তারপর লজ্জাস্থান ধৌত করা হতো। ধৌত করার সময় পা যমীনের উপর রাখা হতো না। এভাবে ধৌত করার পর সে পানি বদনযর লাগা লোকের শরীরে বা পিছন দিক দিয়ে ঢেলে দেয়া হতো। এমন করলে আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছায় বদনযরের তাছীর থেকে রোগী সুস্থ হয়ে যেতো।

হজরত ইবনে কাছীর র. এর বর্ণনায় মানুষের দস্তুরের কথার উল্লেখে মনে হয়, রসুলেপাক স. এর সামনেও এমন করা হতো। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। এ ধরনের আমলের মধ্যে ভেদ কী তা বোঝা মুশকিল।

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেন, কোনো শরীয়তপন্থী লোক যদি উল্লিখিত আমলের ব্যাপারে মৌনতার নীতি অবলম্বন করেন, তবে তাকে বলে দিতে হচ্ছে যে, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। নবী করীম স. থেকে এ ধরনের আমল পাওয়া গেছে। তদুপরি অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বাস করা হয়েছে। আর এই ব্যাপারে যদি কোনো দার্শনিক মৌনতা অবলম্বন করে, তবে তা রদ করা তো খুবই সহজ। কেনোনা তাদের নিকট এটা সুসাব্যস্ত যে, কোনো কোনো ঔষধ তো তার আপন শক্তির বলে রোগের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং আপন বৈশিষ্ট্য দ্বারা কাজ করে। সুতরাং এটাও সেই ধরনের একটি ঔষধ। কাহরুবা (এক প্রকার গাছের কস) এবং চুম্বকের মধ্যে যেরকম আকর্ষণ শক্তি আছে– এ পানির মধ্যেও এ ধরনের কিছু রয়েছে। সুতরাং এটা অসম্ভব ও অবাস্তব কিছু নয়। লজ্জাস্থান ধৌত করার ব্যাপারে কয়েকটি মত পেশ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, লজ্জাস্থান বলতে লুঙ্গির অভ্যন্তরের লজ্জাস্থানকেই বুঝানো হয়েছে। কাযী আয়ায র. বলেন, লজ্জাস্থান বলতে এখানে লুঙ্গির সাথে মিলিত শরীরের অংশকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, লজ্জাস্থান বলতে নাভীকে বুঝানো হয়েছে।

সলফে সালেহীনের এক জামাত কোরআনে করীমের মাধ্যমে বদনযরগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করাকে জায়েয মনে কচ্ছেন। তাঁরা বলেছেন, কোরআনে করীম লিখে তা ধৌত করে রোগীকে পান করিয়ে দেয়াতে কোনো দোষ নেই। তা কোরআনের যে কোনো অংশই হোক, বা শেফা সম্পর্কিত কোনো আয়াত হোক অথবা আল্লাহ্‌তায়ালার নাম ও সিফাতের লেখা হোক।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, জনৈকা মহিলা প্রসব বেদনায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। তিনি কোরআন শরীফের একখানা বা দু'খানা আয়াতের কথা বলে দিলেন যে, তা লিখে ধৌত করে সে পানি মহিলাকে পান করিয়ে দাও।

একটি ঘটনা

আবু আবদুল্লাহ্ নাব্বাহী থেকে কথিত আছে, তিনি বলেন, একদা আমি উটে আরোহণ করে সফরে যাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গীগণের মধ্যে একজন লোক এমন ছিলো যে, তার বদনযর লাগতো। সে কোনো জিনিসের প্রতি ভালোভাবে নযর করলেই তা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। আবদুল্লাহ্ ইবনে নাব্বাহীকে লোকেরা উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে বললো, আপনার উটকে উক্ত ব্যক্তির বদনযর থেকে হেফাজতে রাখবেন। ইবনে নাব্বাহী বললেন, সে আমার উটের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ইবনে নাব্বাহীর কথা উক্ত ব্যক্তি শুনতে পেয়ে এই সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলো যে, ইবনে নাব্বাহী এদিক সেদিক কোথাও গেলেই তার উটের উপর সে বদনযর করবে। ইবনে নাব্বাহী একবার দূরে কোথাও চলে গেলে সে যথাস্থানে এসে উটের উপর বদনযর করলো। গাছ কেটে দিলে যেমন মাটিতে ধপাশ করে পড়ে যায়, ঠিক তেমনি উটটি ধরাশায়ী হয়ে গেলো।

ইবনে নাব্বাহীর নিকট যখন এ খবর পৌঁছলো, তখন তিনি এসে বদনযরকারী লোকটিকে দেখে এই রাকিয়া পাঠ করলেন।

بِسْمِ اللهِ حَبْسٌ حَابِسٍ وَشَجَرٍ يَّابِسٍ وَّ شِهَابٍ قَابِسٍ رُدَّتْ عَيْنُ الْعَائِنِ وَعَلي اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيْهِ فِارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَا مِنْ فُطُوْرٍ- ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ -

দোয়াটি পাঠ করার পর বদনযরকারীর চোখ দু'টি কোটর থেকে বেরিয়ে পড়লো এবং উট সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো। বদনযরের ক্ষেত্রে উক্ত রাকিয়ার আমলটিও করা যায়। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে ইবনে কাইয়্যুম র. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, বদনযর থেকে বেঁচে থাকার জন্য বদনযরকারী থেকে দূরে থাকা জায়েয। আর সুন্দর বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণীকে বদনযর থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তার মধ্যে এমন কোনো কিছু ব্যবহার করা যাতে নযর ফিরে যায়, এরকম করাও জায়েয।

ইমাম বাগবী র.শারহে সুন্নাহ কিতাবে এরকম উল্লেখ করেছেন।

হজরত ওছমান রা. এক সুন্দর ফুটফুটে শিশু দেখে বলেছিলেন, এর থুতনীতে কালো বিন্দু লাগিয়ে দাও, যাতে বদনযর লাগতে না পারে। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবেও এরকম বর্ণনা আছে। এখানে অবশ্য একটি কথা উল্লেখ্য যে, শিশুর থুতনীতে কালো বিন্দু লাগিয়ে দিলে তার দেহের সৌন্দর্য ম্লান হয় না। তবু তাই

করতে বলা হয়েছে। এটাও একটি ভেদের ব্যাপার যা বোধগম্য নয়। তবে এদ্বারা বদনযর থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটাও একপ্রকার রাকিয়ার আমল। আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন।

রসুলে আকরম স. হজরত উম্মে সালামা রা. এর গৃহে একটি কন্যা সন্তান দেখতে পেয়ে বললেন, এর উপর জ্বীনের বদনযরের আছর রয়েছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. মেয়েটিকে দেখলেন, তার চেহারা হলুদ হয়ে গিয়েছে। বললেন, এ মেয়েটির জন্য দোয়া কালাম পড়ো। এর উপর জ্বীনের বদনযর রয়েছে।

এ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের বদনযরের মতো জ্বীনেরও বদনযর পড়তে পারে। আর বলা হয়ে থাকে, মানুষের নযর থেকে জ্বীনের নযর তীব্রতর।

আরেক হাদীছে এসেছে, রসুলেপাক স. হজরত উম্মে সালামা রা. এর ঘরে গেলেন। সেখানে তিনি একটি কন্যাকে দেখতে পেলেন। তার গায়ের রঙ হলুদ হয়ে গিয়েছিলো। লোকেরা বললো, এর উপর বদনযর হয়েছে। রসুলেপাক স. বললেন, তবে বদনযরের দোয়া কালাম পড়লে না কেনো?

বলা হয়ে থাকে, সুন্দর কিছু দেখে বিস্মিত হলেই তার উপর নযর লেগে থাকে। দুশমনী এবং হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে নাও হতে পারে। কোনো নেককার লোকের মহব্বতের দৃষ্টিতেও নযর লাগতে পারে। যেমন সাহল ইবনে হানিফ রা. এর উপর আমের ইবনে বারীআর বদনযর পড়েছিলো। সহসা যার বদনযর লেগে যায়, তার উচিত সুন্দর মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য দোয়া খায়ের করা। হেফাজতের জন্য এটিও একটি আমল।

শাসকের উপর কর্তব্য, যে ব্যক্তির বদনযর লাগে তাকে সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা করতে না দেয়া। ঘরের বাইরে তাকে যেতে দেয়া উচিত নয়। সে দরিদ্র হলে তাকে জীবনধারণযোগ্য জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কেনোনা এ ব্যক্তির মাধ্যমে যে ক্ষতি সাধিত হয়, কুষ্ঠ রোগীর সাথে মেলামেশা করাতেও সেরকম ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে না। হজরত ওমর রা. এ ধরনের লোককে সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা করতে দিতেন না। মানুষের সঙ্গে একত্রে খানাপিনা করতে এবং জামাতে নামাজ পড়তেও তাদেরকে মানা করতেন।

বদনযরের কারণে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে সেই মৃত্যুকে হত্যার সাথে তুলনা করে হত্যাকারীর কাছ থেকে দিয়ত আদায় করা যাবে কিনা— এ সম্পর্কে উলামা কেরামের মতভেদ রয়েছে। ফেকাহ ও হাদীছ শাস্ত্রের বিখ্যাত আলেম ইমাম কুরতুবী বলেন, বদনযরকারীর নযরে কোনো বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর বদনযরের মাধ্যমে কাউকে মেরে ফেললে, কেসাস নিতে হবে– দিয়ত নয়। বদনযরকারীর দ্বারা যদি কোনো ঘটনা দুবার সংঘটিত

হয়, তাহলে সে একাজে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে ধরে নিতে হবে এবং যাদুকরের যে বিধান সেইরূপ তাকে শাস্তি দিতে হবে।

ইমাম নববী র. রউযাহ নামক কিতাবে বলেছেন, বদনযরকারী থেকে দিয়ত বা কাফ্ফারা কিছুই নেয়া যাবে না। কেনোনা কাজটি কোনো সাধারণ রীতির কাজ নয়, এটা ব্যাপক ব্যাপারও নয়। ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা এটা হয়ে থাকে। আবার এমনও হয় যে, কোনো কোনো অবস্থায় বদনযর লাগেও না। যে লোকটির জীবন নাশ হয়ে গেলো, তা যে এর মাধ্যমেই হয়েছে- তা নির্দিষ্ট ও অকাট্যভাবে বলাও যায় না। আবার কখনও এমন হয়, বদনযরকারী কাজটি করলেও ধ্বংস করে দেয়ার উদ্দেশ্যে করে না। তাই এর ফলে কোনোকিছু ওয়াজিব হবে না।

রসুলে আকরম স. দৈহিক সমস্ত ব্যাধির জন্য রাকিয়ার আমল করতেন এবং দোয়া করতেন। যেমন জ্বর, কাঁপুনি রোগ, সর্দি, ভয়-ভীতি, অনিদ্রা, লু হাওয়ার আক্রমণ, দুশ্চিন্তা, ব্যথা-যন্ত্রণা, বিপদাপদ, দূরাবস্থা, শরীর ব্যথা, দারিদ্র, ঋণগ্রস্ততা, দাঁত ব্যথা, যবান বন্ধ হওয়া, খুজলি-পাচড়া, তাকছীর, প্রসবকষ্ট ইত্যাদি সর্বপ্রকারের অসুখ বিসুখ ও বিপদাপদে তিনি দোয়া করতেন, কাফিয়া বা ঝাড় ফুঁক দিতেন এবং তাবিয প্রদান করতেন। এসবের বর্ণনা হাদীছ শরীফে রয়েছে। দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসা করার সাথে সাথে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাও তিনি করতেন। তবে এখানে মানসিক ব্যাধি থেকে কেবল যাদুর বিষয়টি আমরা আলোচনা করবো। কেনোনা, জনৈক ইহুদী রসুলেপাক স. কে যাদু করেছিলো। তাই এ ব্যাপারে কিছু জানা প্রয়োজন বিধায় যাদুর আলোচনাটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অন্যসব বিষয়ের আলোচনা জরুরী নয়।

যাদু বিষয়ক আলোচনা

সেহের আরবী শব্দ যার অর্থ যাদু। সেহের বা যাদু করা হারাম এবং এটা যে কবীরা গোনাহ্ এ ব্যাপারে সকলেই একমত। যাদুর মধ্যে যদি কোনো কথা বা কাজ কুফুরীমিশ্রিত থাকে, তাহলে যাদু করা শুধু কবীরা গোনাহ্ নয়; বরং কুফুরীও। যাদু শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া– উভয়ই হারাম। অবশ্য কোনো কোনো আলেম এরূপ মত পোষণ করেছেন, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যাদুবিদ্যা শিখলে হারাম হবে না। যাদুকরের মন্ত্রে যদি কুফুরী কালাম না থাকে তবে তাকে শারীরিক শাস্তি দিতে হবে। আর কুফরী কালাম থাকলে হত্যা করতে হবে। যাদুকরের তওবার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন যিন্দীক ব্যক্তির তওবার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। আর যিন্দীক বলা হয় নবুওয়াত, দ্বীন, হাশর নশর এবং কিয়ামত অস্বীকারকারীকে।

যাদুর বাস্তবতা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, যাদুর কোনো বাস্তবতা নেই, এটা ধারণাগত একটি ব্যাপার। অর্থাৎ যাদু থেকে যেসব অবস্থা ও কাজ প্রতিফলিত হয় ওগুলো সবই মানুষের খেয়াল। এর বাস্তবতা নেই। আবু বকর আস্তরাবাদী শাফেয়ী এবং আবু বকর রাযী হানাফী ও তাঁদের মতানুসারীরা এরূপ ধারণা রাখে। এ ছাড়া আরও কিছু লোকের ধারণাও এরকম।

ইমাম নববী র. বলেন, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, যাদুর বাস্তবতা আছে। জমহুর উলামার মত এটাই। কিতাবুল্লাহ্ ও মশহুর হাদীছ দ্বারা তা প্রমাণিত। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবেও এরকম উল্লেখ আছে। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন, যাদুর বিষয়ে যে ব্যাপারটি জটিল তা হচ্ছে, যাদু কি মূল সত্তাগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল কিছু, না শুধু ধারণাগত ব্যাপার। যারা এটাকে ধারণাগত ব্যাপার মনে করে, তারা এর প্রতিক্রিয়াকে স্বীকারই করে না। আর যাদুর প্রতিক্রিয়ায় যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা আবার মতানৈক্য করেন, যাদু কি নিছক কোনো তাছীর বা প্রতিক্রিয়া? যেমন বিশেষ কোনো ব্যাধি মানুষের মেজাজকে পরিবর্তন করে দেয়। নাকি এটা বিশেষ কোনো অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছে? যেমন পাথর প্রাণী হয়ে যাওয়া বা প্রাণী পাথর হয়ে যাওয়া। জমহুর উলামা প্রথমোক্ত মতের প্রবক্তা।

কেউ কেউ আবার এরকমও বলে, যাদুর কোনো প্রমাণ নেই। বাস্তবতাও নেই। কথাটি ভুল। এর বিপরীতে কোরআন ও হাদীছের বক্তব্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কোরআনে করীমে যাদুর তাছীর যতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে, এর বেশী নেই। কোরআনে বলা হয়েছে, 'যাদুবিদ্যা দ্বারা স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর কাজ করা হতো।' সুতরাং এতটুকুর মধ্যে যাদুর প্রভাব সীমাবদ্ধ। যাদু এর চেয়ে বেশী কিছু করতে পারে না। এর চেয়ে বেশী শক্তি যাদুর মধ্যে থাকলে কোরআনে করীমে তা উল্লেখ করা হতো। যেহেতু যাদু সম্পর্কিত ঘটনা, যেমন হারুত ও মারুতের কথা তো কোরআনে করীমে উল্লেখ করা হয়েছেই। এর চেয়ে বেশী প্রভাব যাদুতে থাকলে তার বর্ণনা প্রদানে কোনো বাধা তো ছিলো না। বর্ণনা যখন করা হয়নি, তখন এটাই প্রমাণিত হয় যে, যাদুমন্ত্রের মধ্যে এর অতিরিক্ত কোনো ক্ষমতা নেই। যাদু একটি তৈরী রশির মতো যা কাজ এবং উপকরণ দু'এর সমন্বয়ে গঠিত হয়। অর্থাৎ উপকরণ এবং তা সহকারে মন্ত্র পাঠ এই দুই মাধ্যমে যাদু সম্পাদিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুষ্ট লোকদের দ্বারাই একাজ হয়ে থাকে। শর্ত হচ্ছে, যাদুকরকে অবশ্যই জুনুবী এবং নাপাক হতে হবে। আর যদি হারাম সহবাস বা মুহারেমের সাথে সহবাস করে জুনুবী ও নাপাক হয়ে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। সেই হবে যাদু বিদ্যায় যোগ্যতম ব্যক্তি।

যাদুর প্রতিক্রিয়ার বাস্তবতাকে যারা অস্বীকার করে, তারা এমন বলে থাকে যে, ফেরাউনের যাদুকরেরা ময়দানে যে রশি ফেলে যাদু করে সাপ বানিয়েছিলো

সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সাপ হয়নি এবং প্রকৃতপক্ষে সেগুলোতে কোনো যাদুও চালনা করা হয়নি। আসলে রশিগুলো ছিলো চামড়ার থলে। সেগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো করে স্তরে স্তরে সাজিয়ে তার উপর আগুন রেখে দেয়া হয়েছিলো অথবা সূর্যের নীচে রেখে দেয়া হয়েছিলো। চামড়ার টুকরোগুলো যখন আগুনের তাপে উত্তপ্ত হলো, তখন সেগুলো নড়াচড়া করতে লাগল। তাদের এ ধরনের অপব্যাখ্যা অদ্ভূত। কেনোনা, আল্লাহ্‌তায়ালা বিভিন্ন স্থানে সেহের বা যাদু সম্পর্কে বলেছেন। কোনো কোনো স্থানে তো 'সহরুন আযীম'– বড় যাদু, এরকমও বলেছেন এবং যাদুকরদেরকে সাহারা বলেছেন। যাদুকে খেয়ালী মনে করলে এসব বর্ণনাকে তো অবাস্তবই মনে হবে।

সহীহ্ বর্ণনায় পাওয়া যায়, এক ইহুদী সরওয়ারে কায়েনাত স. কে যাদু করেছিলো। সেই যাদুর প্রভাব তাঁর পবিত্র স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছিলো। দৈহিক, মানসিক ও জৈবিক শক্তিতে বৈকল্য দেখা দিয়েছিলো। এই ঘটনা ঘটেছিলো হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ষষ্ঠ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে। এই যাদুর ক্রিয়া ছিলো চল্লিশ দিন। মতান্তরে ছয় মাস বা এক বৎসর।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন, সহীহ নির্ভরযোগ্য মত এই যে, চল্লিশ দিন যাদুর আছর ছিলো। তবে হ্যাঁ আলামত জাহির হওয়া এবং তা সম্পূর্ণ শেষ হওয়া, এদিক দিয়ে সময় অবশ্য আরও দীর্ঘ হয়েছিলো। রসুলেপাক স. এক রাতে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর ঘরে এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে দোয়া করলেন। এরপর বললেন, হে আয়েশা! তুমি জেনে রেখো, আল্লাহ্‌তায়ালা আমার দোয়া কবুল করেছেন। আমার প্রার্থনা গৃহীত হয়েছে। তিনি স. আরো বললেন, দুজন লোক এলো। একজন আমার মাথার কাছে, আরেকজন পায়ের দিকে বসলো। তারা একজন আরেকজনকে বললো, কী হয়েছে? অসুখ কী ধরনের? অপরজন বললো, ইনি যাদুগ্রস্ত হয়েছেন। প্রথমজন আবার প্রশ্ন করলো, কে যাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বললো, লবীদ ইবনে সালাম নামক এক ইহুদী। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কিসের মধ্যে যাদু করেছে? দ্বিতীয়জন বললো, চিরুনীতে এবং মাথা ও দাড়ি চিরুনী করার পর যে চুল পড়তো সেই চুলে।

দোয়ায়ে শেগুফায়ে নফল কিতাবে আছে, প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কোথায় রাখা হয়েছে? সে বললো ওয়াযদানের কূপে ফেলে ঢেকে রেখেছে। এক বর্ণনায় আছে, বীরে আযদানে রেখেছে। উলামা কেরাম বলেন, এটাই বিশুদ্ধ। রসুলেপাক স. কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে ওই কূপের নিকট গেলেন। সেখানে পৌঁছে বললেন, এই কূপটিই আমাকে দেখানো হয়েছিলো।

কূপটির পানি লাল বর্ণ ধারণ করেছিলো। মনে হচ্ছিলো যেনো তার মধ্যে মেহেদীর রঙ গুলে দেয়া হয়েছে। সেখানে যে খেজুর গাছগুলো ছিলো, সেগুলোর মাথা শয়তান অর্থাৎ সাপের মাথার মতো ছিলো। সেই কূপ থেকে যাদুর উপকরণগুলো তুলে আনা হলো।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে এরকমই বর্ণনা করা হয়েছে। বোখারী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা রা. নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! যে একাজটি করেছে আপনি তার নাম প্রকাশ করছেন না কেনো? তাকে লাঞ্ছিত করছেন না কেনো? রসুলেপাক স. বললেন, কোনো লোকের মন্দ কাজ প্রসারিত করাটাকে আমি পছন্দ করি না। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে তো সুস্থই করে দিয়েছেন, এখন মানুষের কাছে প্রচার করার আর কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর একটি হাদীছ ইমাম বায়হাকী র. দালায়েলুন্নবুওয়াত কিতাবে এক দুর্বল সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, লোকেরা যখন সেই কূপ থেকে যাদুর উপকরণগুলো বের করলো তখন ধনুকের একটি ফিতা পাওয়া গেলো, যার মধ্যে এগারটি গেরো দেয়া ছিলো। তখন সুরা ফালাক্ব এবং সুরা নাস নাযিল হলো। এ দু'খানা সুরার একেকটি আয়াত পাঠ করা হলো আর একেকটি গেরো খুলে গেলো।

অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. হজরত আলী রা. ও হজরত আম্মার রা. কে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা সেই কূপের ভিতর একটি খেজুরের চারা গাছ পেলেন যার মধ্যে এগারটি গেরো দেয়া ছিলো। ফতহুলবারীতে বলা হয়েছে, কূপের ভিতর একজন নামলেন। তিনি সেখানে খেজুরের চারা গাছের কিছু খণ্ডাংশ পেলেন। মোম দিয়ে রসুলেপাক স. এর আকৃতি বানিয়ে সুঁই বিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। আর এগারটি গেরো দিয়ে একটি সুতা তার মধ্যে বেঁধে দেয়া হয়েছিলো। এগুলো কূপ থেকে উদ্ধার করা হলো। এ সময় একেকটি গেরো খোলার জন্য এগারো আয়াত সম্বলিত ফালাক ও নাস এই দুই সুরা নিয়ে এলেন হজরত জিব্রাইল আ.। একেক আয়াত পাঠ করা হলো আর একেকটি গেরো খুলে গেলো এবং সুঁইগুলোও বের হয়ে এলো। এভাবে সকল সুঁই যখন বেরিয়ে এলো, তখন তিনি যন্ত্রণা থেকে আরাম পেলেন। এক বিশেষ ধরনের স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করলেন।

কোনো কোনো সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, এ ঘটনার ক্ষেত্রে রসুলেপাক স. প্রথমেই আল্লাহ্তায়ালার নিকট নিরাময়ের আবেদন করেননি। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ আসার পূর্বে তিনি নিছক আত্মসমর্পণের নীতির উপরই ছিলেন। বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং কষ্ট ভোগ করাটাকে পুরস্কার পাওয়ার ওসীলা মনে

করাই ছিলো তাঁর স্বভাব। কিন্তু মুসিবত যখন দীর্ঘায়িত হলো, তখন আশংকা করতে লাগলেন, না জানি এর কারণে ধর্মপ্রচারের কাজে দুর্বলতা দেখা দেয়। তাই তিনি আল্লাহ্তায়ালার নিকট নিরাময়ের দোয়া করলেন। সেজন্য আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে আত্মিক ও জাগতিক দুই ধরণের চিকিৎসার ইঙ্গিত দিলেন। আত্মিক চিকিৎসা হচ্ছে সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস অবতীর্ণ হওয়া। আর জাগতিক চিকিৎসা হচ্ছে মাথায় শিঙ্গা লাগানো।

সফরুস সাআদত কিতাবের লেখক বলেছেন, যারা দ্বীন ও ইমানের দৌলত হতে বঞ্চিত, তারা অবশ্যই এধরনের চিকিৎসাকে অস্বীকার করে বলবে যে, শিঙ্গা লাগানো যাদুর চিকিৎসা হয় কেমন করে।

তাদের এধরনের দ্বন্দ্বের জবাব এই যে, কোনো কাফের চিকিৎসক যেমন জালিনুস বা ইস্তাতালিসের চিকিৎসকরা যদি এই চিকিৎসা নির্ধারণ করতো, তাহলে তারা অস্বীকার করতো না। তারা তার সমর্থনে বরং এরকম বলতো, এধরনের বিজ্ঞানী বা চিকিৎসকগণ যখন এরকম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তখন অবশ্যই এর মধ্যে কোনো না কোনো হেকমত নিহিত আছে। অথচ রসুলে করীম স. এর কাজের ব্যাপারে এ ধরনের বিশ্বাস এবং উক্তি থাকা প্রয়োজন ছিলো। কেনোনা রসুলেপাক স. যাদুর চিকিৎসার ক্ষেত্রে শিঙ্গা লাগানোর একটা জ্ঞানগত হেকমত রয়েছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। যাদুর প্রতিক্রিয়া মস্তক পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিলো, অর্থাৎ মস্তিষ্কের শক্তির মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিলো। সুতরাং রসুলেপাক স. কোনো কাজ না করেও করে ফেলেছেন বলে মনে করতেন। এই যে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন এটা যাদুর কারণে তাঁর স্বভাবে এবং রক্তকণিকায় মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিলো, যার কারণে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে স্বভাব ও আচরণকে বদলে দিয়েছিলো। বদ আত্মা তথা বদ জ্বীন ও শয়তান, মানুষের খারাপ নফস এবং প্রাকৃতিক দৈহিক শক্তির সমন্বয়ে যাদু সম্পাদিত হয়।

যাদুর ক্ষেত্র হচ্ছে প্রাণীর দেহ। দেহটি যেহেতু রূহ সম্পৃক্ত, তাই যাদুর প্রতিক্রিয়া পতিত হয় দেহ, রূহ উভয়টির উপর। যাদুর প্রভাব দেহে মিশে যাওয়ার পর কলব থেকে এক সূক্ষ্ম উত্তাপ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের দিকে উৎসারিত হয়। তখন সেই উত্তাপটিই মস্তিষ্কের শক্তির জন্য একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যাদুর প্রতিক্রিয়া তখন মস্তিষ্কের তার নিজস্ব অবস্থা থেকে সরিয়ে ক্ষতিকর অবস্থায় নিয়ে যায় এবং ব্যক্তি বা প্রাণী তখন তার স্বাভাবিক স্বভাবের বাইরে চলে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে শিঙ্গা লাগিয়ে দূষণজনিত উত্তপ্ত রক্তকে বের করে দেয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং উত্তম চিকিৎসা।

কোনো কোনো বেদাতী সম্প্রদায় রসুলেপাক স. এর দেহ মোবারকে যাদুর তাছীরকে অস্বীকার করেছে। তারা মনে করে, যাদুর তাছীরকে স্বীকার করলে তাঁর

উচ্চ মর্যাদার হানি হয় এবং তাঁর নবুওয়াতের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির কারণ হয়। এ জাতীয় কথা মিথ্যা। আর শরীয়তের উপর দৃঢ়তা না থাকার কারণে এরকম প্রশ্ন তাদের মনে উদয় হয়। যাদুর ব্যাপারটিকে অস্বীকার করলে তো এটাই ধরে নিতে হয় যে, রসুলেপাক স. একজনকে জিব্রাইল মনে করলেন, অথচ তিনি জিব্রাইল আ. নন। তিনি মনে করলেন যেনো ওহী নাযিল হচ্ছে, অথচ ওহী নাযিল হয়নি। রসুল করীম স. এর দ্বারা এ ধরনের ভ্রান্তি হতে পারে মনে করলে ইসলাম আর রইলো কিসে? তারা আরও মনে করে, যাদুর আছর হতে পারে কোনো ফাসেক ব্যক্তির মধ্যে, কোনো মোমিন ব্যক্তির মধ্যে তা হতে পারে না। বেদাতীদের এ সমুদয় কথাই পরিত্যাজ্য। কেনোনা রসুলেপাক স. যে তাঁর নবুওয়াতের দাবিতে সত্যবাদী ছিলেন এ ব্যাপারে দলীল কায়েম হয়ে গিয়েছে।

তাছাড়া তাঁর দ্বীন প্রচার কর্মসূচীতে আল্লাহ্তায়ালা যা পৌঁছিয়েছেন, তার হেফাজত ও সংরক্ষণের উপর মোজেজা সমূহই সাক্ষী। যেসব পার্থিব ব্যাপার তাঁর ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে, সেগুলোর জন্য তিনি প্রেরিত হননি, সেগুলো তাঁর নবুওয়াতের অন্তর্ভূত নয়। ওগুলো হচ্ছে এমন কিছু মানবীয় বিষয় যা সাধারণভাবে সব মানুষের মধ্যেই থাকে। যেমন রোগ, ব্যাধি ইত্যাদি। সুতরাং এ ধরনের দুনিয়াবী ব্যাপার তাঁর মধ্যে সংমিশ্রিত হওয়া বিচিত্র নয়। দ্বীনি ব্যাপারে তাঁকে যেমন হেফাজত করা হয়েছে, সেরকম দুনিয়াবী ব্যাপারেও করা হয়েছে। একথার দ্বারা এ ধারণাও সৃষ্টি হতে পারে না যে, তিনি দুনিয়াবী কাজকর্ম যেমন খুশি তেমনই করে ফেলেছেন। তিনি এরূপ কক্ষণও করেননি। কারণ কাজকর্ম করাটা ছিলো তাঁর নিজস্ব আওতাভুক্ত ব্যাপার। আর দুনিয়াবী বিষয়ের আরেক দিক অসুখ বিসুখ হওয়া ছিলো তাঁর আওতাবহির্ভুত। আর সুস্থ সবল থাকা নবুওয়াতের সত্যতার শর্ত নয়। মক্কার কাফেরেরা তাঁকে যাদুকর বলেছিলো। যে ব্যক্তি যাদুকর, তার উপর তো অন্যের যাদু প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ফলে সে ব্যক্তি অসুস্থও হবে না কখনও। সুতরাং অন্যের যাদুর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে গেলো যে, তিনি যাদুকর ছিলেন না। কাজেই মুসলেহাতের কারণেই হয়তোবা আল্লাহ্তায়ালা তাঁর পবিত্র শরীরে যাদুর তাছীর সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। বিরুদ্ধবাদী বেদাতীদের কথা 'যাদুর তাছীর হওয়া অপূর্ণতার প্রমাণ' এটাও কোনো বিধিবদ্ধ কথা নয়। কামেল ব্যক্তিদের মধ্যেও কোনো হেকমত ও মুসলেহাতের কারণে তাছির হতে পারে। এ সম্পর্কে বহু সহীহ্ হাদীছ রয়েছে, যা অস্বীকারের উপায় নেই। আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন।

শেফার আমল

রসুলেপাক স. এর রাকিয়ার আমল বা তাবিযাত ছিলো অসংখ্য। তার সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা কোনো লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বালা মুসিবত দূর করার জন্য কিছু রাকিয়া বা শেফার আমল লিপিবদ্ধ করা হলো।

বদনযর ও অন্যান্য রোগব্যাধি

আমলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত আমলটি হচ্ছে বদনযর থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল। এরকম আমল রয়েছে অনেক। তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে বিভিন্ন বালা মুসিবত ও রোগ ব্যাধিতে রসুলেপাক স. যে আমলটি করতেন– সুরা ফাতেহা, সুরা ফালাক্ব, সুরা নাস এবং আয়াতুল কুরসী। তার সাথে বিভিন্ন সময়ে নীচের দোয়াগুলো পড়তেন।

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسُ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَاءَكَ شِفَاءً لَّايُغَادِرُ سُقْمًا-

সর্বপ্রকারের রোগব্যাধিও ব্যথা বেদনার ক্ষেত্রে রসুলেপাক স. সব সময় এ আমলটি করতেন

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّتِ مِنْ غَضَبِه وَعِقَابِه وَشَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ –

اَللّٰهُمَّ اِنِيِّ اَعُوْذُبِكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّتِ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اخِذٌ بِنَاصِيِتِهَا –

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْاِثْمَ وَالْغَرَمَ – اَللّٰهُمَّ لَا يهْزُمُ جُنْدَكَ وَلَا يَخْلِفُ وَعْدَكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ –

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ لَيْسَ شَئْيٌ اَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ بِاَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمَا ذَرَأَ وَمَا بَرَأَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ لَا اَطِيْقُ شَرَّه وَمِنْ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ لِّيْ اخِذٌ بِنَا صِيَتِه اِنَّ رَبِّيْ عَلي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ –

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ – مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِا للهِ اَعْلَمُ اَنَّ اللهَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَئٍ عِلْمًا وَّاَحْصي كُلَّ شَئٍ عَدَدًا – اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اخِذٌبِنَا صِيِتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ – نَخَضْتُ بِالَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلٰهِيْ وَاِلٰهُ كُلِّ شَئٍي وَّبِه وَهُوَ رَبِّيْ وَرَبُّ كُلِّ شَئٍ وَتَوَكَّلْتُ عَلَي لْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَاسْتَدْ فَعْتُ الشَّرَّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ حَسْبِيْ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوْقِ حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوْقِ حَسْبِيَ الَّذِيْ هُوَ حَسْبِيَ الَّذِيْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَئٍ وَهُوَ بِخَيْرٍ وَّلَا يُجَارُ عَلَيْهِ حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَا سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعي لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مَرْمِيْ حَسْبِيَ اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

নিম্নোক্ত দোয়া দোয়ায়ে জিব্‌রাইল নামে পরিচিত, যা হজরত জিব্‌রাইল আ. রসুল পাক স. এর জন্য পাঠ করছিলেন।

بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَئٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ رِقْبَةٌ وَجْعِ جَسَدٍ –

সহীহ মুসলিম শরীফে হজরত ওছমান ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একদা রসুলেপাক স. এর নিকট তাঁর দেহের ব্যথা সম্পর্কে জানালেন। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণও করেছিলেন। রসুলেপাক স. বললেন, তোমার শরীরের যে জায়গায় ব্যথা অনুভব করছো সেখানে হাত দ্বারা চেপে ধরো। তারপর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ –

তিনবার এবং – اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ সাতবার পাঠ করো।

ভয় ও অনিদ্রার দোয়া

হজরত খালেদ রা. নবী করীম স. এর কাছে অন্তরের ভয়ভীতি এবং অনিদ্রার অভিযোগ করে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! সারা রাত আমার ঘুম আসেনা। তিনি বললেন, ঘুমাতে যাওয়ার সময় এই দোয়া পাঠ করবে

اَللّٰهُمَّ رَبِّ السَّمٰوَاتِ وَالسَّبْعِ وَمَا اظَلَّتْ وَرَبِّ الْاَ رْضِيْنِ وَمَا اَقَلَتْ وَرَبِّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ كُنْ لِّيْ جَرًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا اَنْ يُّفْرِطُ عَلي اَحَدٍ مِّنْهُمْ يَمْبَغِيْ عَلي عِزِّ جَاءِكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ –

বিপদ ও দুশ্চিন্তার দোয়া

হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম স. বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তার সময় এই দোয়া পাঠ করতে বলেছেন

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبِّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ –

বোখারী ও মুসলিমে আবু দাউদ সাইয়্যেদুনা আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. বিপদাপদের ক্ষেত্রে এই দোয়া পাঠ করতে বলেছেন।

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوا فَلَا تَكِلْنِيْ اِلي نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنِ اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّه لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ –

মসনদে ইমাম আহমদ কিতাবে হজরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল করীম স. বলেছেন, নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করলে কোনো প্রকারের দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা স্পর্শ করতে পারবে না।

اَللّٰهُمَ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنِ عَبْدِكَ وَابْنِ اُمَّتِكَ نَاصِيْقَ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيْ حُكْمِكَ عَدْلٌ فِيْ قَضَائِكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَلَكَ سَمَّيْتُ بِه نَفْسِكَ اَوْ اَنْزَلْتَه فِيْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَه اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ اِسْتَأْثَرْتَ بِه فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَنَوِّرَ صَدْرِيْ وَحُزْنِيْ وَذِهَابَ هَمِّيْ –

রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সর্বদাই তওবা ও এসতেগফার করতে থাকবে, আল্লাহ্তায়ালা তার দুশ্চিন্তাকে আনন্দে রূপান্তরিত করে দিবেন, সর্বপ্রকারের অভাব অনটন থেকে মুক্ত রাখবেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন যার কল্পনাও সে করতে পারে না।

লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্

হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, নানা ধরনের চিন্তা ফিকির যাকে গ্রাস করেছে, সে যেনো লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাহ্ বিল্লাহ্ বেশী করে পড়ে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে এই দোয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই আমলটি হচ্ছে জান্নাতের সম্পদসমূহের মধ্যে অন্যতম সম্পদ। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এটি জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে একটি দরজা। এক বর্ণনায় এসেছে, এই দোয়া পাঠ করলে প্রতিবারে একেকটি ফেরেশতা নাযিল হয় এবং তার জন্য সুখশান্তি নিয়ে আসে। মাশায়েখগণ বলেছেন, এই আমলের চেয়ে অধিক সাহায্যকারী আর কিছুই নেই।

আয়াতুলকুরসী ও সুরা বাকারার শেষ তিন আয়াত

হাদীছ শরীফে এসেছে, বিপদাপদে যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী এবং সুরা বাকারার শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ্তায়ালা তার ফরিয়াদ কবুল করবেন।

জামে দোয়া

হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. এর হাদীছে আছে, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, আমি এমন একটি কলেমা (দোয়া) জানি, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি সেই দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ্তায়ালা অবশ্যই এর বদৌলতে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। দোয়াটি আমার ভাই ইউনুস অন্ধকার উদরে পাঠ করেছিলেন। দোয়াটি হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্ জলিমিন।

তিরমিযী শরীফে আছে, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, এই দোয়া পাঠ করলে অবশ্যই আল্লাহ্তায়ালা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। এ সম্পর্কে আরেকটি দোয়ার কথাও হাদীছ শরীফে এসেছে। তা হচ্ছে

اَسْئَلُكَ تَمَامُ الْعَافِيَةِ وَاَسْئَلُكَ دَامَ الْعَافِيَةِ وَاَسْئَلُكَ الشُّكْرَ عَلَي الْعَافِيَةِ وَاَسْئَلُكَ الْغَنِيْ عَنِ النَّاسِ وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ –

দারিদ্র্য বিমোচনের দোয়া

হজরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসুলে করীম স. এর নিকট এসে বললো, ইয়া রসুলাল্লাহ! দুনিয়া আমার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। একথা শুনে রসুলেপাক স. বললেন, ফেরেশতাদের দোয়া এবং মাখলুকাতের তসবীহ্ যার ওসীলায় আল্লাহ্তায়ালা তাঁদেরকে রিযিক দিয়ে থাকেন তার উপর আমল করছো না কেনো? অতঃপর তিনি বললেন, ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সময় এই দোয়া একশবার পাঠ করবে

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ —

এই দোয়া উপরোক্ত নিয়মে পাঠ করলে দুনিয়া তোমার বাধ্য হয়ে যাবে। লোকটি চলে গেলো এবং বেশ কিছুদিন পর এসে বললো, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার কাছে দুনিয়ার ধনদৌলত এতো বেশী এসেছে যে, আমি ভেবে পাচ্ছি না, কোথায় রাখবো।

'সিলসিলায়ে গাবরুনিয়া' তে উল্লেখ আছে, উক্ত আমল ফজরের সুন্নত এবং ফরজের মধ্যবর্তী সময়ে করতে হবে এবং সেখানে উল্লেখ আছে, তার সাথে لَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ — এই দোয়াটি পড়লে সমস্ত গোনাহ্ খাতাও মাফ হয়ে যায়। এটি রিযিক বৃদ্ধি পাওয়ার একটি উপায়। কেনোনা গোনাহ্ রিযিক সংকুচিত হওয়া এবং দুশ্চিন্তার কারণ। এসতেগফার এবং আল্লাহ্তায়ালার শক্তি ও কুদরতের কাছে আত্মসমর্পণ সেই কারণটি দূর করতে সহায়তা করে।

কিমিয়ায়ে মাশায়েখ

এ মর্মে আরেকটি ওযীফা আছে যাকে কিমিয়ায়ে মাশায়েখ বলা হয়। ওযীফাটি পরীক্ষিত। জুমার নামাজের সালাম ফিরানোর পর তাশাহহুদে যেমন বসা হয় ঠিক তদ্রূপ বসা অবস্থায় নড়াচড়া না করে সাতবার সুরা ফাতেহা, সাতবার কুল হুয়াল্লাহ, সাতবার কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক, সাতবার কুল আউযু বিরব্বিন্নাস পড়লে সামনের এবং পিছনের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। এই আমলের পর মাশায়েখে কেরাম হাদীছ শরীফের নিম্নোক্ত দোয়াটি সাতবার পাঠ করতে বলেছেন।

اَللّٰهُمَّ يَاغَنِيُّ يَاحَمِيْدُ يَا مَهْدِيُ يَا مُعِيْدُ يَارَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ اَغْنِنِيْ
بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبَطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ۔

আগুন নিভানোর দোয়া

তিবরানী ও ইবনে আসাকের থেকে বর্ণিত আছে, রসুলে করীম স. এরশাদ করেছেন, তোমরা আগুন লাগতে দেখলে আল্লাহু আকবার বলো। এই তকবীরধ্বনি আগুন নিভেয়ে দেবে। এটি একটি পরীক্ষিত আমল। উলামা কেরাম বলেন, আগুন শয়তানী পদার্থ। শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। শয়তানের মতো আগুনেও রয়েছে ব্যাপক ধ্বংসাত্মকতা। আগুন তার নিজের স্বভাবে সর্বোচ্চ ধ্বংসলীলাটি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করে। শয়তানও তাই চায়। বনী আদমকে ধ্বংস করে দেয়াই তার মূল উদ্দেশ্য। শয়তান এবং আগুন উভয়েই বিশৃঙ্খলাকাংখী। আল্লাহ্তায়ালার শ্রেষ্ঠত্বের সামনে কোনোকিছুই টিকতে পারে না। তাই সব মুসলমান তকবীর বলতে থাকলে আল্লাহ্তায়ালা অগ্নি নির্বাপিত করে দেন। এ আমলটির সাথে অভিজ্ঞতাও জড়িত।

মহামারীর দোয়া

মহামারীর মৃত্যু দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হয় মন্দ আত্মার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। আর দ্বিতীয়টি হয় নিকৃষ্ট জিনিসের সংমিশ্রণের কারণে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ মন্দ ও নিকৃষ্ট জিনিসের সমিশ্রণের ফলে যে মহামারী হয়, তা নিয়ে গবেষণা করা এবং প্রকৃত কারণ উদঘাটন করা চিকিৎসকগণের কাজ। তবে প্রথম প্রকার অর্থাৎ খারাপ আত্মার প্রতিক্রিয়ার কারণে যে মহামারী হয়, তার চিকিৎসা দোয়া কালামের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ সমস্ত দোয়া কালাম পাঠ করা দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মতো। যোদ্ধা যেমন যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে তার হাতিয়ার ঠিক আছে কিনা, তার বাহুতে পর্যাপ্ত বল আছে কিনা। এই যুদ্ধে বাহুবল আর হাতিয়ার হচ্ছে বিসমিল্লাহ শরীফ এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। কেউ কেউ আয়াতুলকুরসী, কুলআউযু বিরব্বিল ফালাক এবং কুলআউযু বিরব্বিন্নাস বেশী বেশী করে পাঠ করতে বলেছেন। কেউ কেউ আবার এ আমলটিও করেছেন-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَه اَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ-

আয়াতের শেষ পর্যন্ত। অথবা রসুলেপাক স. এর নামের কসম দেয়াও একটি পরীক্ষিত আমল।

মাথা ব্যথার দোয়া

ইমাম হুমায়দী র. 'কিতবুত্তিব্ব'এ হজরত ইউনুস ইবনে ইয়াকুব আবদুল্লাহর মাধ্যমে মাথা ব্যথার আমল সম্পর্কে বলেছেন, নবী করীম স. মাথা ব্যথার ক্ষেত্রে এই আমলটি করতেন।

بِسْمِ اللهِ الْكَبِيْرُ وَاَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ تَغَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ-

দাঁত ব্যথার দোয়া

ইমাম বায়হাকী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, একদা তিনি নবী করীম স. এর নিকট দাঁত ব্যথার কথা বললেন। রসুলেপাক স. তখন তাঁর যে গালের দাঁতে ব্যথা ছিলো, সেখানে হাত রেখে সাতবার এই দোয়া পাঠ করেছিলেন।

اَللّٰهُمَّ اَذْهَبْ عَنْهُ مَايَجِدُ وَفَحْشَه بِدَعْوَةِ نَبِيِّكَ الْمَكِيْنِ الْمُبَارَكَ عِنْدَكَ -

দোয়া পড়ার পর হাত উঠানোর পূর্বেই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর ব্যথা ভালো করে দিলেন। হুমায়দী বললেন, একদা সাইয়্যেদা ফাতেমা রা. রসুলেপাক স. এর নিকট দাঁত ব্যথার অভিযোগ নিয়ে এলেন। রসুলেপাক স. ডান হাতের শাহাদত আঙুল তাঁর ওই দাঁতের উপর রাখলেন, যার মধ্যে ব্যথা হয়েছিলো। তারপর এই দোয়া পাঠ করলেন,

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ اَسْئَلُكَ بِعِزِّكَ وَجَلَالِكَ وَقُدْرَتِكَ عَلي كُلِّ شَئٍ فَاِنَّ مَرْيَمَ لَمْ تَلِدْ غَيْرَ عِيْسي مِنْ رُّوْحِكَ وَكَلِمَتِكَ اَنْ تَكشِفَ مَا تَلْقِيْ فَاطِمَة بِنْتِ خَدِيْجَة مِنَ الضَّرِّ مَكَّة-

এই দোয়া পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে হজরত ফাতেমা রা. দাঁত ব্যথা থেকে আরাম পেলেন।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া থেকে এক বিস্ময়কর আমল সম্পর্কে জানা যায়। মুহিব্বেতিবরী ইমাম খলীল মক্কী র. কে এই আমলটি বিভিন্ন সময়ে করতে দেখা গেছে। কারও দাঁতে ব্যথা হলে তিনি তার মাথার উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করতেন, কয় বৎসরের জন্য দাঁত ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাও। রোগী পাঁচ সাত বা নয় বৎসর যাই বলতো, দেখা যেতো, হাত উঠাতে না উঠাতেই ব্যথা ভালো হয়ে গেছে এবং উক্ত সময়সীমা পর্যন্ত তার আর দাঁত ব্যথা হতো না।

তিনি এই আমলের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো দোয়া পাঠ করতেন না। তবে হতে পারে মনে মনে হয়তো কোনো দোয়া মাছুরা পড়তেন অথবা নিজের কোনো খাস তাওয়াজ্জুহ দ্বারা তাকে সুস্থ করে তুলতেন। আল্লাহ্‌পাকই ভালো জানেন।

মাওয়ায়েহেবে লাদুন্নিয়ার লেখক বলেন, দাঁত ব্যথার ক্ষেত্রে যে আমলটি অত্যন্ত পরীক্ষিত, তা হচ্ছে ব্যথাযুক্ত গালে হাতের আঙ্গুল দ্বারা লিখে দিতে হবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ – قُلْ هُوَ الَّذِيْ اَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ –

এ দোয়াটিও লেখা যেতে পারে

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ –

মূত্রপাথরী ও পেশাব বন্ধের আমল

হজরত আবুদ্দারদা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তার কাছে এক লোক এসে বললো, তার পিতা মূত্রপাথরী রোগে আক্রান্ত। তাঁর পেশাব বন্ধ হয়ে গেছে। হজরত আবুদ্দারদা রা. তাকে রসুলেপাক স. থেকে যে দোয়া শিখেছিলেন, তাই পড়ার জন্য বলে দিলেন। আবু দাউদ শরীফে বলা হয়েছে, এই দোয়া সমস্ত রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রেই পাঠ করা যায়। সেই লোকটি হজরত আবুদ্দারদা রা. এর কথা মতো আমল করে সুস্থ হয়ে গিয়েছিলো। দোয়াটি এই

رَبُّنَا اللهُ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ وَاَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْاَرْضِ وَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَخَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الْمُتَطَيِّبِيْنَ اَنْزِلْ شِفَاءَ مِنْ شِفَاءَكَ وَرَحْمَةٌ مِّنْ رَحْمَتِكَ عَلي هَذَا الْوَجْعِ فَيُبْرِيْ -

জ্বরের আমল

হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম স. হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর নিকট গেলেন, তখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি জ্বরকে মন্দ কথা বলছিলেন। রসুল স. বললেন, জ্বরকে মন্দ বলো না, সেতো আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমের অধীন। তবে তুমি চাইলে আমি তোমাকে এমন আমল শিখিয়ে দিতে পারি, যার ফলে আল্লাহ্‌তায়ালা জ্বর দূর করে দিতে পারেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বললেন, শিখিয়ে দিন। রসুলেপাক স. এই দোয়া পড়তে বললেন—

اَللّٰهُمَّ اِرْحَمْ جِلْدِيْ الرَّقِيْقِ وَعْظِمِي الدَّقِيْقُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِيْقِ يَا اُمَّ مِلْدَمٍ اِنْ كُنْتِ امَنْتُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَلَا تَصْدَعِي الرَّاسَ وَلَا تُنْتِنِي الْغَمَّ وَلَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَلَا تَشْرَبِي الدَّمِ وَلَاتَحَوَّلِيْ عَنِّيْ اِلي مَنِ اتَّخَذَ مَعَ اللهِ اِلهًاخَرَ –

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, আমি এই দোয়া পাঠ করে ভালো হয়ে গেলাম। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার লেখক বলেন, এই দোয়া অত্যন্ত পরীক্ষিত। এই দোয়া আমার শায়েখকে স্বহস্তে লিখতে দেখেছি। তিনি লিখতেন

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ عَظْمَ الدَّقِيْقَ وَجَلْدِ الرَّقِيْقَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فَوْرَةِ الْحَرِيْقَ يَا اُمَّ مِلْدَمٍ اِنْ كُنْتُ امَنْتُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ فَلَا تَأْ كُلِي اللَّحْمَ وَلَا تَشْرَبِي الدَّمَ وَلَاتَثُوْرِيْ عِلْمَ الْغَمِّ التُّقِلِيْ اِلي مَنْ عَزَمَ اَنَّ مَعَ اللهِ اِلهًا اخَرَ فَاِنِّي اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلهَ اِلَّا اللهِ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه –

আলহুদা কিতাবের লেখক বলেছেন, পালাজ্বরের ক্ষেত্রে তিনি এই আমলটি করতেন– তিনটি পাতলা কাগজ নিয়ে একটির মধ্যে লিখতেন بِسْمِ اللهِ فَرَّتْ দ্বিতীয়টিতে লিখতেন بِسْمِ اللهِ مَرَّتْ আর তৃতীয়টিতে লিখতেন بِسْمِ اللهِ قَلَّتْ। দৈনিক একটি করে কাগজ পানি দ্বারা গিলে ফেলার হুকুম দিতেন। কিরান কিতাবে উল্লেখ আছে, রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে উক্ত কাগজ ভিজিয়ে পানি পান করা সলফে সালেহীনগণের আমল ছিলো।

ইবনুলহাজ্জ মাদখাল কিতাবে উল্লেখ করেছেন, শায়েখ আবু মোহাম্মদ মুরজানী জ্বর ইত্যাদির জন্য সবসময় একখানা দোয়া কাগজে লিখে বাড়ির দহলিজে রেখে দিতেন। কারো কোনো অসুখ বিসুখ হলে উক্ত কাগজ নিয়ে ভিজিয়ে রোগীকে পান করিয়ে দিতেন। আল্লাহ্পাকের হুকুমে অসুখ ভালো হয়ে যেতো। দোয়াটি এই

اَزْلِيٌّ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ يُزَيْلُ الزَّوَالَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْانَ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ –

খুজলি পাঁচড়ার আমল

যাদুলমাআনী কিতাবের লেখক বলেছেন, খুজলি পাঁচড়া হলে শরীরে নিম্নোক্ত দোয়া লিখে দিলে ভালো হয়ে যায়।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا فَيَذُرُهَا قاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرِي فِيْهَا عِوَاجًا وَلَا اُمَّتًا ــ

প্রসবকষ্ট

প্রসবকষ্ট দূর এবং সহজ প্রসবের জন্য দোয়া আমল অনেক আছে। তবে নিম্নোক্ত দোয়াটি সুপরীক্ষিত। আবদুল্লাহ ইবনে ইমাম ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেছেন, আমি আমার পিতা মহোদয়কে দেখেছি, কোনো মহিলার প্রসবকষ্ট হলে তিনি শাদা পেয়ালা অথবা পাকপবিত্র কোনো কিছুর উপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা থেকে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত দোয়া লিখে দিতেন।

لاَ اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِنْ نَّهَارٍ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةٍ اَوْ ضُحهَا ــ

আবু বকর মারুসী বলেন, একদা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর নিকট এক লোক এসে বললো, হে আবু আবদুল্লাহ! এক মহিলা দুদিন ধরে প্রসববেদনায় কষ্ট পাচ্ছে, আপনি দয়া করে তার জন্য কিছু লিখে দিন। তিনি বললেন, একটি বড় পেয়ালা এবং যাফরান আনো। এভাবে তিনি অনেক প্রসূতিকে এই আমল দিয়েছেন এবং প্রত্যেকের জন্য নতুন নতুন পেয়ালা ব্যবহার করেছেন। পেয়ালায় তিনি নিম্নোক্ত দোয়া লিখে দিতেন।

اَخْرُجْ اَيُّهَا الْوَلَدُ مِنْ بَطْنٍ ضِيْقٍ اِلي سِعَةٍ هذِهِ الدُّنْيَا اَخْرُجْ بِقُدْرَتٍ الَّذِيْ جَعَلَكَ فِيْ قِرَارٍ مَّكِيْنٍ اِلي قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ــ لَوْ اَنْزَلْنَا هذَا الْقُرْاٰنَ عَلي جَبَلٍ لَّرَاَيْتَه خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ــ

পেয়ালাটি ধুয়ে রোগিনীকে পান করাতে আর কিছু পানি তার মুখে ছিটিয়ে দিতে বলতেন। শায়েখ মুরজানী বলেন, আমি এই দোয়া বেশ কয়েকজন বুযুর্গের কাছ থেকে নিয়েছি। আর যাকেই এই দোয়া লিখে দিয়েছি, সে-ই আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে মুক্তি পেয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, হজরত ঈসা আ. একদা এমন এক মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার বাচ্চা পেটেই মারা গিয়েছিলো। মহিলাটি হজরত ঈসা আ. কে দেখে বললো, হে কলেমাতুল্লাহ! আল্লাহ্তায়ালার নিকট আমার জন্য দোয়া করুন, আমি যেনো উদ্ধার পাই। হজরত ঈসা আ. দোয়া করলেন

يَا خَالِقُ النَّفْسِ وَيَا مُخْلِصُ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ وَيَا مُخْرِجُ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ خَلِّصْهَا -

সঙ্গে সঙ্গে তার সন্তান প্রসব হলো এবং সে সন্তান জীবিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেলো। শায়েখ মুরজানী বলেন, প্রসবকষ্টে উক্ত দোয়া লিখে দেয়া যেতে পারে।

নাক দিয়ে রক্ত পড়া

এই রোগের অনেক দোয়া আছে। তবে নিম্নোক্ত দোয়াটি খুবই পরীক্ষিত। যার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে তার কপালে দোয়াটি লিখে দিতে হয়।

وَقِيْلَ يَاارْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكَ وَيَاسْمَاءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ —

কেউ কেউ মুখ ও নাকের রক্ত দিয়ে উক্ত দোয়া লিখে থাকে। এরূপ করা বৈধ নয়। কারণ রক্ত নাপাক, তাই রক্ত দিয়ে আল্লাহ্র কালাম লেখা নাজায়েয।

সর্বপ্রকার ব্যথা ও বিপদের দোয়া

হজরত সাব্বান ইবনে ওছমান রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম স. কে এরশাদ করতে শুনেছি, সন্ধ্যায় তিনবার নিম্নের দোয়াটি পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত সব ধরনের বালা মুসিবত থেকে নিরাপদে থাকা যায়।

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَئٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ —

আর সকাল বেলা পাঠ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ হওয়া যায়। বর্ণনাকারী আব্বাস ইবনে ওছমান রা. বলেন, যেদিন আমার শরীরে অসাড়তা নেমে এসেছিলো, সেই দিন আমার কাছ থেকে এই হাদীছ শুনেছিলো এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে ছিলো বিস্ময় আর অবিশ্বাস। বুঝতে পেরে আমি বললাম, আমার দিকে তাকিয়ে কী ভাবছো? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার পিতার নামে মিথ্যা অপবাদ দেইনি। আমার পিতাও রসুলেপাক স. এর নামে মিথ্যা বলেননি। তবে যেদিন আমার দেহে এ অসাড়তা আক্রমণ করেছিলো সেইদিন আমি অপরাধ করেছিলাম। অর্থাৎ এই দোয়া পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম। এই হাদীছখানা আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তাকে হাসান ও সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'র জিকির

এই দোয়া পাঠ করলে সত্তরটি বালা মুসিবত থেকে নাজাত পাওয়া যায়। হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত আছে, রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক দশবার এই দোয়া পাঠ করবে সে গোনাহ্ থেকে এমন পাকপবিত্র হবে, মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সন্তান যেমন পবিত্র থাকে। তাছাড়া দুনিয়ার সত্তর প্রকার বালা মুসিবত, যেমন উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠরোগ হওয়া, শ্বেতীরোগ হওয়া ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাবে। তিরমিযী হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল করীম স. এরশাদ করেছেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বেশী বেশী পাঠ করো। এই দোয়া জান্নাতের খাযানা। হজরত মাকহুল র. বলেন

لاَحَوْلَا وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لاَ مَلْجَا وَلاَ مَنْجَا مِنَ اللهِ اِلاَّ اِلَيْهِ -

এই দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ্‌তায়ালা ক্ষতির সাতটি দরজার অন্যতম দরজা দরিদ্রতা বন্ধ করে দিবেন। অর্থাৎ দারিদ্র্য দূর করে দিবেন। তিবরানী হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন– রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ হচ্ছে লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তন্মধ্যে সর্বনিম্নরোগ দুশ্চিন্তা ও যন্ত্রণা। অন্য এক হাদীছে আছে, হজরত আবু মুসা আশআরী রা. বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশ' বার এই দোয়া পাঠ করবে, দারিদ্র্য কখনও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আরেক বর্ণনায় আছে, কেউ অভাব অনটন দূর করতে চাইলে সে যেনো লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বেশী পড়ে। সাইয়্যেদুনা ইমাম জাফর সাদেক র. হজরত আলী মুর্তযা রা. থেকে বর্ণনা করেন নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দিনরাত এই দোয়া পাঠ করবে, দারিদ্র এবং কবরের আযাব তাকে স্পর্শ করবে না। তার জন্য উন্নতির দরজা খুলে যাবে। সাথে সাথে জান্নাতের দরজাও খুলে যাবে। আবদুল হক র. আত্তিব্বুন্নববী কিতাবে একথা উল্লেখ করেছেন।

খাওয়ার সময়ের দোয়া

ইমাম বোখারী র. তাঁর রচিত 'তারিখ' কিতাবে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি খানা সামনে আসার পর এই দোয়া পড়বে, খাদ্য থেকে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمِاءِ فِي الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْهِ رَحْمَةٌ وَّ شِفَاءٌ –

উমউস্সিরইয়ান এর আমল

আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদুনা আলী মুর্তযা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রসুলে করীম স. এরশাদ করেছেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত বলবে, তাহলে বাচ্চার উম্মুস্সিরইয়ান রোগ হবে না। উন্দুলুসীও এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আবদুল হক আত্তিব্বুন্নববী কিতাবেও একথা উল্লেখ করেছেন। উম্মুসসিরইয়ান একটি বাতাস জাতীয় রোগ, যা সাধারণত ছোট বাচ্চাদেরকে আক্রমণ করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বাতাস ঊর্ধ্বমুখি হয়ে মন ও মগজকে ঘিরে ফেলে। বাচ্চা তখন অস্থির হয়ে ছটফট করতে থাকে এবং তার শরীর খিঁচুনী দিয়ে শক্ত হয়ে যায়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কানে আযান এবং একামত দেয়া হয় এ জন্য যে, বাচ্চার কানে সর্বপ্রম যে আওয়াজটি পড়ে, তাহলো কালেমা শাহাদত যা আল্লাহ্তায়ালার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশক উচ্চারণ। এভাবে পৃথিবীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ইসলামের তালকীন দেয়া হয়। হেকমত হচ্ছে, এতে শয়তান দূর হয়ে যায়।

হাফীজে রমজানের দোয়া

দোয়াটি হচ্ছে

لاَ اِلٰهَ اِلَّاذَكَ بِاللّٰهِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ الْعَلِيْمٌ بِاللّٰهِ مُحِيْطٌ بِه عَلَّمَكَ كَيَعْلَمُوْنَ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَزِيْرًا –

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার লেখক বলেন, আমাদের শায়েখকে বলতে শুনেছি, ইয়ামন, মক্কা, মিশর ও অন্যান্য দেশে এ দোয়াটি প্রচলিত। তারা এই দোয়াকে হাফীজে রমজান বলে থাকে। এ দোয়ার তাছীর এই যে, এর আমল করলে

পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে মৃত্যু হওয়া এবং চুরি হওয়া ইত্যাদি থেকে হেফাজতে থাকা যায়। নিয়ম হচ্ছে, রমজান মাসের শেষ জুমার দিন এই দোয়া পড়তে হয়।

ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে নবী করীম স. এর চিকিৎসা

নবী করীম স. তিব্বী দাওয়া অর্থাৎ খাদ্য বা পানীয় বস্তুর মাধ্যমেও কোনো কোনো সময় চিকিৎসা করেছেন। নবী করীম স. এর তিব্বিয়া চিকিৎসা ছিলো ওহীর মাধ্যমে। হাঁ, কোনো কোনো সময় কিয়াস, এজতেহাদ ও অভিজ্ঞতার আলোকেও তিনি চিকিৎসা করেছেন।

তিব্বিয়া চিকিৎসা করে থাকলেও রূহানী চিকিৎসার উপরই তিনি গুরুত্ব দিতেন বেশী। কেনোনা এটা অধিকতর পূর্ণ ও উচ্চ মর্যাদাশালী এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এক হাদীছে পাওয়া যায়, তিনি পাতলা পায়খানার ক্ষেত্রে মধু খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর কাছে এসে বললো, আমার ভাইয়ের পেটের অসুখ হয়েছে। আরেক বর্ণনায় এসেছে, তার পাতলা পায়খানা হচ্ছে। রসুলেপাক স. তাকে মধুপান করানোর কথা বললেন। তাকে মধু পান করানো হলো। এতে আরও বেশী করে তার দাস্ত হতে লাগলো। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা সত্য বলেছেন (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে তার চিকিৎসা সম্পর্কে যা বলে দিয়েছেন তা সত্য) কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছে। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, তৃতীয়বারও তাকে তাই করতে বললেন। তারপর চতুর্থবার সে এলে রসুলেপাক স. তাকে একই হুকুম দিলেন। তাতে তার দাস্ত আরও বেড়ে গেলো। ইমাম আহমদের বর্ণনায় আছে, চতুর্থবার জানানোর পর যখন রসুলেপাক স. তাকে মধু পান করাতে বললেন, তখন তাকে আবার মধুপান করানো হলো এবং এতে তার দাস্ত বন্ধ হয়ে গেলো। তখনই রসুলেপাক স. বলেছিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা সত্য বলেছেন, তোমার ভাইয়ের পেটই মিথ্যা বলছে। হাদীছ শরীফে এসেছে, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছে। হেজাযবাসীগণ বলেন 'মিথ্যা বলেছে' কথার অর্থ 'ভুল করেছে'। যেমন বলা হয়ে থাকে 'তোমার কান মিথ্যা শুনেছে' মানে শুনতে ভুল করেছে। সুতরাং হাদীছ শরীফের অর্থ হবে যা বলা হয়েছে তা সত্যই কিন্তু তোমার কৃতকর্মে ভুলের সংমিশ্রণ রয়েছে। পেট মিথ্যা বলেছে এ কথার অর্থ এই নয় যে, নবী করীম স. এর দেয়া দাওয়ার ধারণ ক্ষমতা তার নেই। সে তার উপযুক্ত নয়– এ রকম চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। বরং তার কাজে ভুলভ্রান্তি ছিলো। তাই ঔষধ কাজ করছিলো না।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. বলেন, মধুপানের নির্দেশ সম্ভবতঃ ওহীর আলোকেই হয়েছিলো। ওহীর মাধ্যমে তিনি হয়তো জানতে পেরেছিলেন, মধুর দ্বারাই লোকটির

পেটের পীড়া দূর হয়ে যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে যখন তার ফল পরিলক্ষিত হলো না, তখন লোকটি হয়তোবা সন্দেহ করেছিলো। আর সে কারণে রসুলেপাক স. 'তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছে'– এই মন্তব্য করেছিলেন।

কিছু কিছু ধর্মদ্রোহী এমন বলে থাকে, মধু দেহের মধ্যে প্রবাহ সৃষ্টিকারী একটি পদার্থ। পাতলা পায়খানা নামক দৈহিক তরল প্রবাহ দূরীকরণার্থে মধুর ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হলো কেনো? তাদের মস্তিষ্কে এ ধরনের প্রশ্নের উদয় হওয়া সম্পর্কে কোরআন করীমই পরিষ্কারভাবে নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে 'তাদের সংকীর্ণ জ্ঞান যা আয়ত্ত করতে পারেনি, সে ব্যাপারে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।' চিকিৎসকগণ একমত যে, কোনো রোগের চিকিৎসা রোগীর বয়স, অভ্যাস, সময়, গৃহীত খাদ্য, ব্যবস্থাপনা এবং শারীরিক শক্তি অনুসারে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

পেট থেকে তরল প্রবাহ সৃষ্টি হওয়া সাধারণত অপছন্দনীয় খাদ্য গ্রহণের কারণে হয়ে থাকে। সে খাদ্য পেটে প্রবেশ করে বদহযমের কারণ সৃষ্টি করে। আর সে বদহযম থেকে দাস্ত বা তরল প্রবাহ সৃষ্টি হয়। আর চিকিৎসকগণ তো এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, পাতলা পায়খানার চিকিৎসা হচ্ছে বদহযমের আছর দূর করে দেয়া। আর সেটা পেটের ভিতর থেকে দূর করতে হলে তরল প্রবাহ সৃষ্টি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মধু যদি প্রবাহ সৃষ্টিকারী পদার্থই হয়, তাহলে তা উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক ভূমিকাই রাখবে। কাজেই বদহযমের সঞ্চিত বর্জ্যগুলো পেট থেকে বের করার জন্য নবী করীম স. মধু পান করানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্‌র হাবীব স. কতইনা সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার প্রয়োগ করেছিলেন। খাদ্যগ্রহণ ও হযম কাজের প্রতিবন্ধক উপসর্গকে দূর করে দিয়ে পাকস্থলীকে খাদ্যগ্রহণের উপযোগী করে তুলতে পারে এমন ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন।

পাকস্থলীতে খাদ্যকণা কিছু কিছু জমে থাকে। সেগুলোর সাথে কোনো চটচটে পদার্থ মিশ্রিত হলে পাকস্থলীতে বৈকল্যের সৃষ্টি হয়। সে তখন স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। তখনই হযমে ব্যাঘাত দেখা দেয় এবং ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যগুলোকে পঁচিয়ে ফেলে। কাজেই তখন এমন ঔষধের প্রয়োজন, যে ঔষধ দুষিত জিনিসগুলো পেট থেকে বের করে দিতে পারে। এ হিশেবে মধুর চেয়ে অধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, কার্যকর এবং উপকারী আর কিছু হতে পারে না। বিশেষ করে মধুকে যখন গরম পানির সাথে মিশিয়ে অল্প অল্প করে পান করানো হয়। অল্প অল্প করে বার বার মধু পান করানোর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম কারণ আছে। তা হচ্ছে, ঔষধের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত, যা রোগীর অবস্থার অনুকূলে হয়। রোগ অনুপাতে ঔষধের পরিমাণ কম হলে রোগ সম্পূর্ণভাবে সারবে না। আর বেশী হয়ে

গেলে বরদাশত হবে না। দেহের শক্তি কমে আসবে। রোগের মাত্রা বেড়ে যাবে। তাই দেহের শক্তি এবং রোগের প্রকোপ অনুসারে মধু অল্প অল্প করে না দেয়া হলে তরল প্রবাহ আরও বাড়বে। এজন্যই বারবার মধু পান করানোর হুকুম দেয়া হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো, আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছে। অবশেষে মধুর পরিমাণ যখন এমন হলো, যতটুকু পেটের উপসর্গগুলো বের করে দিতে সক্ষম, তখনই এর উপকারিতা ও কার্যকারিতা প্রকাশ পেলো।

আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী মুর্তযা রা. থেকে বর্ণিত, যখন কেউ কোনো রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যাবে, অন্য এক বর্ণনায় আছে, যখন তুমি কোনো রোগ থেকে আরোগ্য চাইবে, তখন এই কাজটি করবে— নিজের স্ত্রীকে দেয়া মহরের টাকা থেকে কিছু নিয়ে সেই টাকা দিয়ে মধু কিনতে হবে। তারপর আল্লাহ্র কিতাব থেকে কোনো কোনো আয়াতে শেফা পেয়ালায় লিখবে। লেখাটুকু বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে তার সাথে মধু মিশ্রিত করে পান করবে। আল্লাহ্তায়ালা শেফা দান করবেন। এ আমলটি করার পিছনে কোনো কোনো আলেম যুক্তি দেখিয়ে থাকেন, আল্লাহ্তায়ালা কোরআনে পাকে এরশাদ করেছেন আমি কোরআনে উহাই নাযিল করেছি, যা মানুষের জন্য শেফা। বৃষ্টির পানিতে বরকত আছে, এ সম্পর্কে কোরআনে পাকে বলা হয়েছে 'আমি আকাশ থেকে বরকতময় পানি বর্ষণ করে থাকি'। আরও বলা হয়েছে, 'পবিত্র পানি বর্ষণ করে থাকি।' মহরের টাকায় বরকতের ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, তোমাদের স্ত্রীগণ যদি তাদের মহরের অর্থ থেকে মনের খুশিতে কিছু প্রদান করে, তাহলে তা মনের খুশিতে খাও। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে 'মধুর মধ্যে মানুষের জন্য শেফা রয়েছে।' শেফা ও বরকতের সামগ্রীগুলো প্রস্তুত হয়ে গেলে আল্লাহ্তায়ালা অবশ্যই শেফাদান করবেন। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত শেফা প্রদানকারী।

স্বপ্ন ও তার তাবীর সংক্রান্ত আলোচনা

তাবীর শব্দের অর্থ হচ্ছে তাফসীর বা ব্যাখ্যা। রুইয়া শব্দের অর্থ ঘুমন্ত অবস্থায় কিছু দেখা বা স্বপ্ন দেখা। তাবীরে রুইয়া মানে স্বপ্নের ব্যাখ্যা। রুইয়া বা স্বপ্ন কী? এর বাস্তবতা নিয়ে তর্কবিদ বা দার্শনিকগণ আলোচনা করেছেন। দ্বীনি জ্ঞানে জ্ঞানবান ব্যক্তিগণও এর যথার্থতা নিয়ে আলোচনা পেশ করেছেন। এ সম্পর্কে মেশকাত শরীফের শরাহ গ্রন্থে আলোচনা রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাব থেকে সংকলিত করে এখানে উপস্থাপন করা হলো।

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী ছিলেন মালেকী মাযহাবের অন্যতম বড় আলেম। তিনি বলেন, স্বপ্ন এমন একটি অনুভূতি যা আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরেশতার মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থায় অথবা রূপক অবস্থায় বান্দার নিকট প্রকাশ করেন। স্বপ্ন শয়তানের মাধ্যমেও প্রকাশ পেতে পারে।

হাকিম এবং উকাইলী র. বর্ণনা করেছেন, একদা সাইয়্যেদুনা ওমর ফারুক রা. সাইয়্যেদুনা হজরত আলী মুর্তযা রা. কে বললেন, হে হাসানের পিতা! এক ব্যক্তি একটি স্বপ্ন দেখেছে, তার কিছু অংশ সত্য আর কিছু অংশ মিথ্যা মনে হয়। তিনি বললেন, হাঁ, আমি রসুল করীম স. কে বলতে শুনেছি, মানুষ গভীর নিদ্রায় অচেতন হলে তার রূহ আরশের দিকে উড়ে যায়। তখন ওই আরশ থেকে যা প্রকাশ পায়, তাই সে স্বপ্নের আকারে দেখে থাকে। আর যে রূহ আরশের নীচে থেকে যায়, তার দর্শন হয় মিথ্যা। ইমাম যাহাবী এই হাদীছকে সহীহ বলেননি।

ইবনে কাইয়্যুম এক হাদীছে বর্ণনা করেন, মুসলমানের সাথে আল্লাহ্‌তায়ালা যে কালাম করেন, তাই হচ্ছে মুসলমানের স্বপ্ন। অর্থাৎ কোনো মানুষের জন্য এটা সম্ভব ও সমীচীন নয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তার সঙ্গে কথা বলবেন। বললে ওহীর মাধ্যমে, না হয় পর্দার অন্তরাল থেকে বলবেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন, কোনো মুফাসসির 'পর্দার অন্তরাল থেকে কথা ' এর অর্থ করেন স্বপ্ন। আল্লাহ্‌তায়ালা নবীর সঙ্গে কথা বললে তার নাম হবে ওহী। আর স্বপ্নের মাধ্যমে বললে সেটাও ওহী। নবীর কাছে আসা ওহী হোক বা স্বপ্ন হোক, তার মধ্যে কোনোরূপ মিথ্যার মিশ্রণ নেই। কেনোনা নবীগণ সকলেই সবসময় আল্লাহ্‌তায়ালার নেগাবানী এবং ইসমতের মধ্যে অবস্থান করেন। নবী ছাড়া অন্য কোনো মানুষের কাছে ওহী আসা সম্ভবই নয়। তারা স্বপ্ন দেখতে পারেন। আর সেই স্বপ্ন আল্লাহ্‌পাকের তরফ থেকে এলহাম স্বরূপও হতে পারে। আবার শয়তানও কোনো আকৃতি বানিয়ে তাকে স্বপ্ন দেখাতে পারে। অর্থাৎ স্বপ্ন যে সবটুকুই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, সে নিশ্চয়তা নেই।

বোখারী শরীফে হজরত আনাস রা থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, নেককার লোকের ভালো স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ। এই হাদীছ দ্বারা নেককার লোকের অধিকাংশ স্বপ্ন ভালো এবং সত্য হয়ে থাকে, এটাই বুঝানো হয়েছে। নেককার লোক কোনো কোনো সময় দুঃস্বপ্ন এবং পেরেশানীর স্বপ্নও দেখে থাকেন, কিন্তু তা বিরল। আরেকটি কারণও রয়েছে। সেটা হচ্ছে, নেককার লোকের উপর শয়তানের প্রতিপত্তি খুবই কম। কিন্তু গোনাহ্‌গারের উপর শয়তানের প্রভাবপ্রতিপত্তি পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে।

উল্লিখিত হাদীছ থেকে একটা জটিলতার উদ্ভব হয়— স্বপ্ন নবুওয়াতের অংশ হতে পারে কেমন করে। নবী করীম স. এর মাধ্যমে তো নবুওয়াতের ধারা

সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উত্তর এই যে, নবী করীম স. এর দেখা স্বপ্ন প্রকৃতই নবুওয়াতের অংশ। আর নবী ছাড়া অন্যের স্বপ্ন মাজাযী বা রূপকভাবে, উদাহরণিক হিসেবে। অর্থাৎ নবুওয়াতের মাধ্যমে যেমন এলেম হাসিল হয়, স্বপ্নের মাধ্যমে সেরকম আংশিক এলেম হাসিল হয়ে থাকে।

কেউ কেউ বলেন, নবুওয়াতের অংশ মানে নবুওয়াতের এলেমের অংশ। কেনোনা নবুওয়াতের সিলসিলা বা ধারা বন্ধ হয়ে গেলেও তার এলেম এখনও বিদ্যমান।

ইমাম মালেক র. কে লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিলো, সব মানুষই কি স্বপ্নের তাবীর বলতে পারে? প্রশ্নের ভঙ্গিতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, নবুওয়াত নিয়ে কি খেলা করা যায়? তারপর তিনি বলেছিলেন, স্বপ্ন নবুওয়াতের অংশ। তাঁর একথার তাৎপর্য পূর্বের আলোচনার আলোকেই বুঝে নিতে হবে।

স্বপ্ন নবুওয়াতের অংশ– কথাটির তাৎপর্য কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি উচ্চকণ্ঠে আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লহ বলে তাহলে তাকে মুয়াজ্জিন বলা যাবে না। তেমনি নবুওয়াতের অংশ স্বপ্ন– কেউ তা দেখলেই তাকে নবী বলা যাবে না। সাইয়্যেদা হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, আমার পর বাশারাত অর্থাৎ সুসংবাদ প্রদানের সিলসিলা আর জারী থাকবে না। কিন্তু সুস্বপ্ন জারী থাকবে।

ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ র. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। নবী করীম স. যে অসুখে পড়ে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, সে অসুখের সময় একদিন তিনি হুজরা শরীফের পর্দা উঠিয়ে পবিত্র মস্তক বের করলেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিলো। সাহাবীগণ হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে নামাজের জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। রসুলেপাক স. বললেন, হে লোকসকল! নবুওয়াতের সুসংবাদ দানকারী দুনিয়াতে আর থাকবে না। তবে সুস্বপ্ন অবশ্যই থাকবে।

স্বপ্ন মুসলমানগণ দেখবে এবং তাদেরকে দেখানো হবে। নবী করীম স. যে সুসংবাদের কথা বলেছেন, তা ছিলো আধিক্য ভিত্তিক। ভয়ভীতি প্রদর্শনের স্বপ্নও মুসলমান দেখবে না, এরকম বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। তাও কখনও কখনও দেখবে। আল্লাহ্তায়ালা অত্যন্ত করুণা করে তাঁর প্রিয় বান্দাকে পূর্ব থেকে সাবধান করে দেয়া অথবা কোনোকিছু জানিয়ে দেয়ার জন্য এসব স্বপ্ন দেখাবেন।

ক্বারী আবু বকর ইবনুল আরাবী র. বলেন, স্বপ্নকে প্রকৃত নবুওয়াতের অংশ মনে করা ঠিক হবে না। তবে এই নবুওয়াতের অংশ বলতে রসুলে করীম স. যেরকম অংশ মনে করেছেন, ঠিক সেরকমই মনে করতে হবে। স্বপ্ন সাধারণভাবে নবুওয়াতের অংশ এই হিসেবে যে, নবুওয়াতের মধ্যেও এক ধরনের গায়বী খবর

থাকে। তবে তফসিলী হিসেবে অবশ্যই নয়। তফসিলী হিসেবে হওয়া নবুওয়াতের তফসিলী এলেম হাসিলের উপর নির্ভর করে। ইমাম রাযী র. বলেন, আলেমের জন্য প্রত্যেক জিনিসকে তফসিলী এবং পরিপূর্ণভাবে জানা অপরিহার্য। আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক বিষয়ের এলেমের একটি সীমা রেখেছেন। সুতরাং কোনো কোনো জিনিসকে বান্দা সেই নির্ধারিত সীমা অনুসারে পরিপূর্ণ এবং বিস্তৃতভাবে জানে। আবার কোনো কোনো জিনিসকে সংক্ষিপ্তভাবে জানে।

স্বপ্নের এলেমটিও ঠিক এ ধরনের। স্বপ্ন নবুওয়াতী এলেমের অংশ হওয়া সম্পর্কেও বিভিন্ন রকম বিবরণ আছে। কোনো কোনো বিবরণে বলা হয়েছে, পঁয়তাল্লিশ ভাগের একভাগ। কোনো বর্ণনায় আছে, সত্তর ভাগের একভাগ। কোনো বর্ণনায় আছে, চুয়াত্তর ভাগের এক ভাগ। কোথাও আছে, ছাব্বিশ ভাগের একভাগ। আবার কোথাও আছে চব্বিশ ভাগের একভাগ। বর্ণনাগুলোর বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করা যায় না।

তবে ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ বর্ণনাটি সুবিখ্যাত। জানা যায়, রসুলেপাক স. এর উপর স্বপ্নযোগে ওহী নাযিল হয়েছিলো ছয়মাস। বাকী জিন্দেগীতে জাগ্রত অবস্থায়ই ওহী নাযিল হয়েছিলো। আর তাঁর এ জগতে নবুওয়াতের কাল ছিলো তেইশ বৎসর। সুতরাং তেইশ বৎসর থেকে ছয় মাস ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগই হয়ে থাকে। এ হিসেবেও নবুওয়াতের ছেচল্লিশভাগের একভাগ কথাটি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

খাত্তাবী র. বলেন, স্বপ্ন নবুওয়াতের কতভাগের একভাগ– এ সম্পর্কে তাবীল করে কিছু নির্ধারণ করা আহলে এলেমদের জন্য জরুরী কোনো বিষয় নয়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন রকম সংখ্যার কথা বলা হয়েছে, যার একটিও প্রমাণযোগ্য নয়। আর এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো হাদীছের বর্ণনাও আমরা পাই না এবং দাবিকারীরাও এমন কোনো দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করেননি। যে যাই বলেছেন, আপন আপন ধারণা থেকে বলেছেন। আর ধারণা বাস্তবের ক্ষেত্রে কোনো প্রমাণ রাখতে পারে না। যে বিষয়াবলীর এলেম উহ্য রাখা হয়েছে, সেগুলোকে নামাজের রাকাতের সংখ্যা, রোজার দিনের সংখ্যা এবং হজের কংকরের সংখ্যার ন্যায় নির্ধারণ করা আমাদের জন্য কোনো জরুরী ব্যাপার নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে সংখ্যা নিরূপণ করার দিকে ধাবিত না হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সত্য স্বপ্নের মুহূর্ত

হাদীছ শরীফে এসেছে, সবচেয়ে সত্য স্বপ্ন হচ্ছে সুবেহ সাদেকের স্বপ্ন। হাদীছটি তিরমিযী এবং দারেমী বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরীফে হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল করীম স. বলেছেন, যখন সময়ের দু'টি অংশ পরস্পর মিলিত হয়, মুসলমানের সে সময়ের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না। আর

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বেশী সত্যবাদী তার স্বপ্ন সমধিক সত্য। সময়ের দুই অংশ মিলিত হওয়া সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, রাত্রি এবং দিন যখন মিলিত হয়।

আগুন,পানি, মাটি ও বাতাস– এই চারটি মৌলিক পদার্থের দ্বারা মানুষের দেহ তৈরী। এই চারটি জিনিসের প্রত্যেকটি এই মুহূর্তে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। স্বপ্নবিশারদগণের মতও এই রকম। তাঁরা বলেন, রাত্রি ও দিনের মধ্যে স্বাভাবিকতার যে মুহূর্তটি, সে মুহূর্তের স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্য একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে, স্বাভাবিকতার মুহূর্তকে স্বপ্নের জন্য নির্দিষ্ট করার হেতু কী? আবহাওয়া, পরিবেশ বা মুহূর্তের স্বাভাবিকতার কারণে যদি মানুষের উপর তার কোনো প্রভাব পড়ে, তাহলে তো কাফেরের উপরও পড়তে পারে। তাই বলে কি সে মুহূর্তে কোনো কাফের স্বপ্ন দেখলে তা সত্য হবে এবং তাকে নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ বলে আখ্যায়িত করা যাবে? উত্তর এই যে, কাফেরদের অবস্থা এ প্রসঙ্গে ধর্তব্যের বাইরে। তাদের দেখা স্বপ্নকে সত্য বলা বা মনে করা নিষিদ্ধ। শরীয়তই এ ব্যাপারে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর দ্বিতীয় মতটি এই যে, সময়ের মিলন কথাটির তাৎপর্য কিয়ামতের নিকটবর্তী কাল। এই মতটির সমর্থনে তিরমিযী শরীফের হাদীছ পাওয়া যায়, আখেরী জামানার মুসলমানগণের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না।

বান্দা মিসকীন শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী বলেন, আমি আমার কোনো কোনো মাশায়েখ থেকে শুনেছি, তাঁরা এই সময় বলতে মৃত্যুর কাছাকাছি সময়কে বুঝিয়েছেন। কেউ বলেছেন, ইমাম মেহদী আ. এর আগমনের সময়। তখন হবে আদল ও ইনসাফের সময়। তখন মানুষের শান্তি, নিরাপত্তা ও রিযিকের খায়ের বরকত হবে। কাজেই মানুষের মনে আনন্দ ও প্রফুল্লতা বিরাজ করবে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ঈসা আ. এর আগমনের পর দাজ্জালের সঙ্গে মোকাবেলা করে দাজ্জাল ও তার অনুসারীদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার পর যে সমস্ত লোক পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে, তারা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের মানুষ ছাড়া অন্য সকল মানুষের চেয়ে উন্নত চরিত্রের হবে। অধিক সত্যবাদী হবে। ওই সময় বলতে সে সময়কেই বুঝানো হয়েছে। ‘তোমাদের মধ্যে যার কথা বেশী সত্য তার স্বপ্ন বেশী সত্য’ এই হাদীছের মর্ম অনুসারেও বুঝা যায়, শেষোক্ত কথাটি অধিক যুক্তিসঙ্গত। কেনোনা যারা সত্য কথা বলে, তাদের অন্তর সর্বদাই আলোকিত থাকে এবং তাদের অনুভূতি সুদৃঢ় হয়ে থাকে। জাগ্রত অবস্থায় যে ব্যক্তি শুদ্ধশান্ত, স্বপ্নদর্শন কালেও সে শুদ্ধশান্ত থাকে। তাই তার স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে।

মিথ্যা ও পংকিল কথাবার্তায় যারা অভ্যস্ত, তাদের কাছ থেকে এরকম হওয়া সম্ভব নয়। কেনোনা তাদের অন্তর অন্ধকারাচ্ছাদিত এবং নষ্ট। তাদের স্বপ্ন মিথ্যা এবং পেরেশানীর স্বপ্নই হয়ে থাকে। তবে হাঁ, কখনো কখনো সত্যবাদীও মিথ্যা স্বপ্ন দেখে থাকে, আবার মিথ্যাবাদীও সত্য স্বপ্ন দেখে থাকে। এটা কিন্তু স্বাভাবিক নয়, কদাচিত ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা-ই হয় যা পূর্বে বলা হয়েছে।

হাদীছ শরীফে এসেছে, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন এমন কোনো স্বপ্ন দেখবে, যা তার কাছে খুব প্রিয় ও পছন্দনীয়, তখন আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তার আলোচনা মানুষের কাছে করবে। আর যদি স্বপ্নে এমন কিছু দেখে, যা তার অপছন্দনীয়, তবে মনে করবে এই স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। তখন আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে তার ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা চাইবে। আর সে বিষয়ে মানুষকে কিছু বলবে না এবং মানুষকে ক্ষতি বা দুশ্চিন্তায় ফেলবে না।

হাদীছখানা ইমাম বোখারী র. বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরীফে এসেছে, মন্দ স্বপ্ন শয়তানের দিক থেকে হয়। মন্দ স্বপ্ন দেখলে তা মানুষের কাছে প্রকাশ না করে বামদিকে তিনবার থু থু ফেলবে এবং এসতেগফার করবে। এক বর্ণনায় আছে, খারাপ স্বপ্ন দেখলে পার্শ্ব পরিবর্তন করবে। অন্য বর্ণনায় আছে, নামাজ পড়বে এবং কাউকে বলবে না। তবে হাঁ একান্ত প্রিয়জনের কাছে বলতে পারবে। অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, সৎপরামর্শদানকারী আলেমের কাছে বলতে পারবে এবং আয়াতুল কুরসী পড়বে। এক বর্ণনায় এমনও আছে, স্বপ্ন খেয়ালের পেরেশানী থেকে হয়ে থাকে। একথার অর্থ এই যে, এধরনের স্বপ্ন তাবীর করার পূর্ব পর্যন্ত কোনো ধর্তব্য বিষয় হবে না। তাবীর করা হলে তা বাস্তবে রূপ নেয়। স্বপ্ন সম্পর্কে এমনও বলা আছে, সর্বপ্রথম যে তাবীর করা হবে, বাস্তবে তাই হবে। এই হাদীছখানা অবশ্য দুর্বল। কেনোনা মানুষের নিয়ম হচ্ছে এই রকম যে, কেউ কোনো স্বপ্ন দেখলে তাবীরকারীর কাছে বলে থাকে। বিশুদ্ধ তাবীরকারী পেলে তো কথাই নেই। না পেলে অন্য তাবীরকারীর কাছে ছোটে। স্বপ্নের তাবীর প্রদানকারীর জন্য উচিত, সবসময় ভালো তাবীর করা, যতদূর সম্ভব ভালো দিকে অর্থ নেয়া।

তাবীরকারীদের জন্য রসুলেপাক স. এর নসীহত

সাইয়্যেদা হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণিত আছে, একদা এক রমণী রসুলেপাক স. এর কাছে এসে নিবেদন করলো, আমার স্বামী নিরুদ্দেশ। আমি গর্ভবতী। আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, আমার ঘরের খুঁটি ভেঙে গিয়েছে, আর টেরা চোখবিশিষ্ট একটি সন্তান প্রসব করেছি। রসুল করীম স. স্বপ্নের তাবীর বলে দিলেন, তোমার স্বামী নিরাপদে ফিরে আসবে, আর তুমি সুস্থ সুন্দর ও সৎস্বভাবের একটি সন্তান প্রসব করবে।

মেয়েটি আরেকদিন এলো। তখন রসুলেপাক স. ঘরে ছিলেন না। হজরত আয়েশা রা. বলেন, আমি বুঝতে পারলাম, মহিলা কোনো স্বপ্নের ব্যাপারে জানতে এসেছে। সে আমার কাছে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বললো। আমি তার স্বপ্নের তাবীর করলাম, তোমার স্বপ্ন যদি সঠিক হয়, তাহলে তোমার স্বামী মারা যাবে এবং তুমি একটি কদাকার বাচ্চা জন্ম দিবে। একথা শুনে মেয়েটি কান্নাকাটি শুরু করে দিলো।

এমন সময় রসুলেপাক স. এলেন এবং আমাকে বললেন, আয়েশা এরকম করা ঠিক নয়, তুমি যখন কোনো মুসলমানের স্বপ্নের তাবীর বলবে, তখন তার ভালো দিকটি তুলে ধরবে। ভালো তাবীর করবে। তাবীর যেরকম দেয়া হয়, স্বপ্ন সেরকমই ফলে।

তাবীর সম্পর্কে এও বলা আছে, কোনো তাবীরকারী যখন তাবীর করার ইচ্ছা করবে, তখন খাইরুল্লানাওয়া শাররুল্লিআ দায়িনা অর্থাৎ ভালো আমাদের জন্য, আর মন্দ আমাদের দুশমনদের জন্য– এ দোয়া পড়ে নিয়ে তাবীর করবে। রসুলেপাক স. এরকমই করতেন।

তাবীরকারীগণের জন্য কতিপয় আদব

আহলে এলেমগণ বলে থাকেন, স্বপ্নের তাবীরকারীর জন্য কয়েকটি আদব রয়েছে। যথা সূর্য উদয়কালে, সূর্য হেলে যাওয়ার সময়, সূর্যাস্তের সময় এবং রাত্রিবেলা স্বপ্নের তাবীর করা ঠিক নয়। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার এরকম বলেছেন। তবে তিনি এর কোনো কারণ উল্লেখ করেননি এবং এর স্বপক্ষে কোনো হাদীছের উদ্ধৃতিও দেননি।

এর কারণ হিসেবে যদি এই বলা হয়, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত এই দুই সময় নামাজের জন্য মাকরুহ, তাই নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে বলতে হয় যে, ঠিক দ্বিপ্রহরে যখন সূর্য মাথার উপরে থাকে, সে সময়ের কথা কেনো উল্লেখ করা হলো না। অথচ তার পরবর্তী সময় সূর্য হেলার সময়ের কথা বলা হয়েছে। আর রাতের বেলায় নিষেধ করার কারণই বা কী?

হাদীছ শরীফে তো পরিষ্কার বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. ফজরের নামাজ আদায় করার পর সাহাবীগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে জিজ্ঞেস করতেন, কেউ আজ রাত্রে স্বপ্ন দেখেছো কি? যাঁরা স্বপ্ন দেখতেন, বলতেন। আর তিনি তার তাবীর বলে দিতেন।

'ফজরের নামাজের পর স্বপ্নের তাবীর বলা' এই শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই রয়েছে। এক্ষেত্রে কথা হচ্ছে, রসুলেপাক স. ফজরের নামাজের পর যে তাবীর বলতেন, তা সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বেই বলতেন। সুতরাং সূর্যোদয়কালে

তাবীর বলার নিষিদ্ধতা দলীলের উপর নির্ভরশীল। তবে যে সময়ে নামাজ পড়া মাকরুহ সে সময়ে তাবীর করা যাবে না, ব্যাপারটি স্পষ্ট নয়। কেউ কেউ এরকম বলেছেন, সূর্য উদয়ের পর অনেকটা উঁচুতে উঠে গেলে এবং আসরের ওয়াক্তের আগে থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত– এই সময়ে স্বপ্নের তাবীর বলা মোস্তাহাব– এ কথাটিও বর্ণিত হাদীছ দ্বারা রদ হয়ে যায়। কেনোনা হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. ফজরের নামাজ আদায়ান্তে সাহাবীগণের কাছ থেকে স্বপ্নের ব্যাপারে জানতে চাইতেন। তাতে মনে হয়, এ সময়ই মোস্তাহাব সময়।

রসুলেপাক স. ফজরের পর সাহাবীগণকে স্বপ্নের কথা কেনো জিজ্ঞেস করতেন, তার কারণ সম্পর্কে আহলে এলেমগণ একটি যুক্তি দিয়েছেন। যুক্তিটি হচ্ছে, রসুলেপাক স. মক্কাবিজয়ের সুসংবাদের অপেক্ষায় থাকতেন। কেউ কোনো স্বপ্নের মাধ্যমে এধরণের সুসংবাদ পেয়েছেন কি না, তা জানার জন্যই তিনি ফজরের পর স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করতেন।

তাঁরা এ যুক্তিটিই বা কোথা থেকে পেয়েছেন, বুঝা যায় না। বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, তিনি সাহাবীগণের অবস্থা জানতে চাইতেন। তাঁদের সুলুক কোথায় পৌঁছেছে, তা স্বপ্নে প্রতিভাত হবে এবং তাঁদের পরবর্তী নির্দেশনা কী হবে, এ সমস্ত উদ্দেশ্যেই স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করতেন তিনি।

মাশায়েখে কেরামের একটি দস্তুর আছে। তাঁরা আপন মুরিদগণকে তাদের ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তার প্রতিকার ও চিকিৎসা সম্পর্কে নির্দেশ দান করে থাকেন। এটাও রসুলেপাক স. এর উক্ত সুন্নতের অনুসরণ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

কোনো কোনো আহলে এলেম বলে থাকেন, ফজরের পর স্বপ্নের তাবীর বলা অধিকতর উত্তম। কেনোনা এ সময়টি স্বপ্ন দেখার সময়ের সবচেয়ে নিকটে। তাই স্বপ্নের বর্ণনা প্রদানে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা কম। তাছাড়া এসময় তাবীরকারীর স্মৃতিও থাকে স্বচ্ছ। মন থাকে পবিত্র। কলবে থাকে নূর। জীবিকা অর্জনের চিন্তায় তখনও স্মৃতিবিশৃঙ্খলা শুরু হয় না। তাই এ সময়টি স্বপ্নের তাবীর বলার জন্য উত্তম সময়।

স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য কতিপয় আদব

স্বপ্নদ্রষ্টার আদবসমূহের মধ্যে অন্যতম আদব হচ্ছে, তাকে সত্যবাদী হতে হবে। সুন্নত তরিকায় ডান পার্শ্বে শুয়ে নিদ্রা যেতে হবে। শয়নকালে সুরা ওয়াশ্‌শামস, ওয়াল্লাইল, ওয়াত্তীন, এখলাস, কুলআউযু বিরব্বিল ফালাক্ব ও কুলআউযু বিরব্বিন্নাস পড়তে হবে। তার সাথে সাথে এ দোয়াটিও পড়তে হবে

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَىءٍّ اِلَّا حُلاَمِ وَاسْتَجِيْرُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ –
اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ رُؤْيَا صَالِحَةً صَادِقَةً نَافِعَةً حَافِظَةً غَيْرِ سَمِّيْئُهُ –
اَللَّهُمَّ اَرِنِيْ فِي مَنَامِيْ مَااُحِبُ –

আরেকটি আদব হচ্ছে স্বপ্ন কোনো দুশমন অথবা মূর্খলোকের নিকট না বলা।

স্বপ্নের প্রকার

স্বপ্ন সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক প্রকার, যাকে কোরআন মজীদে আদগাছে আহলাম বলা হয়েছে, যার অর্থ মিথ্যা ও বাজে স্বপ্ন। জাগ্রত অবস্থায় অলস ও কুচিন্তাযুক্ত মাথা থেকে যেমন বাজে খেয়াল ও বাজে পেরেশানী জন্ম নেয়, স্বপ্নেও ওই রকমই হয়ে থাকে। এ জাতীয় স্বপ্ন কোনো ধর্তব্য বিষয় নয়। এগুলোর কোনো তাবীর হয় না। অধিকাংশ সময় এ জাতীয় স্বপ্ন শয়তান দেখিয়ে থাকে। দর্শনকারীকে চিন্তিত করে তোলাই শয়তানের উদ্দেশ্য।

যেমন, কোনো ব্যক্তি দেখলো তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা দুশমন দ্বারা সে আক্রান্ত হচ্ছে, অথবা কোনো ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে, তা থেকে সে কোনোক্রমেই উদ্ধার পাচ্ছে না ইত্যাদি। এগুলো শয়তান কর্তৃক প্রদর্শিত দুঃস্বপ্ন।

মুসলিম শরীফে হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক বেদুইন রসুলে করীম স. কে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মাথা কাটা হয়েছে। রসুলেপাক স. বললেন, স্বপ্নে শয়তান তোমার সঙ্গে কৌতুক করেছে। একথা কাউকে বলো না।

এজাতীয় স্বপ্নগুলো এরকম– যেমন কেউ দেখলো, কোনো ফেরেশতা তাকে একটি হারাম কাজ করার হুকুম দিচ্ছে। অথবা এমন হুকুম দিচ্ছে, যা তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। অথবা জাগ্রত অবস্থায় যে কোনো একটি অসম্ভব বিষয় নিয়ে সে চিন্তা করেছিলো, স্বপ্নে সে তাই দেখতে পেয়েছে। অথবা মানুষের মধ্যে যে চারটি মৌলিক পদার্থ রয়েছে তার কোনো একটি প্রবল হলে সেটাকেই সে স্বপ্নযোগে দেখে থাকে। কোনো মানুষের দেহে জলীয় ভাগ বেশী থাকলে সে স্বপ্নে পানি দেখতে পায়। কারও দেহে যদি হরিদ্রা ভাব বেশী থাকে, সে স্বপ্নে আগুন অথবা হলুদ রঙ দেখে থাকে। লৌহকণিকা বেশী থাকলে, লাল বর্ণ দেখে। কৃষ্ণতার প্রাবল্য থাকলে দেখে কালো রঙ অথবা কালো অন্ধকার। এজাতীয় সমস্ত স্বপ্নই উপেক্ষণীয়।

স্বপ্নের দ্বিতীয় প্রকার, যাকে বলা হয় রুইয়া সাদেকা, যেমন আম্বিয়া কেরামের স্বপ্ন এবং সুলাহায়ে উম্মত অর্থাৎ উম্মতের নেককার লোকদের স্বপ্ন। রুইয়া সাদেকা ছাড়াও তার আরও দুটি নাম রয়েছে– রুইয়া সালেহা এবং রুইয়া হাসানা। বাহ্যতঃ সবগুলোর অর্থ একই। কিন্তু কোনো কোনো লোক এগুলোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে থাকেন। যেমন যে স্বপ্ন সত্য, তাকে সাদেকা বলা হয়। আর হৃদয়ের বাসনা অনুসারে যে স্বপ্ন দেখা হয় তাকে সালেহা বা হাসানা বলা হয়। আম্বিয়া কেরাম এবং নেককার লোকদের স্বপ্ন সাধারণত আখেরাতের বিষয়াদির সাথে সম্পর্ক রাখে। দুনিয়াবী ব্যাপারে দৃষ্ট স্বপ্ন বিস্ময়কর হয়, তবে মনের আশানুরূপ নাও হতে পারে। যেমন রসুলেপাক স. উহুদযুদ্ধের সময় স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি গরু যবেহ করছেন। যবেহ করার পর তলোয়ারের দিকে যখন নযর করলেন, দেখলেন তা ভাঙা। রসুলেপাক স. গরু যবেহ করার তাবীর করেছিলেন, সাহাবা কেরামের কেউ কেউ শহীদ হচ্ছেন। আর ভাঙা তলোয়ার দেখার তাবীর করেছিলেন, আহলে বাইতের শহীদ হবেন একজন। তাই হয়েছিলো। ওই যুদ্ধে হজরত হামযা রা. শহীদ হয়েছিলেন।

স্বপ্নদ্রষ্টারা সাধারণত তিন প্রকারের হয়ে থাকে। ১. যাদের অবস্থা আচ্ছন্ন— সত্য, মিথ্যা উভয় দিকই তাদের মধ্যে থাকতে পারে। ২. ফাসেক ফাজের ব্যক্তি— বিক্ষিপ্ত চিন্তা, কুকামনা ও বদ্ খেয়াল যাদের মধ্যে প্রবল। তাদের স্বপ্নে মিথ্যার দিক প্রবল থাকে। সত্যের দিক অতি দুর্লভ। ৩. কাফের ব্যক্তি, তার স্বপ্নে সত্যের লেশ নেই বললেই চলে। অবশ্য তাদের স্বপ্ন কোনো কোনো সময় সত্য হয়। যেমন হজরত ইউসুফ আ. এর সঙ্গে জেলখানায় যে দুজন কয়েদী ছিলো, তাদের স্বপ্ন। তাছাড়া ওই সময়ের বাদশাহ্র স্বপ্ন।

হাদীছ শরীফে এসেছে, শেষ রাত্রের স্বপ্ন বেশী সত্য হয়। আহলে এলেমগণ বলে থাকেন, রাতের প্রথম দিকের স্বপ্ন দেরীতে ফলে। দ্বিতীয়ার্ধের স্বপ্ন কখনও সত্য হয়। আবার কখনও মিথ্যা হয়। কখনও তাড়াতাড়ি ফলে। আবার কখনও দেরীতে ফলে। শেষ রাত্রের স্বপ্ন খুব তাড়াতাড়ি ফলে থাকে। বিশেষ করে সুবেহ সাদেকের স্বপ্ন।

ইমাম জাফর সাদেক র. বলেছেন, দুপুরে কায়লুলার সময়ের স্বপ্ন অত্যন্ত দ্রুত বাস্তবায়িত হয়। মোহাম্মদ ইবনে শিরীন, যিনি স্বপ্নবিশারদ রূপে খ্যাত, তিনি বলেছেন, দিবাভাগের স্বপ্ন রাতের স্বপ্নের মতোই। মেয়েদের স্বপ্নের তাবীর পুরুষদের মতোই। কেউ কেউ বলেছেন, নারীরা যদি এমন কোনো স্বপ্ন দেখে, যা তার যোগ্য নয়, তাহলে মনে করতে হবে, তা তার স্বামীর ক্ষেত্রে ঘটবে। ঠিক তেমনি কোনো গোলাম যদি এমন স্বপ্ন দেখে, যা তার যোগ্য নয়, তাহলে মনে করতে হবে তা তার মনীবের। তেমনি ছেলে মেয়েদের স্বপ্ন তাদের পিতা মাতার বেলায় গ্রহণীয় হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

নবী করীম স. যে সমস্ত স্বপ্ন দেখেছেন

রসুলেপাক স. বহু স্বপ্ন দেখেছেন এবং নিজে তার তাবীরও করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম স্বপ্ন ছিলো দুধ দেখা। তিনি তার তাবীর করেছেন দ্বীনের এলেম। বোখারী শরীফে হজরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি স. তার তাবীর করেছেন দ্বীনের এলেম। বোখারী শরীফে হজরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রসুল মকবুল স. কে বলতে শুনেছি, আমি নিদ্রিত ছিলাম। আমার নিকট একটি দুধের পেয়ালা আনা হলো। আমি সে পেয়ালা থেকে এতোবেশী দুধ পান করলাম যে, আমার মুখমণ্ডলে পরিতৃপ্ততা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আমি এতো বেশী পরিমাণে দুধ পান করলাম যে, দেখতে পেলাম আমার দেহের শিরা-উপশিরায় দুধ প্রবাহিত হলো। কিছু অবশিষ্ট ছিলো, তা আমি ওমরকে দিলাম। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এর তাবীর কী? তিনি স. বললেন, এর অর্থ দ্বীনের এলেম। শায়েখ ইবনে আবী জমরা র. বলেন, দুধ দেখার তাবীর যে এলেম হাসিল হওয়া, রসুল করীম স. একথা মেরাজের ঘটনা দ্বারা বুঝেছিলেন। শবে মেরাজে সর্বপ্রথম রসুলেপাক স. এর সামনে হাজির করা হয়েছিলো দুধ এবং শরাবের পেয়ালা। যে কোনো একটি গ্রহণ করার অধিকার তাঁকে দেয়া হয়েছিলো। তিনি দুধ পছন্দ করেছিলেন। তখন জিব্‌রাইল আ. বলেছিলেন, আপনি ফিতরত অর্থাৎ দ্বীনকেই পছন্দ করেছেন। কোনো কোনো মরফু হাদীছে দুধের তাবীর ফিতরত হিসেবেও এসেছে। কোনো বর্ণনায় এসেছে এলেম। দুধের তাবীর এলেম হওয়ার যৌক্তিকতা হচ্ছে, দুধের মধ্যে উপকারিতা অত্যধিক, তেমনি এলেমের উপকারিতাও অনেক। দুধ শরীরকে পুষ্ট করে। এলেম পুষ্ট করে রূহকে। বান্দা মিসকীন শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী বলছেন, এ অধমও রসুলেপাক স. এর দানকৃত সদকার কিছু অংশ পেয়েছে। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে শাদা ও সুস্বাদু দুধে ভর্তি একটি পেয়ালা দেখলাম। আমি সেই দুধ পান করলাম। আলহামদুলিল্লাহি আলা যালিক।

রসুলেপাক স. আরেকবার স্বপ্নে দেখেছিলেন একটি কামিয। তার তাবীর করেছিলেন, দ্বীন। ইমাম বোখারী র. আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলে বারিক স. এরশাদ করেছেন, আমি একদা নিদ্রিত ছিলাম। দেখি, আমার সামনে কিছু লোক। তাদের গায়ে বিভিন্ন আকারের কামীয, কারও কামীয বুক পর্যন্ত, কারও কামিয অত্যন্ত সংকীর্ণ যা গায়ে দেয়ার সময় গলায় আটকে যায়। আমার সামনে দিয়ে ওমর কে হেঁটে যেতে দেখলাম। তার কামীযটি ছিলো অত্যন্ত লম্বা, যা যমীন স্পর্শ করছিলো। হাদীছ শরীফে 'ওয়ান' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ দুটি ১. অত্যন্ত সংকীর্ণ জামা যা পরিধানের সময় গলায় আটকে

যায়। ২. নাভী পর্যন্ত পৌঁছে এমন জামা। হাকীম তিরমিযী র. নুরুল সুমুল কিতাবে বর্ণনা করেছেন, কিছু লোকের কামীয নাভী পর্যন্ত ছিলো। কারও ছিলো নিসফে সাক পর্যন্ত। রসুলেপাক স. এই স্বপ্নের তাবীর করেছেন দ্বীন অর্জনের নিদর্শনরূপে। যার কামীয যতটুকু লম্বা, তার মধ্যে দ্বীন হাসিল হবে সে পরিমাণে এটাই ছিলো তাঁর তাবীর। যৌক্তিকতা হচ্ছে, কামীয দুনিয়াতে দেহের সতরকে আচ্ছাদিত করে, তেমনি আখেরাতের ব্যাপারেও পর্দাপুশি করে এবং মাকরুহ কাজ থেকে বাঁচায়। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, তাকওয়ার লেবাসই উত্তম লেবাস। কামীয সীনা পর্যন্ত, অর্থ হচ্ছে, কিছু সংখ্যক লোক কুফুরী থেকে সীনাকে বাঁচাবে কিন্তু কবীরা গোনাহ্ থেকে বাঁচতে পারবেনা। কামীয নাভী পর্যন্ত, তার অর্থ তার লজ্জাস্থান এবং পা বেআব্রু। সুতরাং সে গোনাহ্র দিকে চলবে। যাদের কামীয পা পর্যন্ত লম্বা, তারা তাকওয়া দ্বারা সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত রাখবে। যার কামীয যমীন স্পর্শ করবে সে নেক আমলের ক্ষেত্রে কামেল। রসুলেপাক স. যাদেরকে দেখলেন তাঁরা সাধারণ উম্মত হতে পারেন, আবার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিও হতে পারেন। রসুলেপাক স. এর স্বপ্নসংক্রান্ত বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উম্মতের দ্বীনদার লোকদের মধ্যেও মর্যাদার তারতম্য থাকবে। সকল দ্বীনদার লোক একই রকম মর্যাদার অধিকারী হতে পারবেন না।

রসুলেপাক স. আরেকটি স্বপ্ন দেখেছিলেন এরকম— তাঁর হাতে দুটি চুড়ি পরিয়ে দেয়া হয়েছে। মিথ্যা নবীর আবির্ভাব হবে বলে তিনি স্বপ্নটির তাবীর করেছিলেন। হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, একদা আমি নিদ্রামগ্ন ছিলাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমাকে পৃথিবীর ভাণ্ডার দান করা হয়েছে। এর দ্বারা কায়সার ও কেসরার রাজত্বকে বুঝানো হয়েছে, যা তাঁর উম্মতের মাধ্যমে পরবর্তীতে বিজিত হয়েছিলো। দুনিয়ার স্বর্ণরৌপ্যের খনিও অর্থ হতে পারে, যা তাঁর উম্মতের জন্য আল্লাহ্তায়ালা নির্ধারিত করে রেখেছেন।

রসুলেপাক স. বলেন, আমার দু হাতে দুটি স্বর্ণের চুড়ি পরিয়ে দেয়া হলে আমার খুব খারাপ লাগলো। খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ওহীর নির্দেশ এলো— চুড়ি দুটিতে ফুঁ দাও। ফুঁ দিতেই দেখলাম, চুড়িদুটো নেই। এক বর্ণনায় আছে, সেগুলো উড়ে গেলো। রসুলেপাক স. বলেন, চুড়ি দু'টির তাবীর এই যে, আমি বর্তমানে দু'জন মিথ্যা নবীর মধ্যবর্তী স্থানে আছি। এক মিথ্যা নবী ছিলো সাফা পর্বতের মধ্যে। আরেকজন ছিলো ইয়ামামায়। সে নবুওয়াত দাবি করেছিলো। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের একজনের নাম ছিলো আসওয়াদ আনাসী। সে সিলো ইয়ামন প্রদেশের। রসুলেপাক স. এর ওফাতের পূর্বেই ফিরোজ দায়লামীর হাতে সে নিহত হয়েছিলো। অপর মিথ্যা নবী ছিলো মুসায়লামা কায্যাব। সে

ইয়ামামায় নবুওয়াত দাবি করেছিলো। ইয়ামামা হেজাজের একটি শহরের নাম। হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর খলাফতকালে তাকে হত্যা করা হয়।

আহলে এলেমগণ বলেন, কোনো জিনিসকে যথাস্থানে না রাখা হলে তাকে বলা হয় কিযর বা মিথ্যাচার। চুড়ির স্থান রসুলেপাক স. এর হাত নয়। সে হিসেবে নবুওয়াতের স্থানও ওই দুই ব্যক্তি নয়। কাজেই তারা মিথ্যা নবী। দুই কব্জিতে দুটি চুড়ি দেখা রসুলেপাক স. এর জন্য স্বাভাবিক নয়। চুড়ি রমণীদের অলংকার। এখানে আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, স্বর্ণ পুরুষের জন্যে পরিধান করা নিষিদ্ধ। স্বর্ণের আরবী হচ্ছে যাহাবুন যা যেহাবুন থেকে এসেছে।

যেহাবুন এর অর্থ চলে যাওয়া। স্বর্ণ মানুষের হাত থেকে চলে যায়। স্থায়ী থাকে না। একারণেই রসুলেপাক স. তাবীর করলেন, যারা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ফেতনা বেশী দিন টিকবে না। স্বপ্নে আল্লাহ্তায়ালা হুকুম করেছিলেন চুড়ির উপর ফুঁ দিতে। এর তাবীর, এ ফেতনা বেশী দিন স্থায়ী হবে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন, স্বপ্নের তাবীর বাস্তবে রূপ লাভ করেছিলো এভাবে যে, সাফা ও ইয়ামামার লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। শুধু তাই নয়, তারা ইসলামের সাহায্যকারীও হয়েছিলো। পরবর্তীতে যখন দুই শহরে দুজন মিথ্যা নবী আত্মপ্রকাশ করেছিলো, তখন তাদের সুন্দর সুন্দর চটকদার বাক্য শুনে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় নিপতিত হয়েছিলো। ব্যাপারটি এমন হয়েছিলো, যেনো সেই দুই শহরের লোকগুলো সম্মিলিতভাবে দু'টি শহর আর দু'টি চুড়ি দুই মিথ্যা নবী। স্বপ্নের তাবীর এই দৃষ্টিকোণ থেকেও হতে পারে। কোনো কোনো আহলে এলেম এই স্বপ্নের তাবীর এভাবেও করে থাকেন যে, দুই হাতে দুই চুড়ি দেখার মানে হাতকে বেঁধে দেয়া অর্থাৎ নবুওয়াতের তৎপরতা থেকে তাঁকে বাধা প্রদান করা, দুই মিথ্যা নবী রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতের কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিলো। তাইয়্যেবী এরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

রসুলেপাক স. আরেকটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। কালো কুৎসিত এক জটা চুলধারী রমণী মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হয়ে গেলো। তিনি স. এর তাবীর করলেন, মদীনা মুনাওয়ারা থেকে একটি বালা সৃষ্টি হয়ে জুহফার দিকে চলে যাবে। বোখারী শরীফে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল মকবুল স. বলেছেন, আমি কালো কুৎসিত জটা চুলধারী এক রমণীকে দেখলাম মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হয়ে মুহতাগায় দিয়ে থেমেছে। জুহফার অপর নাম হচ্ছে মুহতাগা, যা মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তীতে অবস্থিত। স্থানটি ছিলো ইহুদীদের আবাস। রসুলেপাক স. বললেন, আমি এ স্বপ্নের তাবীর এটাই মনে করি যে, মদীনা তাইয়্যেবা থেকে বালা জুহফার দিকে স্থানান্তরিত হবে। রসুলেপাক স. মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার পূর্বে সেখানে জ্বরজারি

ইত্যাদি বহু বালা মুসিবত ছিলো। রসুলেপাক স. সেই বালা মুসিবতকে মদীনা থেকে বের করে কাফেরদের জনপদে চালিয়ে দিয়েছিলেন। কালো রমণী বালা মুসিবত বলে তাবীর করেছিলেন রসুলেপাক স.— এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে আহলে এলেমগণ বলেন, রসুলেপাক স. সওদা (কালো) শব্দ থেকে সু (বালা) অর্থ করেছিলেন।

আরেকবার রসুলেপাক স. স্বপ্নে তলোয়ার ঘুরাতে দেখলেন। দেখলেন, তলোয়ারটি কখনও কখনও ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও হয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিক। হজরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি তলোয়ার ঘুরাচ্ছি। তলোয়ারটি কখনও কখনও ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। আবার কখনো হয়ে যাচ্ছে পূর্বের চেয়েও ধারালো। রসুলেপাক স. তাঁর এই স্বপ্নের তাবীর করলেন, আল্লাহ্তায়ালা বিজয় এবং মুসলমান এই দুটিকে একত্রিত করে দিয়েছেন। উপরোক্ত তাবীরের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আহলে এলেমগণ বলেন, রসুলেপাক স. তলোয়ারের তাবীর করলেন সাহাবা। কেনোনা তাঁর সমস্ত শক্তি ও বিজয়ের মাধ্যম ছিলেন সাহাবা কেরাম। আর তলোয়ার ঘুরানোর ব্যাখ্যা করলেন, সাহাবীগণকে জেহাদ করতে হবে। তলোয়ার ভোঁতা হয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা করলেন, কোনো কোনো সময় মুসলমানগণ পরাজয় বরণ করবে। পুনরায় তলোয়ার আরও ধারালো হয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা করলেন, অবশেষে মুসলমানগণ একতাবদ্ধ হয়ে জেহাদে অংশ গ্রহণ করবে এবং তাদের বিজয় ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত হবে। এ স্বপ্ন ছিলো উহুদযুদ্ধের পূর্বাভাস।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে হজরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত আছে, রসুলে করীম স. এরশাদ করেছেন, স্বপ্নে দেখলাম, আমি মক্কা মুকাররমা থেকে এমন স্থানে হিজরত করে যাচ্ছি, যেখানে রয়েছে অনেক খেজুরের বাগান। আমি মনে করলাম স্থানটি হয়তো হবে ইয়ামামা, না হয় খয়বর। কেনোনা সেখানে খেজুরের বাগান ছিলো অনেক। তারপর আমাকে জানিয়ে দেয়া হলো, স্থানটি ইয়াছরিব বা মদীনা মুনাওয়ারা। ইমাম আহমদ র. হজরত জাবের রা. থেকে এরকমই একখানা হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, ওয়ারয়ে হুসায়না থেকে বের হয়েছি। আরও বর্ণনা রয়েছে, তিনি স্বপ্নে গরু জবেহ করতে দেখেছেন যা বাস্তবায়িত হয়েছিলো উহুদযুদ্ধে সাহাবীগণের শহীদ হওয়ার মাধ্যমে। মেশকাত শরীফে হিজরতের কথা উল্লেখ না করে ইয়াছরিবের দিকে যাত্রা, তলোয়ার ঘুরানো, তলোয়ার ভোঁতা হয়ে যাওয়া এবং পরবর্তীতে আবার আসল অবস্থায় ফিরে আসা ইত্যাদি একটি হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সে হাদীছে গরু জবেহ করার কথা বলা হয়নি।

রসুলেপাক স. আরেকবার স্বপ্নে দেখেছিলেন, একটি কূপ থেকে তিনি পানি তুলছেন। হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রসুলে মকবুল স. এরশাদ করেছেন, স্বপ্নে দেখলাম একটি কূপের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। পাশে রয়েছে একটি বালতি। আমি সেই বালতি দিয়ে কূপ থেকে পানি তুললাম, যতটুকু মর্জি হয়েছিলো আল্লাহ্তায়ালার। এরপর ইবনে আবু কুহাফা এলো। সেও সেই কূপ থেকে এক বালতি পানি ওঠালো। এক বর্ণনায় আছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এলেন। রসুলেপাক স. বললেন, আবু বকর এসে আমার হাত থেকে বালতি নিয়ে নিলো আমাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য। আবু বকরের পানি ওঠানো দেখে আমি বিস্মিত হইনি। এতো বড় বালতি দিয়ে পানি তুলতে তার কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাকে মাফ করলেন। তারপর ওমর এসে এমনভাবে কূপ থেকে পানি ওঠালো, যেনো তার মতো সামর্থ্যবান বীরপুরুষ আর কেউ নেই। সে এতো বেশী পানি ওঠালো যে, সকল মানুষ সেই পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলো।

এই হাদীছে রসুলেপাক স. হজরত ওমর রা. এর প্রশংসায় আবকারী শব্দ প্রয়োগ করেছেন। শক্তিশালী, সম্মানী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে আবকারী বলা হয়। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর রা. পানি ভর্তি বালতি টান দিলেন। তাতে এতোবেশী পানি উঠলো যে, সকল লোক সেই পানিতে তৃষ্ণা নিবারণ করলো। এমনকি হাউয ভর্তি হয়ে পানি উপচে পড়তে লাগলো। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার বলেন, উক্ত খলিফা সাহাবী দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে কীর্তি রেখে গেছেন, সৎকর্ম সম্পাদন করেছেন এবং মানুষের কল্যাণ সাধন করেছেন, তারই নিদর্শন ছিলো রসুলেপাক স. এর স্বপ্নটি।

নবী করীম স. দুনিয়া থেকে পর্দা করার পর হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. খলীফা হলেন। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে সর্বপ্রথম তিনি মুর্তাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। সমূলে উৎপাটিত হলো তারা। একজনকেও জীবিত রাখা হলো না। তারপর হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. খলীফা হলেন। তাঁর খেলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বর্ধিত হলো। আবু বকর আমাকে আরাম দেয়ার জন্য আমার হাত থেকে বালতি নিয়ে নিলো। এর ব্যাখ্যা এই যে, মুমিন ব্যক্তি, পার্থিব ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে অনাবিল ও স্থায়ী আরাম পান মৃত্যুতে। হজরত রসুলে মকবুল স. এই দুনিয়ার ঝামেলা থেকে বিদায় নিলে হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। বালতি নেয়ার অর্থ এটাই।

রসুলেপাক স. স্বপ্নের বৃত্তান্তে বলেছিলেন আবু বকরের পানি তুলতে কষ্ট হচ্ছিলো একথার তাৎপর্য এই যে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা এর খেলাফত কাল হবে সংক্ষিপ্ত। হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নবী করীম স. এর ওফাতের পর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন মাত্র দু বৎসর কয়েক মাস। তারপরই হজরত ওমর ফারুক রা. এর খেলাফত শুরু হয়। তাঁর খেলাফত কাল ছিলো

দীর্ঘ। তাঁর দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়েছিলো বেশী। তাঁর আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানাও বৃদ্ধি পেয়েছিলো। অনেক দেশ ও রাজ্য মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে এসেছিলো। প্রশাসনিক শৃংখলা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তাঁর দুর্বলতা সম্পর্কে রসুলেপাক স. এর অনুযোগ ছিলো না। বরং এতে তাঁর প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছিলো।

রসুলেপাক স. আরেকখানা স্বপ্ন দেখেছিলেন, ইমাম মুসলিম র. হজরত আনাস রা. থেকে যার বর্ণনা পেশ করেছেন। তিনি বলেন, আমি রসুলেপাক স. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, ইবনে রাফে এর ঘর থেকে এনে ইবনে তাব নামক খেজুর ভর্তি একটি তশতরী সাহাবীগণের সামনে রাখা হলো। হজরত উকবা ইবনে রাফে একজন সাহাবী। তিনি হজরত আমর ইবনে আস রা. এর খালাত ভাই ছিলেন। একদম টাটকা তরতাজা এক প্রকার খেজুরের নাম ইবনে তাব। মূলতঃ ইবনে তাব এক ব্যক্তির নাম। তার নামেই এ খেজুরের নামকরণ হয়েছে। হয়তো ওই লোকটির দ্বারাই প্রথমে এই জাতের খেজুরের চাষ হয়েছিলো। অথবা সে এই প্রকারের খেজুরকে খুব বেশী পছন্দ করতো। তার জন্যই হয়তোবা এর নাম হয়েছিলো তামারে ইবনে তাব অর্থাৎ ইবনে তাবের খেজুর।

যা হোক, উক্ত স্বপ্ন দেখার পর রসুলেপাক স. সকালবেলা তাবীর করলেন, ইবনে তাব নামক ব্যক্তি দুনিয়া এবং আখেরাতে কল্যাণের অধিকারী হবে। কেনোনা সে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের সামনে পেশ করেছে। খেজুর যেমন মিষ্টি, তাঁর ইসলাম গ্রহণও আল্লাহ্পাকের কাছে তেমন মিষ্টি হিসেবে গৃহীত হয়েছিলো।

রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্বভাব ছিলো, তিনি ফজরের নামাজ আদায়ান্তে সাহাবীগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং বলতেন, কেউ আজ রাতে কোনো স্বপ্ন দেখে থাকলে বলো। কেউ স্বপ্নের কথা না বললে তিনি নিজের দেখা স্বপ্নের কথা বলতেন। একদিন সকালবেলা রসুলেপাক স. সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আজ রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছো কি? সকলেই বললেন, না।

রসুলেপাক স. বললেন, আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার নিকট দুজন লোক এসেছে। তারা দুজনেই আমার হাত ধরে আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখি দুজন লোক। একজন দাঁড়িয়ে। আর একজন বসে। দাঁড়ানো লোকটির হাতে একটি লোহার গুর্জ। সে গুর্জ দিয়ে উপবিষ্ট লোকটির গণ্ডদেশে আঘাত করছে। লোহার গুর্জটি উপবিষ্ট লোকটির গ্রীবাদেশ পর্যন্ত দেবে যাচ্ছে। গুর্জটি উঠিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে তার গ্রীবা পূর্বাবস্থা ফিরে পাচ্ছে। পুনরায় দাঁড়ানো লোকটি গুর্জ মারছে আবার

উঠিয়ে নিচ্ছে। এভাবে বার বার তাকে আঘাত করছে। সঙ্গী দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এর রহস্য কী? তারা আমাকে বললো, এগিয়ে চলুন। আমি আবার সামনের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। কিছু দূর গিয়ে দেখি, এক লোক কাত হয়ে শুয়ে আছে। তার পাশে আরেকটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। দণ্ডায়মান লোকটির হাতে রয়েছে পাথর। সে ওই পাথর দিয়ে শায়িত লোকটির মাথা পিষ্ট করে দিচ্ছে। পাথর দ্বারা মস্তকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে মাথা থেতলে যায়। পাথরটি উঠিয়ে নিলে মাথা পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক সুস্থ হয়ে যায়। এভাবেই বার বার আঘাত করা হচ্ছিলো। জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী?

তারা বললো, এগিয়ে চলুন। আমি অগ্রসর হলাম। দেখলাম, তন্দুরের চুলার মতো এক বিশাল গর্ত যার মুখ খুবই সংকীর্ণ। কিন্তু পেট অত্যন্ত বড়। তার ভিতরে কতিপয় নারী ও পুরুষ রয়েছে, যারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাদের নীচে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। গর্তের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে নারীপুরুষগুলো আগুনে জ্বলতে জ্বলতে শিখার সঙ্গে গর্তের মুখ বরাবর উঠে আসে। প্রায় বেরিয়ে পড়বে এমতাবস্থা হয়। আগুনের শিখা নিস্প্রভ হয়ে গেলে তারা আবার গর্তের ভিতরে চলে যায়।

আমি বললাম, এর রহস্য কী? তারা বললো, সামনে চলুন। আমি চলতে লাগলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর একটি রক্তের নহরের কিনারায় পৌঁছলাম। দেখি, সেই নহরের পানিতে কিছুসংখ্যক লোক সাঁতার কাটছে। তীরে কিছু লোক দাঁড়িয়ে। তাদের সামনে রয়েছে পাথর। নহরের লোকগুলো সাঁতার কাটতে কাটতে হয়রান হয়ে কিনারে ওঠার চেষ্টা করলে দাঁড়ানো লোকগুলো তাদের মুখে পাথর ছুঁড়ে মারে। তখন তারা সাঁতার কেটে কেটে নহরের মধ্যবর্তী স্থানের দিকে চলে যায়। পুনরায় নহর থেকে উপরে আসার চেষ্টা করে, আর সেই লোকগুলো পুনরায় পাথর মেরে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর রসহ্য কী? তারা বললো, এগিয়ে চলুন। আবার হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে এক সবুজ বাগানে পৌঁছলাম। বাগানে বিরাট একটা গাছের গোড়ায় বসে রয়েছে একজন বৃদ্ধলোক। তাঁর পাশে কিছু ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ঘোরাফেরা করছে। সেই বৃক্ষের কাছাকাছি আরেকজনকে দেখতে পেলাম। লোকটি তার সামনে আগুন প্রজ্জ্বলিত করছে। আমার সঙ্গী দুজন আমাকে গাছের উপরে নিয়ে গেলো। সে গাছের মধ্যে একটি ঘর দেখলাম। এতসুন্দর ঘর আমি ইতোপূর্বে দেখিনি। ঘরটির ভিতরে নারী পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ, বাচ্চা সব ধরনের মানুষ রয়েছে। আমাকে সেই ঘরের উপরে আরেকটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। এই ঘরটি পূর্বের ঘরের চেয়ে বড় এবং সুন্দর। এখানেও দেখলাম, সবধরনের মানুষ আছে। আমি আমার সঙ্গী দুজনকে বললাম, আজ রাতে আমাকে তো বহু দূর ঘুরালে, এখন বৃত্তান্তগুলো বলো।

তারা বললো, বৃত্তান্ত শুনুন। প্রথম যাকে দেখেছেন, যার গণ্ড দেশে আঘাত করা হচ্ছে,সে মিথ্যাবাদী। দুনিয়াতে সে মিথ্যা রটনা করতো। তার এই শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। যার মাথা থেতলে দেয়া হচ্ছে, সে হলো ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্তায়ালা কোরআন মজীদ শেখার সুযোগ দিয়েছেন, অথচ সে রাত্রিবেলা কোরআন তেলাওয়াত না করে গাফেল হয়ে শুয়ে থাকতো। রাত্রিবেলা নামাজের জন্য উঠতো না। সে দিনের বেলায় কোরআন মজীদ অধ্যয়ন করে, অথচ তার উপর আমল করে না। তার শাস্তিও কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তন্দুরের চুলায় রয়েছে ব্যভিচারে লিপ্ত নারী ও পুরুষ। যাদেরকে রক্তের নহরে হাবুডুবু খেতে দেখেছেন, তারা সুদখোর। আর যে বৃদ্ধ লোকটিকে প্রকাণ্ড বৃক্ষের নীচে বসে থাকতে দেখেছেন, তিনি হচ্ছেন হজরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ আ.। আর যে বাচ্চাগুলোকে তাঁর আশে পাশে ছুটাছুটি করতে দেখেছেন, তারা তাঁর বংশধর। যে লোকটিকে আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে দেখেছেন, তিনি হচ্ছেন জাহান্নামের দারোগা মালিক ফেরেশতা। যে ঘরটি আপনি প্রথম দেখেছেন, তা হচ্ছে সাধারণ মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত জান্নাতের কক্ষ। তার উপরের ঘরটি শহীদদের। আর আমরা দুজন জিব্রাইল এবং মিকাইল। তারপর তাঁরা বললেন, মাথা ওঠান। আমি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মেঘখণ্ডের ন্যায় কী যেনো। এক বর্ণনায় আছে, মেঘের মতো শাদা জিনিস চোখে পড়লো। তারা বললেন, এটি হচ্ছে আপনার জন্য জান্নাতের নির্দিষ্ট স্থান। আমি বললাম, আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আমার জায়গায় চলে যাই। তাঁরা বললেন, এখনও আপনার দুনিয়ার জীবন শেষ হয়নি। দুনিয়ার জীবন শেষ হলে আপনি এখানে আসবেন। হাদীছখানা বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারী।

সাহাবা কেরামের স্বপ্নঃ রসুলেপাক স. যার তাবীর করেছেন

সাহাবা কেরামের বহু স্বপ্নের তাবীর করেছেন রসুলেপাক স. স্বয়ং। এমনি একটি স্বপ্ন দেখেছেন হজরত যারারাহ ইবনে ওমর নাখয়ী রা.। তিনি নাখা গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে নবী করীম স. এর নিকট এসেছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার দরবারে আসার সময় পথিমধ্যে একটি স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, বাড়ীতে যে গাধাটিকে রেখে এসেছিলাম, সে একটি বকরীর বাচ্চা প্রসব করেছে, যার গায়ের রঙ শাদা এবং কালো।

রসুলেপাক স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে কি কোনো বাঁদী আছে? সে কি গর্ভবতী? তিনি বললেন, হাঁ ইয়া রসুলাল্লাহ। মনে হয় সে গর্ভবতী। রসুলেপাক স. বললেন, নিশ্চয়ই সে ওই বাচ্চাটি প্রসব করবে, যে হবে তোমার সন্তান। হজরত যাররাহ রা. বললেন, শাদা কালো রঙ দেখার তাৎপর্য কী? রসুলেপাক স. বললেন, কাছে এসো। হজরত যাররাহ বলেন, অতঃপর আমি রসুলেপাক স. এর নিকটবর্তী

হলাম। তিনি বললেন, তোমার শরীরের এক স্থানে শ্বেতী দাগ আছে, যা তুমি মানুষের কাছে কখনও প্রকাশ করোনি। তিনি বললেন, হাঁ, কসম ওই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমার শ্বেতী দাগ সম্পর্কে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

রসুলেপাক স. বললেন, তোমার শ্বেতী রোগের চিহ্নটি তোমার বাচ্চার দেহেও রয়েছে। তারপর হজরত যাররাহ রা. বললেন, আমি স্বপ্নে নোমান ইবনে মুনযিরকে দেখেছি। নোমান ইবনে মুনযির কেসরার শাসনামলে আরবের একজন বাদশাহ্ ছিলেন। যারারাহ রা. বললেন, আমি নোমান ইবনে মুনযিরকে দেখলাম, তার কানে দুটি বালি ঝুলছে, আর হাতে রয়েছে বাজুবন্দ এবং চুড়ি, অথচ এগুলো মেয়েদের অলংকার।

রসুলেপাক স. বললেন, এই আরবদেশে পূর্বের মতো আবার সাজসজ্জার বাহার ফিরে আসবে। হজরত যারারাহ রা. বললেন, আমি আরেকটি স্বপ্ন দেখেছি। একটি বৃদ্ধলোককে দেখলাম, তার মাথার চুল শাদা-কালো মিশ্রিত, সে যমীনের ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে। রসুলেপাক স. বললেন, এটি হচ্ছে দুনিয়ার অবস্থা। এরপর তিনি আরেকটি স্বপ্ন পেশ করলেন। বললেন, আমি যমীন থেকে একটি অগ্নি নির্গত হতে দেখেছি। অগ্নিটি আমার এবং আমার পুত্র ওমরের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে গেলো। আমি দেখলাম, আগুন বলছে, লাজা লাজা। আরও বলছে, আমি অন্ধ ও চক্ষুস্মান সকলকেই খেয়ে ফেলি। আমি তোমাকে, তোমার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন সকলকে এবং তোমার মালকেও খেয়ে ফেলবো।

রসুলেপাক স. বললেন, ওই আগুন হচ্ছে ফেতনা, যা আখেরী জামানায় প্রকাশ পাবে। হজরত যাররাহ রা. বললেন, ফেতনাটি কী? আর সে ফেতনাকারীরাই বা কারা? রসুলেপাক স. বললেন, ফেতনাটি হচ্ছে, মুসলমানেরা আপন ইমামকে অকস্মাৎ ধ্বংস করে দিবে। তার পর নানা রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের মধ্যে নিপতিত হবে। মাথার হাড়সমূহ যেরকম পরস্পরে সম্মিলিত থাকে, তেমনি তখন একটার পর একটা ফেতনা আসতে থাকবে। রসুলেপাক স. আপন হাতের আঙুলসমূহ একত্রিত করে দেখালেন, ফেতনা এভাবে, সম্মিলিতভাবে আসতে থাকবে। আর ফেতনাবাজরা মনে করবে, তারা নেক কাজ করছে। তখন এক মুসলমানের রক্ত অপর মুসলমানের নিকট মিষ্টি পানীয়ের চেয়েও সুস্বাদু মনে হবে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত কায়েস ইবনে উব্বাদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি একদা মদীনা শরীফে মসজিদে নববীতে এক বৈঠকে উপবিষ্ট ছিলাম, যে বৈঠকে হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.ও উপস্থিত ছিলেন। তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. ওই স্থান দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, বৈঠকে একজন উপস্থিত হলেন, যার চেহারার মধ্যে বিনয়ের নমুনা পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। বৈঠকের লোকেরা বললো, লোকটি জান্নাতী লোকদের অন্যতম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম দু' রাকাত নামাজ আদায় করে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে বললাম, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন, তখন সেখানকার লোকেরা বলছিলো, লোকটি বেহেশতী। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বললেন, যে ব্যাপারে জানা নেই, সে ব্যাপারে কোনো কথা বলা কারও জন্য উচিত নয়। তিনি একথা বলেছিলেন বিনয়ের কারণে অথবা কোনোরূপ অহংকার তাকে যেনো স্পর্শ করতে না পারে সেজন্যই।

একথা বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছিলো না। সেখানকার উপবিষ্ট লোকজন কেমন করে বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি জান্নাতী— তা আমার জানা নেই। তবে যে জিনিসটির ব্যাপারে আমার ধারণা জন্মালো তা হলো এই— আমি রসুলে মকবুল স. এর জীবদ্দশায় একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম।

একটি প্রকাণ্ড ময়দানে একটি লোহার খুঁটি, যার নীচের অংশ যমীনের সঙ্গে সংযুক্ত। আর উপরের দিক আকাশে গিয়ে মিশেছে। আর সেই খুঁটিটির উপরে একটি মজবুত রশি রয়েছে। আমাকে বলা হলো, উপরে উঠে এসো। আমি বললাম, উপরে ওঠার মতো শক্তি আমার নেই। তারপর একজন খেদমতগার এসে আমাকে উপরে উঠতে সাহায্য করলো। সে আমার কাপড় ধরে টেনে টেনে খুঁটির উপরের অংশে তুলে নিলো, আর আমি সেই রশিটি ধরে ফেললাম। আমাকে বলা হলো যেনো রশিটি আমি খুব ভালোভাবে ধরে রাখি। এতটুকু দেখার পর আমার ঘুম ভেঙে গেলো। চেয়ে দেখি, বাস্তবেই আমার হাতে একটি রশি রয়েছে। এরপর আমি আমার স্বপ্নটি রসুলে করীম স. এর নিকট পেশ করলাম।

তিনি স. তাবীর করে বললেন, প্রকাণ্ড ময়দানটি হচ্ছে ইসলাম। খুঁটিটি হচ্ছে ইসলামের রুকনসমূহ। আর সেই রশিটি হচ্ছে উরওয়ায়ে উছকা অর্থাৎ ইসলামের উপর সুদৃঢ়ভাবে টিকে থাকা। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি উরওয়ায়ে উছকাকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে।

রসুলেপাক স. এর বাণী আল্লাহ্তায়ালার এই আয়াতের মর্মার্থই যেনো প্রকাশ করেছে 'যে তাগুতকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্র উপর ইমান এনেছে, সে যেনো উরওয়ায়ে উছকা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, হজরত কায়েস ইবনে উব্বাদ রা. বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম একজন লোক আমার নিকট এসে বললো, ওঠো আমার হাত ধরো। আমি তার সঙ্গে চললাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি বাম দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে। আমি ওই রাস্তার দিকে যেতে চাইলাম।

লোকটি বললো, ওপথে যেয়ো না। ওই পথ আসহাবে শেমালদের। তুমি তো সে দলের লোক নও। আরও কিছুদূর যাওয়ার পর আরেকটি রাস্তা দেখলাম, ডান দিকে চলে গিয়েছে। লোকটি বললো, এই রাস্তাটি ধরো।

এরপর আমার সামনে পড়লো এক পাহাড়। লোকটি বললো, এই পাহাড়ের উপর ওঠে যাও। আমি উঠতে চাইলাম। কিন্তু অবস্থা হলো এই, আমি যখনই উঠতে চাই, তখনই পড়ে যাই। ফলে উপরে ওঠা হচ্ছিলো না। এ স্বপ্ন রসুলেপাক স. এর কাছে পেশ করলে তিনি বললেন, সেটা হচ্ছে হাশরের ময়দানের অবস্থা। আর ওই পাহাড়টি শাহাদতের মাকাম। তুমি সে মাকাম লাভ করতে পারবে না। উলামা কেরাম বলেন, রসুলেপাক স. উক্ত সাহাবীকে যে সুসংবাদ দিলেন তা তাঁর নবুওয়াত এবং গায়েবী সংবাদ প্রদানের আলামত।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার বলেছেন, নবী করীম স. কর্তৃক স্বপ্নের তাবীর সংক্রান্ত যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, এসমস্ত তার একটি নমুনা মাত্র। অন্যথায় তিনি যে সকল সূক্ষ্ম তাবীর করেছেন, তার সবগুলো একত্রিত করলে কয়েক খণ্ড পুস্তক রচিত হবে। বিষয়গুলো নিয়ে একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, তাঁর উম্মতের মধ্যে এ ধরনের বহুলোক রয়েছেন, যারা ওই ধরনের কারামত পেয়ে ধন্য হয়েছেন। সবই রসুলেপাক স. এর মোজেজার প্রতিবিম্ব, তাঁর প্রতি মান্যতার বরকত, হেদায়েত প্রাপ্তির ফল।

মোহাম্মদ ইবনে শিরীনের স্বপ্নের তাবীর সংক্রান্ত যে সূক্ষ্মদর্শিতা এবং দক্ষতা ছিলো, কেবল তাঁর কথা চিন্তা করলেও ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাঁর সূক্ষ্ম তাবীরগুলোকে একত্রিত করলে সহজেই অনুমান করা যাবে, তিনি যাঁর অনুসরণের ফলে এরূপ জ্ঞানী হতে পেরেছিলেন, তাঁর স্থান কোথায়। অনুসরণীয় ব্যক্তি অর্থাৎ মহান রসুল স. কে প্রদত্ত এলেম ও মারেফতের বর্ণনা ভাষার গণ্ডিতে আসে না। ইবনে শিরীন নবী করীম স. এর একজন উম্মত মাত্র। স্বপ্নের তাবীর বিষয়ে তাঁর সূক্ষ্মজ্ঞান যদি এরকম বিস্ময়কর হয়, তবে রসুলেপাক স. এর মাকাম কতো উচ্চ ছিলো তা অনুমান করাও কঠিন।

যে কারণে স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা বর্জন করেন

ইমাম বোখারী ও তিরমিযী হজরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. সাহাবীগণকে খুব বেশী জিজ্ঞেস করতেন, তোমরা কি কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছো? কেউ স্বপ্ন দেখলে বলতেন, আর রসুলেপাক স. তার তাবীর করে দিতেন। কিন্তু এক সময় রসুলেপাক স. স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা বর্জন করেছিলেন। কেউ স্বেচ্ছায় স্বপ্নের কথা বললে, তখন তিনি তার তাবীর বলে দিতেন। স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার কারণ সম্পর্কে তো পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

কিন্তু পরবর্তীতে তা পরিহার করার কারণ কী ছিলো– সে সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. সম্পর্কিত স্বপ্নের ঘটনাটিই তার কারণ, যা তিরমিযী এবং আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

একদিন নবী করীম স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছো? একজন বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি দেখলাম, আকাশ থেকে একটি দাঁড়িপাল্লা নেমে এলো। সেই পাল্লায় আপনাকে এবং আবু বকরকে ওজন করা হলো। আপনার পাল্লাটি ভারী হয়ে গেলো। তারপর আবু বকর রা. ও ওমরকে পাল্লায় ওঠানো হলে আবু বকরের পাল্লা ভারী হলো। তারপর ওমর ও ওছমানকে পাল্লায় ওঠানো হলে পাল্লা ভারী হলো ওমরের। অতঃপর পাল্লাখানা ওঠিয়ে নেয়া হলো। এই স্বপ্নের কথা শুনে রসুলেপাক স. বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে গেলেন এবং তাঁর চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির ছাপ পরিলক্ষিত হলো। এরপর থেকে তিনি স্বপ্ন সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা বর্জন করেন।

রসুলেপাক স. এর অসন্তুষ্টির কারণ সম্পর্কে আহলে এলেমগণ বলেন, স্বপ্ন মানুষের গোপন রহস্য উন্মোচিত করে দেয়। সাহাবীগণের মধ্যে একজনের উপর আরেকজনের মর্যাদা কতটুকু তা কেবল রসুলেপাক স.ই জানতেন। এই প্রাধান্যের ব্যাপারটি স্বপ্ন দ্বারা উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে দেখে রসুলেপাক স. শংকিত হলেন, না জানি এভাবে অনবরত স্বপ্নের মাধ্যমে গোপন বিষয় প্রকাশ পেয়ে যায়।

দুনিয়াতে মাখলুকের হাল অপ্রকাশিত থাকুক এটাই আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা। এর খেলাফ হওয়াকে রসুলেপাক স. পছন্দ করেননি। তাই অসন্তুষ্টির ছাপ তাঁর স. চেহারা মোবারকে ফুটে উঠেছিলো এবং এ কারণে তিনি পরবর্তীতে স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা পরিহার করেছিলেন। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থ এই যে, স্বপ্নের মাধ্যমে মর্যাদার তারতম্যের ব্যাপারে যা দেখানো হলো, তা যদিও সত্য, তথাপি তা প্রকাশিত হয়ে যাওয়াটা ভালো কথা নয়, যদিও রসুলেপাক স. কোনো কোনো সাহাবীকে কোনো কোনো সাহাবীর উপর প্রাধান্য দিতেন। বিশেষ করে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু এ স্বপ্নের বাহ্যিক অর্থ তাঁদেরকে খেলাফতের অধিকার দেয়া এবং একজনকে অপরের উপর প্রাধান্য পাওয়া।

শরহে সুন্নাহ কিতাবে লেখা হয়েছে, মীযানের পাল্লা উঠে যাওয়া থেকে রসুলেপাক স. মনে করেছিলেন, ব্যাপারটি হয়তো আল্লাহ্র সন্তোষ অন্বেষণের স্তর থেকে ঝগড়া ও মতানৈক্যের দিকে চলে যাবে। কেউ কেউ বলেন, রসুলেপাক স. এর অসন্তুষ্টির কারণ এই ছিলো যে, তিনি মনে করেছিলেন, হজরত ওমর রা. এর পর হয়তো খেলাফত শেষ হয়ে যাবে। হজরত ওছমান রা. এর পাল্লা হালকা

হওয়া দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ওমর রা. এর পর দ্বীনের মর্যাদায় শিথিলতা আসবে।

ইবনে কুতায়বা বলেন, রসুলেপাক স. এর স্বপ্ন সম্পর্কে জানতে না চাওয়ার কারণ হচ্ছে ইবনে রমলের হাদীছ। হজরত ইবনে রমল বর্ণনা করেন, নবী করীম স. এর পবিত্র অভ্যাস ছিলো, ফজরের নামাজের পর বসা অবস্থায় সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী ওয়াসতাগফিরুল্লাহ সত্তর বার পাঠ করতেন এবং বলতেন, সত্তরবার তসবীহ পাঠ সাতশ বারের সমান। বান্দা জানে না যে তার দ্বারা সাতশ বারের চেয়েও বেশী গোনাহ্ হয়ে থাকে। তারপর রসুলেপাক স. চেহারা মোবারক মুসল্লীগণের দিকে ফিরিয়ে বলতেন, কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছো কি? হজরত ইবনে রমল বলেন, একদিন আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। তখন রসুলেপাক স. এই দোয়াখানা পাঠ করলেন।

خَيْرٌ تَلَقَّاهُ وَشَرٌّ تَوَقَّاهُ وَخَيْرٌ لَّنَا وَشَرٌّ لَّا عَدَائِنَا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ –

তারপর বললেন, এখন তোমার স্বপ্নটি বলো। আমি বর্ণনা করলাম, সমস্ত মানুষ সুন্দর মনোরম বড় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে একটি বাগানে প্রবেশ করলাম। বাগানটি এতই সুন্দর ছিলো যে, মনে হলো কেউ কোনোদিন এরকম সুন্দর বাগান দেখেনি। বাগান ছিলো গাছপালায় ভর্তি। আর সে গাছপালাগুলো এতই সজীব যেনো পানির ফোঁটার মত মদিরতা গাছ থেকে টপকে টপকে পড়ছে। বাগানে নানাপ্রকারের ফুল ফুটে আছে দেখে আনন্দিত হচ্ছিলাম। আর আমার পূর্বে যারা সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলো, তারাও খুব আনন্দিত হচ্ছিলো। আনন্দে সকলেই আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিচ্ছিলো এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছিলো। এরপর যারা প্রথমে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলো তারা আপন গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হলো। ডানে বামে না গিয়ে সোজা প্রশস্ত রাস্তায় চলে গেলো।

দ্বিতীয় কাফেলা এলো। এ কাফেলার লোকসংখ্যা পূর্বের চেয়ে অধিক। তারাও এখানে এসে বিস্মিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে আল্লাহু আকবার বলতে বলতে আপন গন্তব্যের দিকে চলে গেলো। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কিছু কিছু লোক তাদের ঘোড়াগুলোকে মাঠে ঘাস খেতে দিলো এবং কিছু কিছু ঘাসের আটি বেঁধে সঙ্গে নিলো। এভাবে তারা বাগানটিকে কিঞ্চিত নষ্ট করে দিয়ে গেলো। তারপর এর চেয়ে বড় একটি কাফেলা এলো। তারাও বাগানের সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলো এবং তকবীরের ধ্বনি দিতে লাগলো।

তারা বলাবলি করছিলো, জায়গাটি বড়ই সুন্দর ও আকর্ষণীয়– অর্থাৎ তারা এস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছা করলো এবং এস্থানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বাগানের এদিক সেদিক ঘুরাফেরা শুরু করলো। এগুলো দেখার পর আমি আর সেখানে স্থির না থেকে আপন রাস্তায় চলা শুরু করলাম। এক পর্যায়ে বাগানের শেষ প্রান্তে গিয়ে উপনীত হলাম। সেখানে যাওয়া মাত্র হঠাৎ করে আপনার উপর আমার দৃষ্টি পড়লো। দেখলাম, একটি মিম্বর যার মধ্যে সাতটি সিঁড়ি ছিলো, আপনি সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িটিতে বসে আছেন। আপনার ডান পাশে উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট সুন্দর একজন পুরুষ বসে আছেন। তিনি কথা বললে উচ্চ আওয়াজ হয়। তিনি উচ্চতায় সকলের চেয়ে উঁচু। আপনার বাম পাশে আরেকজনকে দেখলাম, যাঁর দেহাকৃতি মধ্যম ধরনের, শরীরের ত্বক রক্তিমাভ। তিনি কথা বললে আপনি তাঁর কথা সম্মানের সাথে মনযোগ সহকারে শোনেন। আপনার মিম্বরের সামনে একজন বৃদ্ধ বুযুর্গ লোককে দেখতে পেলাম। মনে হলো, আপনি তার আনুগত্য এবং অনুসরণ করছেন। তাঁর সামনে দেখলাম একটি দুর্বলাকৃতির উটনী। যার বয়স অনেক বেশী হয়েছে। মনে হলো আপনি সে উটনীটিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এ স্বপ্নের বর্ণনাকারী হজরত ইবনে রমল। স্বপ্নের বৃত্তান্ত শোনার পর তাঁর চেহারা মোবারকে ঈষৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। এ অবস্থা চললো কিছুক্ষণ। তারপর তিনি বাইরে চলে এলেন। মনে হলো, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। তাই তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হচ্ছিলো। অতঃপর যখন তিনি সহজ হলেন, তখন স্বপ্নের তাবীর শুরু করলেন। বললেন, মনে হয়, বড় যে রাস্তাটি দেখেছো সেটা হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকীম, যার উপর তোমরা চলছো। আর বাগানটি দুনিয়া। বাগানের সৌন্দর্য এবং সজীবতা হচ্ছে এই দুনিয়ার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, যা আমাকে দান করা হয়েছে। কিন্তু তা আমি কামনা করিনি। আর সেও আমাকে চায় না।

আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় যে কাফেলাটি দেখেছো, এতটুকু বলে তিনি পাঠ করলেন, ‘‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন’– এ দোয়াটি মুসিবতের সময় পাঠ করতে হয়, তারা দুনিয়ার মুসিবতে দুনিয়ার মোহে পড়ে গিয়েছে। দুনিয়াবী জিন্দেগীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জড়িত হয়ে সীমালংঘনের বিপদে পড়ে গিয়েছে। এ দুনিয়ার রাজা বাদশাহ্দের অবস্থা এরকমই। কিন্তু হে ইবনে রমল! তুমি সোজা রাস্তা, কল্যাণ ও কামিয়াবীর উপর রয়েছো এবং সর্বদাই থাকবে। অবশেষে আমার সাথে মিলিত হবে। এখন সাতটি সিঁড়িবিশিষ্ট মিম্বরের তাৎপর্য কী তা শোনো। সেটা দুনিয়া।

দুনিয়ার বয়স সাত হাজার বৎসর। আর আমি সর্বশেষ হাজার সালের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছি, যার সিঁড়িটি তুমি সর্বোপরি দেখতে পেয়েছো। লম্বা আকৃতির যাঁকে দেখেছো, তিনি নবী মুসা। আমি তাঁকে এ কারণে সম্মান করি যে, তিনি

কলীম হওয়ার ফযীলত লাভ করেছেন। আর মধ্যমাকৃতির রক্তিমাভ বর্ণের যাঁকে দেখেছো, তিনি নবী ঈসা। আমি তাকে সম্মান করি এ করণে যে, আল্লাহ্তায়ালার নিকট তাঁর যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। আর বয়োবৃদ্ধ লোকটি হলেন নবী ইব্রাহীম। আর দুর্বল যে উটনীটিকে দেখতে পেয়েছো, যাকে আমি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, তা হচ্ছে কিয়ামত, যা আমার এবং আমার উম্মতের উপর কায়েম হবে। আমার পরে আর কোনো নবী হবে না। আর কোনো উম্মতও হবে না। হজরত ইবনে রমল বলেন, এই স্বপ্ন শোনার পর রসুলে করীম স. আর কারও কাছে স্বপ্নের ব্যাপারে কোনো কিছু জানতে চাননি। তবে কেউ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কিছু বললে, তিনি তার তাবীর করে দিতেন। এই হাদীছটি ইবনে কুতায়বা আর বায়হাকী 'দালায়েল' কিতাবে লিখেছেন। তবে হাদীছটির সনদ দুর্বল। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

وَاَخَيْرُ دَعْوَايِنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰي سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰي اٰلِه وَاَصْحَابِه الطَّاهِرِيْنَ –

মাদারেজুন্ নবুওয়াত

ISBN 984-70240-0014-9